সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৯তম বর্ষ ॥ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র
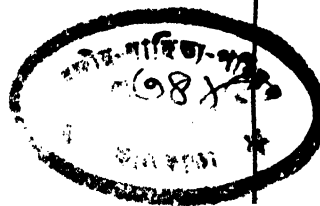
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়

বৌদ্ধগান ও দোহা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত

বাঙ্গলা ভাষায় প্রাচীনতম নিদর্শন, খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর ২৪ জন প্রাচীনতম বাঙ্গালী কবির বঙ্গভাষায় রচিত প্রাচীনতম কবিতা-সংগ্রহ, শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত 'ডাকার্ণব', নেপাল রাজদরবার হইতে আবিষ্কৃত চারিখানি অমূল্য প্রাচীন পুথির সংগ্রহ ॥

মূল্য : ত্রিশ টাকা

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

(১৭৯৫-১৮৭৬)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডক্টর সুশীলকুমার দে লিখিত ভূমিকা

পঞ্চম সংস্করণ

সুদৃশ্য বাঁধাই। মূল্য : ত্রিশ টাকা মাত্র

ভারত কোষ

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত বিশ্বকোষ

বা

Encyclopaedia

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সুদৃশ্য বাঁধাই।

সম্পূর্ণ সেট একশত পঞ্চাশ টাকা ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক
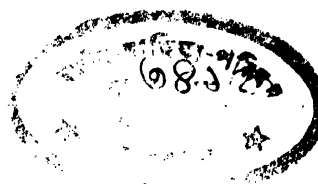
৮৭তম বর্ষ ॥ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

৮৯ বর্ষ ॥ ১ম-২য় সংখ্যা

॥ সূচীপত্র ।

ব্রহ্মদেশে প্রাপ্ত দুটি বৌদ্ধ মূর্তিলেখ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

ব্রহ্মদেশ পুরাতত্ত্ববিভাগের কর্মচারী U. Bokay মহাশয় পাগান সংগ্রহশালার Conservator ও Curator. মাঝে মাঝে তিনি আমাকে পাঠোদ্ধারের জন্য ঐ দেশে আবিষ্কৃত লেখাবলীর আলোকচিত্র পাঠিয়ে থাকেন। সেগুলি আমি বিভিন্ন পত্রিকাতে প্রকাশ করেছি। গত বৎসর (১৯৮১) অক্টোবর মাসে তিনি আমাকে dolomite পাথরে নির্মিত সাড়ে ছয় ইঞ্চি উঁচু বুদ্ধমূর্তির পিছনে উৎকীর্ণ একটি ক্ষুদ্র লেখের চিত্র পাঠিয়েছিলেন। মূর্তিটি Mandalay-এর নিকটবর্তী Sagaing শহরের Khar-wey পাহাড়ে অবস্থিত থিৎ (কিংবা—চিং)-সব্-ম্যা-চেতি নামক বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে গত ১৯১৯ সালে আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে মূর্তিটি ঐ পাহাড়ের উপর অন্য একটি বৌদ্ধমন্দিরে রক্ষিত আছে। এই মূর্তির বৈশিষ্ট্য এই যে, পণ্ডিতেরা এটিকে দশম-একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত বলে স্থির করেছেন; কিন্তু এতে উৎকীর্ণ অভিলেখের তারিখ ১৭০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি এবং এর ভাষা সংস্কৃত ও লিপি বাংলা। বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের কোনও বাঙালী বৌদ্ধ পুরাতন মূর্তিটি সংগ্রহ করে উল্লিখিত বৌদ্ধ-মন্দিরে পূজার্থ দান করেছিলেন। অভিলেখে যে সালের ব্যবহার দেখা যায়, সেটি ঢাকা, কুমিল্লা ও নোয়াখালি জেলা এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের দলিলপত্রাদিতে কখনও কখনও ব্যবহৃত দেখা গিয়েছে। শিলালেখ, তাম্রশাসন ও মূর্তিলেখে আগে এর ব্যবহার লক্ষ্য করিনি। এও অভিলেখটির অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান অভিলেখ মাত্র দুই পঙ্‌ক্তিতে অতি সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ। লেখটি লিখতে মধ্যযুগের শেষভাগের বাংলা বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়েছে। 'ঠ' অক্ষরটির আকার অনেকটা আধুনিক বাংলা 'ঠ'-এর কাছাকাছি; কিন্তু 'শ্রী' অক্ষরে 'শ'-এর আধুনিক আকার পরিস্ফুট নয়। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির শেষে স্থানাভাবে 'দি' অক্ষরটির 'ই'-মাত্রা 'দ'-এর মাথার উপরেই শেষ হয়েছে। একই কারণে '১' অঙ্কটি 'দি' অক্ষরের নীচের দিকে লেখা হয়েছে। এই যুগের অন্যান্য লেখাবলীর মত '৪' অঙ্কটি খণ্ড'ৎ'-এর আকারে লিখিত দেখা যায়। ভাষার কিছু কিছু ত্রুটি আছে। 'পরমবৌদ্ধ' স্থলে 'পরমবৌদ্ধস্য' লেখা বাঞ্ছনীয় ছিল।

অভিলেখে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধমূর্তিটি মূর্তিধরের পুত্র ব্রহ্মধরের পুণ্য অর্থাৎ দানকার্য। ব্রহ্মধরকে পরমবৌদ্ধ বলা হয়েছে এবং তাঁর পিতা ব্রহ্মধরকে বলা হয়েছে অন্তঃপ্রতীহার এবং ঠকুর। ব্রহ্মধর পাগানের রাজার অন্তঃপুর-রক্ষক ছিলেন বলে বোধ হয়। ঠকুর (ঠাকুর) তাঁর রাজদত্ত উপাধি হতে পারে। এঁরা চট্টগ্রাম অঞ্চলের ব্রহ্মদেশ প্রবাসী বৌদ্ধ ছিলেন, তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই। কারণ মধ্যযুগের শেষভাগে বাংলার অন্যত্র বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তেমন ছিলনা। অধিকন্তু অভিলেখটিতে যে সালের ব্যবহার দেখা যায়, সেটার প্রচলন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ব্যতীত অন্যত্র কোথাও দেখা যায়নি।

অভিলেখের তারিখ 'স (বা—সং)। ৪৯৭' অর্থাৎ সংবৎ ৪৯৭। এই সালটি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় পরগণাতিসন, বলালী (বল্লালী) সন, পরগনে ভুলুয়া সন প্রভৃতি

বিভিন্ন নামে প্রচলিত। এই সাল সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত History of Bengal, Vol. I, pp. 235-36 দ্রষ্টব্য। সালটির আরম্ভ কোথাও কোথাও ১১৯৯ খ্রীস্টাব্দে কিন্তু কোথাও বা ১২০১-০২ খ্রীস্টাব্দে ধরা হয়। একখানি পাণ্ডুলিপির অনুলিখনকাল পাওয়া গিয়েছে—পরগণাতিসন ৩২১ এবং শকাব্দ ১৪৫১ (অর্থাৎ ১৫২৯ খ্রীস্টাব্দ)। এটাতে ১২০১-০২ খ্রীস্টাব্দে এই সালের আরম্ভ সমর্থিত হয়।

সালটির নাম বলালী বা বল্লালী হলেও এর প্রচলনের জন্য বল্লালসেনকে দায়ী করা যায় না। কারণ বল্লালসেন আনুমানিক ১১৫৯-৭৯ খ্রীস্টাব্দে রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু এই সালের ৩২১ বর্ষ যদি ১৪৫১ শকাব্দ হয়, তবে ১১২৪ শকাব্দে সালটির আরম্ভ হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, 'শেকশুভোদয়া' সমর্থিত তিব্বতীয় 'পাগ্-সাম্-জোন্-জাঙ্' গ্রন্থের বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে এদেশে মুসলমান অধিকারের তারিখ ঐ ১১২৭ শকাব্দ। পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের ২৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। পূর্বভারতের বৌদ্ধগণ যে তুর্কী-মুসলমানের হাতে বিশেষভাবে নির্যাতিত হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে। তাই বৌদ্ধ ইতিহাসের দুর্দিনের স্মরণে বৌদ্ধগণের দ্বারা সালটির প্রচলন হওয়া অসম্ভব নয়।

অভিলেখের পাঠ :

১. পরমবৌদ্ধ-অন্তঃপ্রতীহার-ঠকুর-শ্রীমূর্ত্তিধর-
২. পুত্র-শ্রীব্রহ্মধরস্য পুণ্যমিদং স[ং]। ৪৯৭ মাঘ-দি ১ (॥*)

বঙ্গানুবাদ :

এটি (অর্থাৎ এই বুদ্ধমূর্তিটি) [পাগানের রাজার] অন্তঃপুর-রক্ষক ঠাকুর শ্রীমূর্তিধরের পুত্র পরমবৌদ্ধ শ্রীব্রহ্মধরের পুণ্য [দানকার্য]। সংবৎ ৪৯৭ মাঘ-দিন ১॥

উপরে আলোচিত প্রস্তরনির্মিত বুদ্ধমূর্তির আলোকচিত্র প্রেরণের কয়েক মাস পরে Bokay মহাশয়ের কাছ থেকে আমি আর একখানি চিঠি পাই। চিঠির তারিখ ২৯.১.৮২ এবং এর সঙ্গে তিনি আমাকে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি উঁচু একটি পিত্তলনির্মিত সুন্দর বুদ্ধমূর্তির চিত্র পাঠান। এখানে বুদ্ধ ভূমি-স্পর্শ মুদ্রায় সমাসীন। তাঁর মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল এবং গলায় হার। মূর্তিটির পশ্চাদ্দিকের নিম্নভাগে ছোট একপঙ্ক্তিমাত্র অভিলেখ উৎকীর্ণ আছে। আমাকে তার পাঠোদ্ধার করে দিতে বলা হয়েছিল।

লেখটির ঐতিহাসিকমূল্য বিশেষ কিছু নেই। এতে মাত্র লেখা আছে—"বুধে দেবধর্মোয়ং" অর্থাৎ শুদ্ধ সংস্কৃত বোধ হয়—"বুদ্ধেঃ দেয়ধর্মো'য়ম্।" মানৎ করে কোনও দেবমূর্তি স্থাপনা বা মন্দিরাদিতে দান করলে তাকে বলা হত 'দেয়ধর্ম'। 'দেব ধর্ম, তার বিকারমাত্র। বৃদ্ধিনামক কোনও পুরুষ আলোচ্য পিত্তল-নির্মিত বুদ্ধমূর্তিটি পাগানের বৌদ্ধমন্দিরে দান করেছিলেন বলে বোঝা যায়। মূর্তিটি পাগানের একটি পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

Bokay মহাশয় লিখেছিলেন যে, বুদ্ধমূর্তিটি পালযুগের ভাস্কর্যকীর্তি বলে তাঁর ধারণা। কিন্তু এতে উৎকীর্ণ অভিলেখটি পালযুগের মত প্রাচীন নয়। এতে যে আকারের 'ধ' ব্যবহৃত হয়েছে, তা পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে লক্ষ্য করিনি। অক্ষরটির আকার একেবারেই আধুনিক বাংলা 'ধ'-এর মত।

বাউল কবি কাঙাল গিরিলাল দাস ও তাঁর পদাবলী

শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্তী

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে কাঙাল গিরিলাল দাস একটি নূতন নাম। নবাবিষ্কৃত একটি হাতে লেখা পুথির চুরানব্বইটি (৯৪) পদ কাঙাল গিরিলাল ভণিতা-যুক্ত। পুথিটি একটি পদ-সংকলন। প্রাচীন, অর্বাচীন, অনেক খ্যাত, ও অখ্যাত কবির পদ এতে অন্তর্ভুক্ত। পুথিটির নয়টি খণ্ড। পঞ্চমখণ্ডে কেবল গিরিলাল দাসের পদ। প্রত্যেক পদের শেষে কবি নিজের নামের সঙ্গে গুরু দীনবন্ধুর নাম সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন।

পুথি-লেখকের নাম মহাভারত দাস। তিনি পুথির মাঝে মাঝে নিজের নাম-ঠিকানা দিয়েছেন। লেখা কাগজের ওপর। এক স্থানে লেখক ইংরেজীতে নাম-ঠিকানা লিখেছেন 'বাবু মহাভারত দাস বৈরাগী, পোঃ বাদলগাছি। দেউলা, বোগ্রা'। পঞ্চম খণ্ডের প্রথমেই লেখার তারিখ দেওয়া আছে ১২।৯৯।২৩ অর্থাৎ বাংলা ১২৯৯ সনের ২৩শে আষাঢ়। ১২৯৯ সন ইংরেজী ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ। ষষ্ঠখণ্ডের প্রথমেও লেখক নিজের গ্রামের নাম 'সাকিন দেউলিয়া' বলে লিখেছেন। দেউলিয়া গ্রামেই মহাভারত দাসের বাড়ী ছিল। পঞ্চমখণ্ডের প্রথমেই তিনি লিখেছেন 'অথ গিরিলাল দাসের রচিত শব্দ-গান, নানারূপ সুরে'। দেউলা বা দেউলিয়া ও বাদলগাছি গ্রাম পূর্বে বগুড়া জেলায় ছিল। বর্তমানে রাজসাহী জেলার নওগাঁ সব-ডিভিসনের অধীন। বাদলগাছী থানা। শান্তাহার পার্বতীপুর রেলপথের আক্কেলপুর ষ্টেশন থেকে ছ-মাইল পশ্চিমে দেউলিয়া ও বাদলগাছি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত।

আজ থেকে প্রায় ১৪ বার বছর আগে অর্থাৎ ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পুথিটি পাওয়া যায়। বালুরঘাট শহরের অন্তর্গত বড় রঘুনাথপুর গ্রামের ৺জলধর মোহন্তের আখড়ায়। ৺জলধরের পূর্বনিবাস ছিল দেউলিয়া। দেশবিভাগের পর তিনি পুথিটি নিয়ে বালুরঘাটে আসেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী শ্রীযুক্তা সুভদ্রা মোহন্ত পুথিটি আমাকে দেন। ৺জলধর ছিলেন আমার প্রতিবেশী।

শ্রীযুক্তা সুভদ্রা মোহন্ত বলেন—বাংলা ১৩৩১ সনে বারবছর বয়সে ৺জলধর মোহন্তের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর বিয়ের প্রায় পনর বছর আগেই মহাভারত দাসের দেহান্ত হয়েছে। তাই সুভদ্রা মোহন্ত মহাভারত দাসকে দেখেননি। লোক মুখে তাঁর প্রশংসা শুনেছেন। তিনি ছিলেন রসিক, ভক্ত, সর্বদা গান-বাজনা নিয়েই থাকতেন। তিনি নিঃসন্তান। তাঁর সম্পত্তির অধিকারী হন তাঁর ভাগ্নে ৺শশী মোহন্ত। ৺শশী ছিলেন ৺জলধরের ভগ্নীপতি। দেশবিভাগের অনেক আগেই শশীর মৃত্যু হয়। তিনি ও নিঃসন্তান। তাই পুথিটি পান শ্যালক জলধর মোহন্ত।

বালুরঘাট শহরের পশ্চিম উপকণ্ঠে চকভৃগু নামে একটি গ্রাম আছে। সে গ্রামের অধিবাসী ৺ক্ষীরোদ ফৌজদার নামে এক বৃদ্ধবৈষ্ণব গিরিলাল সম্পর্কে আমাকে কিছু তথ্য দেন। ৺ক্ষীরোদবাবু ছিলেন নওগাঁ থেকে আগত একজন উদবাস্তু। তাই তিনি গিরিলাল সম্পর্কে অনেক সংবাদ জানতেন। তিনি সম্প্রতি লোকান্তরিত। তিনি বললেন, "গিরিলাল একজন উচ্চস্তরের বাউল-বৈষ্ণব সাধক, জাতিতে মাহিষ্য। তিনি কবি, নিজে গান রচনা করে গাইতেন। সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবেও তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তাঁর দেহ-

তত্ত্বের গান সুপ্রসিদ্ধ। বাংলাদেশের নওগাঁ সব ডিভিসনের পত্নীতলা থানার আয়াম নামক গ্রাম গিরিলালের আখড়া ছিল। তাঁর বড় ভাইয়ের নাম হরলাল। স্ত্রীর নাম সখী ঠাকুরাণী। তাঁরা নিঃসন্তান। বগুড়া, রাজসাহী, দিনাজপুর জেলায় তাঁর বহু শিষ্য ছিল। নওগাঁর কুমীরদহ নামক গ্রামে তাঁর সমাধি আছে। সেখানে প্রতিবছর তাঁর মৃত্যুতিথিতে উৎসব হত। কুমীরদহ আয়াম গ্রামের নিকটেই।

ক্ষীরোদবাবু গিরিলালের বাল্যজীবন সম্বন্ধে বলেন—"গিরিলাল বাল্যে আর দশজন বালকের সঙ্গে মাঠে মাঠে গরু চরাতেন। ক্ষুধা পেলে দুপুরে গরুর দুধ দুইয়ে পায়স পাক করে খেতেন। একদিন বালকদের ঝোঁক হ'ল—তারা গুরু-শিষ্য খেলা খেলবে। পায়স আগে গুরুদেবকে নিবেদন করবে, পরে প্রসাদ পাবে। পায়স পাক হল। এখন পায়স-নিবেদনের পালা। কিন্তু কে গুরু হবে? সবার অনুরোধে গিরিলালকেই গুরু হতে হল। গিরিলাল সুকণ্ঠ ও সুগায়ক, সুদর্শন ও শান্ত-স্বভাব। তাই বালকদের গুরু-নির্বাচনে ভুল হয় নি। এভাবে মাঠে মাঠে বালকদের গুরু-শিষ্য খেলা চলতে থাকে। গিরিলালের গুরু হওয়ার কথা গ্রামে গ্রামে রটে যায়। তখন সবাই তাঁকে উপহাসচ্ছলে গুরু বলে ডাকতে থাকে। ক্রমে গিরিলালের বয়স বাড়ে। তখন তাঁর মনে ভাবান্তর এল। তিনি ভাবলেন, সবাই যখন তাঁকে গুরু বলে ডাকে, তখন তাঁকেও গুরু হতে হবে, গুরুর মত চলতে হবে। তাই তিনি চুল-দাড়ি রাখলেন। ভজন গান গাওয়ার দিকেই তাঁর মনের ঝোঁক বেশী, সংসারের দিকে কম। গ্রামের সবাই তাঁর গান শুনতেও ভালবাসে। তিনি সবার প্রিয়। ক্রমে দীক্ষা নেবার জন্যে গিরিলালের মন ব্যাকুল হল তিনি সদ্‌-গুরুর সন্ধানও পেয়ে গেলেন। আয়াম গ্রামের ছ'মাইল দক্ষিণে দেউলিয়া গ্রাম। দেউলিয়া অদ্বৈত মহাপ্রভুর দ্বাদশ পাটের এক পাট। অদ্বৈত প্রভুর পুত্র কৃষ্ণমিশ্র। তাঁর পুত্র দোল-গোবিন্দ। এই দোলগোবিন্দের বংশধররাই দেউলিয়ায় বাস করতেন। সেই বংশের দীনবন্ধু গোস্বামীর কাছে গিরিলাল দীক্ষা নিলেন। দীক্ষান্তে গিরিলাল গুরুর কাছে সাধনভজনতত্ত্ব শিক্ষা করেন। তিনি তাঁর গানে সেই সব নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন, যাতে লোকে তা শুনে গ্রহণ করে। তিনি তাঁর প্রত্যেক পদের শেষে ভণিতায় নিজের নামের সঙ্গে গুরুর নাম-ও উল্লেখ করেছেন। বাউলরা গুরুবাদী। গিরিলাল ও গুরুবাদী।"

বিদ্যালয়ে গিরিলালের শিক্ষা কতদূর হয়েছিল তা সঠিক জানা যায় না। কিন্তু তিনি যে শিক্ষিত ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর গানের উচ্চভাব ও মার্জিত ভাষা। তাঁর গান যেমন সরস, তেমনি মার্জিত। কোন কোন গানের ভাব এত গভীর যে সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞ লোক ছাড়া অন্যকারও পক্ষে তা যথার্থ বিশ্লেষণ করা কঠিন। তিনি দুটি গানে দুটি ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—৮নং গানে ইংরেজী Hope (হোপ) শব্দটি 'হুপ'-রূপে ব্যবহার করেছেন। এই বিকৃত উচ্চারণ ছন্দের অনুরোধে বলে মনে হয়। ৭৫ নং গানে কলেরার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হোমিওপ্যাথির ওষুধ ক্যামফ্যার (Camphor)-এর শ্লিষ্ট প্রয়োগ করেছেন। এতে বোঝা যায় তিনি ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়েছিলেন এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও শিক্ষা করেছিলেন। এছাড়া বৈষ্ণবশাস্ত্র ভাগবতে, বিশেষ করে চৈতন্য চরিতামৃতে এবং নানা ভজনতত্ত্বে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর।

গিরিলালের পদের বিষয়—(১) গৌর-লীলা, (২) রাধাকৃষ্ণ-লীলা, (৩) দেহতত্ত্ব এবং (৪) ভজন-তত্ত্ব। গৌর-লীলার পদ ২৭টি, রাধাকৃষ্ণ-লীলার পদ ২৭টি, দেহ-তত্ত্বের

পদ ১৬ টি এবং ভজনতত্ত্বের পদ ২২টি। পুথির মোট পদ-সংখ্যা চুরানব্বই। কোন কোন পদের ভাব মিশ্র-প্রকৃতির। গিরিলালের আরও অনেক পদ হয়ত ইতস্তত ছড়ান আছে। সুধীজনেরা সে সব পদ সংগ্রহ করবেন। আজ দেশ বিভক্ত, তাই গিরিলালের জন্ম ও কর্ম-ভূমির নাম বাংলাদেশ। আশা করি সেদেশের গুণীরা গিরিলালের আর সব পদ, কবি ও তাঁর গুরুর পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহ করবেন।

গিরিলালের আবির্ভাব কালসম্বন্ধে নিশ্চয় করে, কিছু বলা যায় না। তিনি ২৫নং পদে দেহের হৃদ্‌পিণ্ড ও নাড়ী-সমূহের ক্রিয়াকে ডাক-ঘরের টেলিগ্রামের তার ও সংবাদ আদান-প্রদানের গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্রের ক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করে' বলেছেন—

"ঠিক ঠিক ঠিকের ঘরে ঠিক মিশায়ে ঠিক রয়াছে
টিকলায় বৈশে।
যে তারে নিহার করে ঠিকের ঘরে,
তারে তার সব যায় মিশে ॥"

"ঠিক ঠিক" অর্থ টিক্ টিক শব্দ। তা হৃদ্-পিণ্ডের ক্রিয়া-বিশেষ। 'ঠিকের ঘরে' মানে 'দেহে'। 'ঠিক রয়াছে টিকলায় বৈশে'—মানে ঠিক বা সত্য-স্বরূপ পুরুষ বা 'মনের মানুষ' টিকলায় অর্থাৎ দেহের উর্ধ্ব-স্থানে সহস্রারে বসে আছেন। দেহের নাড়ীরূপ তারগুলি তাঁর সঙ্গে যুক্ত। তিনি ঐ নাড়ী দ্বারা সব বুঝতে পারেন। সাধক সুষুম্না নাড়ী-পথে টিকলায় বা সহস্রারে উঠে পরম পুরুষকে দর্শন করতে পারেন এ দেহেই। এখানে অল্প কথায় রূপকচ্ছলে বাউল সাধনার সাধ্য-সাধনতত্ত্ব ব্যক্ত করা হয়েছে। মোর্‌স প্রথায় টেলিগ্রাম ভারতবর্ষে প্রথম চালু হয় কলকাতা ও ডায়মণ্ডহারবারে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তা মফস্বলেও চালু করা হয়। কাজেই এ গানটি যে তার পরে রচিত, তা বোঝা যায়। সম্ভবত ১২নং গানে সিপাহী বিদ্রোহের ইঙ্গিত আছে।

যেমন—"বেচা কিনা যা হবার হল দিন থাকিতে দোকান তোল,
ভবের হাটে লেগেছে গোল, কিজানি কখন কি ছুটে।"

"ভবের হাটে লেগেছে গোল"—সম্ভবত সিপাহী-বিদ্রোহের হাঙ্গামা। "কি জানি কখন কি ছুটে"—সম্ভবত কামান-বন্দুকের গুলি ছোড়া। সিপাহী বিদ্রোহের কাল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ।

১৭নং পদে "মহারাণীর শাসনভারি"-র উল্লেখ আছে। এই মহারাণী ভিক্টোরিয়া বলে মনে হয়। পদাংশটি হচ্ছে—

"যদি পয়সা নাই হাতে, চল যাই তিরটের পথে,
আছে মহারাণীর শাসনভারি, ভয় কি গো তাতে।
আনন্দে গাছতলায় রব, কাঙালিরা যায় যেমন।"

কবি এখানে বলেছেন—তিনি তিরট অর্থাৎ ত্রিহুতের পথে বৃন্দাবন যাবেন। ত্রিহুত বিহারের অন্তর্গত গঙ্গার উত্তর তীরের একটি জেলার নাম। সে যুগে এ পথেও হেঁটে বৃন্দাবন যাতায়াত করা হত। সম্ভবত মহারাণী ভিক্টোরিয়া তখন ভারতেশ্বরী। সিপাহী-বিদ্রোহের পরেই ভারতের শাসনভার বৃটিশ সরকারের অধীনে যায়। তখন ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডেশ্বরী। তিনি ভারতেশ্বরী হলেন। তাঁর রাজত্বকাল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সুশাসনের ফলেই দেশে সুখ-শান্তি ফিরে আসে। পদটিতে তারি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। নচেৎ বিদেশে নির্ভয়ে এবং সানন্দে যাতায়াত বা গাছতলায় থাকার প্রশ্নই উঠ্‌ত না। পদটিতে তৎকালীন উত্তরবঙ্গের একজন অখ্যাত

বাউলের গানে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সুশাসনের প্রশংসা ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ বলে মনে হয়।

কবি ১৫নং গানে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার ওষুধ ক্যাম্ফ্যারের শ্লিষ্ট প্রয়োগ করেছেন। মহামতি হ্যানেমান (১৭৫৫-১৮৪৩) প্রবর্তিত হোমিওপ্যাথী চিকিসা ১৮১০ থেকে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারত-বর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই ১৫নং পদটি সম্ভবত ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত বলা যায়।

যদি সিপাহী-বিদ্রোহের সময় কবির বয়স ৫০ পঞ্চাশ বছর ধরা হয় তবে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গিরিলালের জন্ম হওয়া সম্ভব। আর মহাভারত দাস যদি কবির জীবিতকালেই (১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে) গানগুলি সঙ্কলন করে থাকেন, তবে কবির শতায়ু হওয়া অসম্ভব নয়।

পদগুলিতে কিছু আঞ্চলিক উচ্চারণ-বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। এগুলি অনুলেখক মহাভারত দাসের না কবি গিরিলালের তা বলা শক্ত; যেমন, পদের, আদ্য 'অ'কারের উচ্চারণ প্রায় সর্বত্র 'উ'-কার। 'অনুরাগ' হচ্ছে 'উনুরাগ'। 'অমনি' হচ্ছে 'উমনি'। পদান্তে বা পদমধ্যে যুক্ত ব্যঞ্জনের শীর্ষে রেফের আগম দেখা যায়। যেমন—যাচ্ছে>যার্চ্ছে; আচ্ছা>আর্চ্ছা; জগন্নাথ>জগর্ন্নাথ; ব্রহ্ম>ব্রর্হ্ম; বাণিজ্য>বাণির্জ্য; বল্লভ> বর্ল্লভ। স্থানে স্থানে গোটা উচ্চারণের বিকৃতিও লক্ষণীয়: যেমন—স্তম্ভ>শ্রস্ত; বিষ্ণু> বিষ্টু ইত্যাদি। পদগুলির অর্থবোধ সহজ করার জন্যে যথাসম্ভব স্বাভাবিক উচ্চারণ ব্যবহার করা হয়েছে।

গিরিলাল গৌরপদে গৌরলীলার কারণরূপে বলেছেন—বৃন্দাবনের গোপীগণ কৃষ্ণভজনের জন্যে সর্বস্ব-ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু কৃষ্ণ তাঁদের নিষ্কাম প্রেমের কোন প্রতিদান দিতে পারেননি। তাই তিনি গোপীগণের নিকট ঋণী। তিনি তা শ্রীমদ্-ভাগবতে নিজে স্বীকার করেছেন (১০।৩২।২২)। এ প্রেম-ঋণ শোধ না করেই তিনি মথুরায় চলে যান, আর বৃন্দাবনে ফিরে আসেননি। কিন্তু ভগবান্ ভক্তাধীন। তাই কৃষ্ণ গোপীগণের প্রেম-ঋণ শোধ করার জন্যে রাধার ভাব ও কান্তি ধারণ করে নদীয়ায় গৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হন এবং সাড়ে চব্বিশ বছর গোপী ভাবে কাটান। স্বরূপ দামোদর বলেছেন—(১) রাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, (২) কৃষ্ণের নিজ মাধুর্য কিরূপ, (৩) এবং তা আস্বাদন করে শ্রীরাধার সুখ কত হল, তা জানার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ রাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করে গৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। গিরিলাল ভাগবত অনুসরণে প্রেমঋণের কথা বলে স্বরূপ দামোদরের কথিত গৌরাঙ্গাবতারের কারণত্রয় আরো স্পষ্ট করে ১৬নং পদে বলেছেন—

"অরে ও ভাই, নিতাই, বলি শুন,
থেকে থেকে কেঁদে ওঠে মন।
সাড়ে চব্বিশ বছর ব্রজছাড়া
দেখিনাই আর বৃন্দাবন॥
রাধা নামেতে দীক্ষা, রাধা নামেতে শিক্ষা,
ঋণ শুধিব রাধা নামে করিয়ে ভিক্ষা,
রাধার ভাব-কান্তি বিলাস আমি অঙ্গেতে করি ধারণ।
আমি পরেছি কৌপীন,
এবার শোধ করিতে ঋণ,

হলাম হাল সে বেহাল,
দীনের কাঙাল, দীনের দীন,
হল লোক দেখান কৌপীন পরা,
শোধ হইল না মহাজন ॥”

১৭নং পদে আছে—

“মহাজন মোর রাইকিশোরী,
তা বিনে কার করজ ধারি,
প্রেমময়ীর প্রেমের লেগে
হইয়াছি দীনের ভিখারী ॥

গিরিলাল কয়, দীনবন্ধু,
ঐ তো রে প্রেমের সিন্ধু,
করজ ত প্রেম একটি বিন্দু,
শোধ গিয়েছে হয়ে দ্বারী ॥”

কবি গৌর-নাগর-বাদী। তিনি অনেক পদে গৌরকে নাগর এবং নিজকে ও অন্য গৌর-ভক্তকে গৌর-নাগরী বা দাসী বলেছেন। এ বিষয়ে পদ নং ২০ ও ২১ দ্রষ্টব্য। তার কারণ কৃষ্ণ হচ্ছেন একমাত্র পুরুষ ও শক্তিমান্‌, আর জীব হচ্ছে তাঁর তটস্থা শক্তি। আর শক্তিমাত্রই স্ত্রী। পদ্মপুরাণের মতে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে আর সকলেই স্ত্রী। (‘গোবিন্দ এব পুরুষো ব্রহ্মাদ্যাঃ স্ত্রিয় এব চ’ পদ্মপুরাণ, পাতাল খণ্ড—৪৬/৫৭)। তাই জীব কৃষ্ণ-দাস নয়, কৃষ্ণ-দাসী। মধুররসাশ্রিত রাগানুগা-ভজনে কৃষ্ণকে প্রিয়তম এবং নিজকে কৃষ্ণের প্রেয়সী ভেবে ভজন করা স্বাভাবিক। ভক্তের ধারণা এতে তাঁর পক্ষে কাম-জয় সহজ হয় এবং কৃষ্ণ-নিষ্ঠা বাড়ে। বোধ হয় সেজন্য গৌর-সমকালীন নরহরি প্রভৃতি গৌরভক্তগণ গৌর-নাগর ভাবের পদ রচনা করেছেন। কিন্তু এ মত গৌরের রাধা-ভাবের বিরোধী। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনভিপ্রেত।

১নং পদটি গৌর-নাগর ও গৌর-নাগরী ভাবের পদ। যেমন—

“গৌর হে যাও দেখি যাবা কেমনে ?
আমি মন-সুতোয় বেঁধে থোব
হৃদ্‌মন্দিরের মাঝখানে ॥

অনেক দিনে হ’ল হে দেখা,
আজ মনোবাঞ্ছা পুরাইব, পেয়েছি একা,
এতদিন কোথায় ছিলে ? দাসীর কথা নাই মনে ?

রাধা-কৃষ্ণ-লীলার পদ :

গিরিলাল রাধাকৃষ্ণ-লীলার পদ রচনায় রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্য-লীলার অনুসরণ করেছেন। প্রকট বা বাহ্য মর্ত্য-লীলায় কৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ আছে কিন্তু নিত্য-লীলায় নেই; (১) তাই সেখানে রাধা-কৃষ্ণের বিচ্ছেদও নেই। কারণ কৃষ্ণ শক্তিমান্‌,

---

(১) বৃন্দাবনপরিত্যাগো গোবিন্দস্য ন বিদ্যতে।
(পদ্মপুরাণ-পাতাল খণ্ড—৪৩ অধ্যায়, ৬০)

রাধা তাঁর হ্লাদিনী শক্তি। উভয়ের বিচ্ছেদ অসম্ভব। কিন্তু সম্ভোগের পুষ্টির জন্য মর্ত্য-লীলার অনুসরণে ক্ষণিক বিরহের পদ গাওয়া হয়। মর্ত্য-লীলায় কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় এসে রাজা হয়েছেন। কুব্জা তাঁর পাটরাণী। বৃন্দাদূতী এসেছেন তাঁকে বৃন্দাবনে নিয়ে যেতে। দূতী বলেন—

"ব্রজ হইতে তোমায় লইতে, পাঠায়েছেন রাই কিশোরী।
যাবে কিনা যাবে আমায়, বলহে স্পষ্ট করি ॥ (পদ নং ৬৫)

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

"রাধা-কৃষ্ণ একই আত্মা, কেবলমাত্র দেহ ভিন।
প্রেমময়ীর প্রেম-ডোরে বান্ধা আছি রাত্রি-দিন ॥
শুন, বৃন্দে সহচরি, দিবা ছাড়া কি শর্বরী ?
ডাল ছাড়া কি হয় মঞ্জরী ?
জল ছাড়া কি বাঁচে মীন ?
এ কথা শুনেছ কেহ, প্রাণ-ছাড়া কী থাকে দেহ ?
কিশোরী প্রাণ, আমি দেহ,
আমি নিশী, প্যারী দিন ॥
আমি মধু-পুরী রাজা, রাই আমার হৃদয়ের রাজা,
মন-ফুলে করি পূজা, শোধ করিতে প্রেম-ঋণ ॥
গিরিলাল কয়, বৃন্দাদূতি,
আমি একা কুব্জা-পতি,
আমি কি জগতের ভিন্ ? (পদ নং ৬৬)

৭৪ নং পদটি রাধার অভিসারের পদ। ধ্বনিগৌরবে এবং চিত্রসম্পদে এ রচনাটি গোবিন্দ দাসের পদের সগোত্র :

চলে ধনী রাজ-নন্দিনী,
শ্যাম-প্রেমে হয়ে বিভোরা।
মদনের পঞ্চ-শরে অঙ্গখানি জরাজরা ॥

শরে বিদ্ধা কুরঙ্গিণী,
তেমনি দশা হয়ে ধনী,
আউলায়ে মাথার বেণী,
হয়ে যেন দিশাহারা ॥

মত্তকরি-গতি জিনি,
হংসিণী-গামিনী ধনী,
চলে যেন উন্মাদিণী,
ফণী যেমন মণি-হারা ॥

বেরাইল রাইয়ের সাথে,
সখীগণ সব যূথে যূথে,
গুঞ্জা-মালা লয়ে হাতে,
দিয়ে সব বাহনাড়া ॥

কাঙ্গাল গিরিলালে ভণে,
এই অভিলাস মোর মনে,
রাই-কানুর যুগল চরণে—
ঠিক যেন রয় নয়ন তারা ॥"

৭৯নং ও ৮০নং পদ দুটিতে বাৎসল্যরসের অপূর্ব চিত্র পরিস্ফুট। ভাব ও ভাষার সুচারু সম্মেলনে তা বাংলা-সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। ৭৯নং পদটি মা যশোদার উক্তি :

আজকার মত রাখাল রা যা,
রাখাল-রাজা যাবে না বনে।
প্রাণ-কৃষ্ণ দিয়ে গোষ্ঠে,
যে কষ্টে থাকি ভুবনে ॥

আজ ঘরে না হয় থাকবে গোপাল,
তোরাই লয়ে যারে গো-পাল,
নয়ন অঞ্জন গোপাল,
নয়ন ছাড়া করতে নারি।

গোপাল আমার নয়নের তারা,
পলকেতে হইলে হারা,
হই যেন দিশা হারা,
নয়নে বয় শত ধারা,
বল্লে কি তাই জানবি তোরা,
যত দুঃখ হয়ে মায়ের প্রাণে ॥

বাপরে, দিলেরে তোদেক নীল-রতন,
পাবনা সারা দিনের মতন,
বনে কে করিবে যতন,
গোপালের মুখ চেয়ে ॥

ক্ষুধাতে শুকালে বদন
খেতে দেই ক্ষীর ছানা মাখন,
অঞ্চল মুছায়ে বদন,
কোলে তুলে নেই তখন,
ননীর পুত্তলী তনু, রবির কিরণ সয় কেমনে ॥

বাপরে ! কথা শুনালে কানে,
বুকে যেন বজ্র হানে। নীলরতন কি যাবে বনে ?
নিতে কি এসেছ তাই ?
একদিন গিলেছিল বকাসুরে,
বলরাম তা রক্ষা করে,
আবার কি ঘিরিবে রে বাপ !

দুরন্ত কংসের চরে ?
গিরিলালের কপাল মন্দ
প্রাণ-গোবিন্দ দিব না বনে ॥

বাউল ধর্ম ও দেহ-তত্ত্ব

বাতুল-শব্দ থেকে বাউল শব্দ উৎপন্ন। বাতুল অর্থ পাগল। এ পাগল ঈশ্বরপ্রেমের পাগল। চৈতন্য-চরিতামৃতে অদ্বৈতাচার্য ও শ্রীচৈতন্য নিজেকে বহুবার বাউল ও মহাবাউল বলেছেন। সেখানে দুবার কৃষ্ণপ্রেমের পাগলকে "বাউলের প্রায়" বলা হয়েছে।' যেমন—

"সেইসব লোক হয় **বাউলের প্রায়**।
কৃষ্ণকহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায় ॥
(চৈ. চ., মধ্য, ১৬।১৬৭)

এবং

"এত কহি সেই চর হরি-কৃষ্ণ গায়।
হাসে, কান্দে, নাচে গায় **বাউলের প্রায়**।"
(ঐ, মধ্য, ১৬।১৮৯)

এতে বোঝা যায় বাউল ধর্মের ওপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বেশ স্পষ্ট। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেব সাধ্য যেমন রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন, বাউলের ও তেমনি দেহের মধ্যে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ সাধন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মে শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের দেহেই রাধা ও কৃষ্ণ যুগলরূপে বিরাজমান (রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ)। কাজেই দেহের মধ্যেও যে আরাধ্য বর্তমান, এ বিষয়ে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ও বাউল একমত। প্রভেদ এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধ্য মানব-দেহের বাইরেও আছেন, "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"। কিন্তু বাউলের সাধ্য একান্ত দেহ-গত। তা দেহের বাইরে নেই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ন্যায় বাউল ও রাগানুগা ভক্তি-তত্ত্বের উপাসক, বৈধী-ভক্তির বিরোধী। বাউল-সাধনার ওপর পূর্ববর্তী বৌদ্ধ ও হিন্দু-তন্ত্রের প্রভাবও লক্ষণীয়। বৌদ্ধের শূন্য ও করুণা, প্রজ্ঞা ও উপায়, কুলিশ ও কমল-যোগ, হিন্দু-তন্ত্রের শিব ও শক্তি-যোগ দেহাশ্রিত মিলন-মূলক। সর্বত্র পদ্ম ও নাড়ীর অস্তিত্বও লক্ষণীয়। বায়ু নিয়ন্ত্রণ এবং ব্রহ্মচর্য পালন সকলেরই অবশ্য কর্তব্য।

বাউল যাকে খোঁজেন তাঁর নাম অনেক। যেমন—মানুষ, মনের মানুষ, অধরা, পরশ-মণি, কৃষ্ণচন্দ্র ইত্যাদি। তিনি দেহে অধিষ্ঠিত। "অন্তর্যামী জীবন-স্বামী জানিয়ে অন্তর"—পদ নং ৬। 'মনের মানুষ' ছাড়া বাউলের আর কোন দেবতা বা ঈশ্বর নেই। উপনিষদে দেহকে ব্রহ্ম-পুর[১] ও ব্রহ্ম-কোষ[২] বলা হয়েছে। ব্রহ্ম দেহে বিরাজমান। গীতায়ও কৃষ্ণ বলেছেন—আমি সকলের হৃদয়ে আছি "সর্বস্যাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ"। বাউলের দৃষ্টিতে দেহ একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপে বর্ণনা করা বৈদ্যক শাস্ত্র চরক-সংহিতায়ই প্রথম দেখা যায়। চরকের শরীর-স্থানের পঞ্চম অধ্যায়ে আছে—

"ভগবান্ পুনর্বসু আত্রেয় বলেছেন—'মানব-শরীর বাহ্য জগতের তুল্য, বাহ্য জগতে যত প্রকার স্থূল পদার্থ আছে, পুরুষেও তত প্রকার এবং পুরুষে যতপ্রকার, বাহ্য

১. ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮।১।১ ২. তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ১।৪

জগতেও তত প্রকার আছে।' ভগবান্ আত্রেয় মুনি একথা বললে তাঁকে অগ্নিবেশ বললেন—'আপনার এ কথার অর্থ বুঝতে পারছি না। আপনি আবার বুদ্ধিমত কথাটা স্পষ্ট করে বলুন, আমরা শুনব।'

ভগবান্, আত্রেয় তাকে বললেন—'বাহ্য জগতে ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব অসংখ্য, আবার পুরুষেও ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব অনেক। তার মধ্যে উভয়ের যে যে স্থূলভাব সমান তাই উদাহরণরূপে বলছি। অগ্নিবেশ, আমি সেগুলি বর্ণনা করছি। তুমি মন দিয়ে তা শোন। বাহ্য জগৎ ছয়টি ধাতুর সমষ্টি। যেমন—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও অব্যক্ত ব্রহ্ম। এ ছয়টি ধাতু মিলিত হয়ে পুরুষের উৎপত্তি হয়। পৃথিবী সে পুরুষের মূর্তি গঠন করে। জল—ক্লেদ (স্রাব), অগ্নি—তাপ, বায়ু—প্রাণ, আকাশ—ছিদ্রসমূহ, এবং ব্রহ্ম—জীবাত্মা। জগতে যেমন ব্রহ্মের বিভূতি (প্রকাশ) আছে, সেইরূপ পুরুষেও অন্তরাত্মার বিভূতি আছে। লোকে ব্রহ্মের বিভূতি প্রজাপতি, পুরুষে আত্মার বিভূতি সত্ত্ব। লোকে যিনি ইন্দ্র, পুরুষে তিনি অহঙ্কার। লোকে যিনি আদিত্য, পুরুষে তিনি আদান। এরূপ লোকে রুদ্র, পুরুষে রোষ (ক্রোধ)। জগতে সোম (চন্দ্র), পুরুষে প্রসাদ, (প্রসন্নতা); জগতে বসুগণ, পুরুষে সুখ, জগতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পুরুষে কান্তি; জগতে মরুৎ, পুরুষে সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থ; জগতে তমঃ (অন্ধকার) পুরুষে মোহ; জগতে জ্যোতি, পুরুষেজ্ঞান; লোকে যেমন সৃষ্টি প্রভৃতি, পুরুষে তেমনি গর্ভাধান; জগতে যেমন সত্যযুগ, পুরুষে তেমনি বাল্য; জগতে যেমন ত্রেতা, পুরুষে তেমনি যৌবন; জগতে যেমন দ্বাপর, পুরুষে তেমনি বার্ধক্য; জগতে যেমন কলি, পুরুষে তেমনি রুগ্নতা; জগতের যেমন যুগান্ত, পুরুষে তেমনি মৃত্যু। অগ্নিবেশ! এরূপ এ অনুমানের দ্বারা জগৎ ও পুরুষের যে যে বিশিষ্ট অবয়বের কথা বলা হল না, তাদের মধ্যেও ঐক্য আছে জানবে।"

ভগবান্ আত্রেয়ের এ কথাগুলি শুনে অগ্নিবেশ বললেন 'আপনি জগৎ ও পুরুষের সাম্য বিষয়ে যা বললেন, তা অখণ্ডনীয় সত্য। জগৎ ও পুরুষের এ ঐক্যের কথার প্রয়োজন কি?' ভগবান্ আত্রেয় বললেন—অগ্নিবেশ! শোন যিনি সর্বজগৎকে নিজের মধ্যে এবং নিজেকে সর্বজগতের মধ্যে দেখেন তাঁর সত্যজ্ঞান জন্মে। যিনি সর্বজগৎকে নিজের মধ্যে দেখেন, তিনি বুঝতে পারেন, নিজেই নিজের সুখ-দুঃখের কর্তা, আর কেউ নয়। সমস্ত লোক স্বকর্মের অধীন। কারণ-বশত কার্য করে। 'সর্বজগৎই আমি' এ বোধ হলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এ জ্ঞানই মুক্তি দেয়। এখানে লোকশব্দের অর্থ অনেক বস্তুর সংযোগ। কারণ ষড়্-ধাতুর সমন্বয়েই সর্বলোক উৎপন্ন হয়।"

(পুরুষোঽয়ং লোকসম্মিত ইত্যুবাচ ভগবান্ পুনর্বসুরাত্রেয়ঃ। যাবন্তো হি লোকে মূর্তিমন্তো ভাব-বিশেষ স্তাবন্তঃ পুরুষে, যাবন্তোহি পুরুষে তাবন্তো লোকে; ইত্যেবং বাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ—নৈতাবতা বাক্যেনোক্তং বাক্যার্থমবগামহে, ভগবতা বুদ্ধ্যা ভূয়স্তরমতোঽনুবাধ্যায়মানং শুশ্রূষামহ) ইতি ॥ ৩ ॥

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ—অপরিসংখ্যেয়া লোকাবয়ববিশেষাঃ, পুরুষাবয়ববিশেষা অপ্যপরিসংখ্যেয়াঃ, তেষাং যথাস্থূলং কতিচিদ্‌ভাবান্ সামান্যমভিপ্রেত্যোদাহরিষ্যামঃ তানেকমনা নিবোধ সম্যগুপবর্ণ্যমানানগ্নিবেশ! ষড়্ ধাতবঃ সমুদিতাঃ লোক ইতিশব্দং লভন্তে, তদ্‌যথা পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং ব্রহ্ম চাব্যক্তমিতি, এত এব চ ষড়্ধাতবঃ সমুদিতাঃ পুরুষ ইতি শব্দং লভন্তে ॥ ৪ ॥

তস্য পুরুষস্য পৃথিবী মূর্তিঃ, আপঃ ক্লেদঃ, তেজোঽভিসন্তাপঃ, বায়ুঃ প্রাণঃ, বিয়ৎ সুশিরাণি, ব্রহ্ম অন্তরাত্মা। যথা খলু ব্রাহ্মী বিভূতির্লোকে তথা পুরুষেহ প্যান্তরাত্মিকী বিভূতিঃ, ব্রহ্মণো বিভূতির্লোকে প্রজাপতিরাত্মনো বিভূতিঃ পুরুষে সত্ত্বং যস্ত্বিন্দ্রোলোকে, স পুরুষেঽহংকারঃ, আদিত্য স্বাদানং, রুদ্রো রোষঃ, সোমঃ প্রসাদঃ, বসবঃ সুখম্, অশ্বিনৌ কান্তিঃ, মরুদুৎসাহঃ, বিশ্বেদেবাঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি সর্বেন্দ্রিয়ার্থাশ্চ, তমো মোহঃ, জ্যোতির্জ্ঞানং, যথা লোকস্য সর্গাদি তথা পুরুষস্যগর্ভাধানং, যথা কৃতযুগমেব বাল্যং, যথা ত্রেতা তথা যৌবনং, যথা দ্বাপর স্তথা স্থাবির্যং, যথা কলিরেবাতুর্যং, যথা যুগান্ত স্তথা মরণমিতি। এবমেতেনানুমানেনানুক্তানপি লোকপুরুষয়ো রবয়ববিশেষামগ্নিবেশ! সামান্যং বিদ্যাদিতি ॥ ৫ ॥

এবং বাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ—এবমেতৎ সর্বমনপবাদং যথোক্তং ভগবতা লোকপুরুষয়োঃ সামান্যম্। কিমস্য সামান্যোপদেশস্য প্রয়োজনমিতি ॥ ৬ ॥

ভগবান্ উবাচ—শৃণ্বগ্নিবেশ! সর্বলোকমাত্মন্যাত্মানং চ সর্বলোকে সমুপশ্যতঃ সত্য বুদ্ধিঃ সমুপদ্যতে। সর্বলোকং হ্যাত্মনি পশ্যতো ভবত্যাত্মৈব সুখ-দুঃখয়োঃ কর্তা নান্য ইতি। কর্মাত্মকাচ্চ হেত্বাদিভির্যুক্তঃ সর্বলোকেঽহমিতি বিদিত্বাজ্ঞানং পূর্বমুত্থাপ্যতেঽপবর্গায়েতি। তত্র সংযোগাপেক্ষী লোক-শব্দঃ। ষড়্ধাতু-সমুদায়ো হি সামান্যতঃ সর্বলোকঃ ॥ ৭ ॥

চরক জগৎ ও পুরুষ, ভাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্য-জ্ঞানকে মুক্তির কারণ বলেছেন। গিরিলাল ও ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীকরূপ দেহে স্বরূপের অর্থাৎ মনের মানুষের বা আত্মার খেলা-রূপ নিত্য-লীলা দেখাকেই কাল-শমন এড়াবার উপায় বলেছেন। চরকে যা নিছক জ্ঞান গিরিলালে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেম বা গুরুতত্ত্ব, ক্রিয়াঙ্গ ব্রহ্মচর্য ও যোগ। পথ ভিন্ন কিন্তু গন্তব্য এক। গিরিলাল ১৬ নং পদে এ সাধনতত্ত্বটি সুন্দর করে ব্যক্ত করেছেন :

"মদন-শোধন কর, সাধন করবি যদি, ওরে ও মন।
থাকিতে মদনের জ্বালা, পাবিনা তার অন্বেষণ ॥
শুন মন সাধনের তত্ত্ব, স্থির করে নিজ চিত্ত,
আত্ম-তত্ত্ব, পরতত্ত্ব, গুরু-তত্ত্ব কর যাজন ॥
শিখবিরে স্বরূপের মেলা, অটলঘরে বাধগা গোলা।
দেখবি কত নিত্যলীলা, পাবি রসের বৃন্দাবন ॥
স্বরূপে রূপ, রূপে স্বরূপ, খুঁজে দেখ আছে রস-কূপ।
একবার যদি দাও তাতে ডুব, মিলবে রে অমূল্যধন ॥
মন আমার ত্যজিয়ে ভ্রান্ত। রূপ সাগরে একবার নাম ত,
গিরিলাল কহে নিতান্ত এড়াইবে কাল শমন ॥"

আত্ম-তত্ত্ব হচ্ছে পুরুষ-তত্ত্ব, পরতত্ত্ব প্রকৃতি-তত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব হচ্ছে প্রেমতত্ত্ব বা পুরুষ-প্রকৃতির মিলন। পুরুষ হচ্ছেন রসিক শেখর, লীলাময়। এই অপরূপ দেহের মধ্যেই প্রেমময় পুরুষের প্রকৃতির সঙ্গে নিত্য-রসলীলা হয়। যাঁরা 'অটলঘরে গোলা বেঁধে' অর্থাৎ অস্খলিত ব্রহ্মচর্যে স্থিত হয়ে' কামকে প্রেমে রূপান্তর করেন, তারাই রূপসাগরে অবগাহন করে নিত্য-লীলা দেখতে পারেন। চিত্ত-জয়ী সাধক প্রেমের পথে নিজদেহে এই নিত্য-লীলা দেখে চরিতার্থ হন। গিরিলালের এই পদটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ৪৭নং পদের রূপ-সাগর ও অরূপরতনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। উভয়ের ভাষা ও ভাবের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

বাউল-সাধনা মূলত মিলন-মূলক। মিলন সৃষ্টির পূর্বাবস্থা—শক্তি ও শক্তিমানের অবিচ্ছিন্নাবস্থা। দর্শনের ভাষায় সে অবস্থার নাম 'লয়' বা 'অদ্বয়াবস্থা'। তখন কেবল সেই 'একই' অর্থাৎ 'পুরুষ'ই থাকেন। শক্তি থাকে তাঁর মধ্যে লীন। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের একশ উনত্রিশ নাসদীয় সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে সে অবস্থার পরিচয় আছে—'আনীদবাতং স্বধয়া তদেকম্' (ঋ. বে. ১০।১২৯।২)—অর্থাৎ সেই এক আনীৎ-প্রাণময়, অবাতং-বায়ু-শূন্য, অর্থাৎ দ্বিতীয়-রহিত, কিন্তু 'স্বধা'র সহিত মিলিত। এই স্বধা তাঁর শক্তি বা প্রকৃতি। গিরিলালের ভাষায় 'রাধাকৃষ্ণ একই আত্মা'।

একাকী অবস্থায় বিলাস-বৈচিত্র্য নেই। তাই লীলা-ও নেই। উপনিষৎ[১] বলে—'তিনি সুখ পান নি। কারণ একাকী কেউ সুখ পায় না। স্বামী ও স্ত্রী আলিঙ্গিত হয়ে যে পরিমাণ হয়, তিনি সে পরিমাণ হলেন। তিনি নিজকে দুভাগে ভাগ করলেন। তা থেকে পতি ও পত্নী জন্মাল'।

আত্ম-সুখের জন্য দ্বিতীয়কে চাওয়ার নাম কাম। সৃষ্টির আগে কাম জাগে 'একে'র মনে। তাই ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে—'কাম : সমবর্ততাগ্রে'। তাকে বলা হয়েছে—'মনসঃ রেতঃ'—মনের পরিস্পন্দন বা পরিণাম। 'একের' দুই বা বহু হওয়ার নাম সৃষ্টি। তা অধঃপতন—উপর থেকে নীচে নামা (অপাতয়ৎ)। একের বহু হওয়ার অর্থ অরূপের রূপে আসা, অসীমের সীমায় অবতরণ। গীতায়ও তাই বলা হয়েছে—'এ সৃষ্টির মূল ঊর্ধ্বে, তার বিস্তার বা শাখা নীচে'-(ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম্)। গিরিলাল বলেছেন—

> "উজানেই স্বরের স্থিতি, ভাইটালে হয় জীব উৎপত্তি,
> টলাটল দুইছাড়া মানুষ রয়॥" (গান নং ৩৮)।
> সেথা চন্দ্র-সূর্যের নাইকো গতি, রত্নবেদীর ছটায় দীপ্তময়॥

'স্বর'—বিন্দু-রূপী জীব, পুরুষের অংশ, চিৎকণ। 'ভাইটান'—স্খলিত হওয়া। টল—স্খলিত বিন্দু। অটল—অস্খলিত বিন্দু। পুরুষ তা থেকে ভিন্ন।

সৃষ্টি হচ্ছে প্রকৃতি-পুরুষের বিচ্ছেদ, অখণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করা। সেই 'এক'—আত্মলীন প্রকৃতি, শক্তি বা স্বধাকে সৃষ্টিরূপে স্বরূপ থেকে রূপে নামিয়ে দিলেন (দ্বেধাহ-পাতয়ৎ)। এক বহু হলেন। প্রত্যেক নর-নারীর দেহেও পুরুষ ও প্রকৃতির বিচ্ছেদ আছে। নর-নারীর দেহেও পুরুষ থাকেন মেরুদণ্ডের ঊর্ধ্বতম অংশে মস্তকে অর্থাৎ সহস্রারে। আর প্রকৃতি থাকেন নিম্নতম ভাগে মূলাধারে। তন্ত্রে তার নাম কুণ্ডলিণী শক্তি কুণ্ডলিনী শক্তি ত্রিগুণময়ী, অনন্ত সংস্কারের পুটলী। সার্ধত্রিতয়বলয়াকারে জীবকে বেষ্টন করে বিরাজমানা। 'নারীদেহ প্রকৃতির অংশপ্রধান। পুরুষের দেহ পুরুষের অংশ-প্রধান।' তাই নারীপুরুষের ভেদ। বিচ্ছেদ অবস্থার নাম নিদ্রা, কুণ্ডলিণীর পুরুষকে ভুলে থাকা। তখন তার অন্তরে সদা প্রদীপ্ত বিচ্ছেদের আগুন। তাই গিরিলাল বলেন—

> সে নদীর ভিতুরে আগুন,
> জলছে ত্রি-গুণ।
> কি করে যাবি পারে।
> একবার করিলে দৃষ্ট, 'ইষ্ট কৃষ্ট
> ভুলিয়া যায় সব একেবারে॥ (পদ নং ৩০)

---

(১) স বৈ নৈব রেমে। তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাহপাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্ (বৃ. আ. উ. ১।৪।৩)

মানব দেহে আছে অসংখ্য শিরা উপশিরা। এগুলির নাম নাড়ী। এদের মধ্যে তিনটি প্রধান। মেরুদণ্ডের বামে ইড়া, ডাইনে পিঙ্গলা, ও মধ্যে সুষুম্না। বাউলের ভাষায় জরদ-নদী ক্ষীরোদ নদী এবং প্রেমের নদী। এগুলি মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত বিস্তৃত। এদের মধ্যে সুষুম্না নাড়ী (Canal Centralis) শ্রেষ্ঠ। কারণ সে সকল নাড়ীর আশ্রয়। এ তিনটি নাড়ী মূলাধারে অর্থাৎ গুহ্যের ঠিক উপরে মিলিত হয়েছে। তখন এদের নাম ত্রিবেণী, বাউলের ভাষায় 'তৃপিনী'। এ হচ্ছে তিনটি নদীর মিলন বা সঙ্গম। এ মিলনের স্থানকেও ত্রিবেণী বলা হয়। তার পর তারা পৃথক হয়ে উপরে উঠে, ভ্রূ-যুগলের মধ্যে আজ্ঞা-চক্রে বা দ্বি-দল পদ্মে মিলেছে। তারপর সহস্রারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে! সেখানেও এদের নাম ত্রিবেণী। ঐ মিলনকেন্দ্রের নামও ত্রিবেণী। নীচের ত্রিবেণীর নাম যুক্ত ত্রিবেণী উপরের ত্রিবেণীর নাম মুক্ত ত্রিবেণী। বাউলের ভাষায় এ নাড়ীগুলি হচ্ছে 'নদী' বা 'ভব-নদী'। নদীতে যেমন নৌকাচলাচল করে, এ নাড়ীরূপ নদীতে কেবল বায়ু চলাচল করে না। সুষুম্না নাড়ীরূপ নদী পথে একদিন তরীরূপিণী কুণ্ডলিনী ও তাতে আরূঢ় চিৎ-কণ জীব সহস্রার থেকে মূলাধার চক্রে নেমে এসেছে। এ নেমে আসার নাম 'ভব' বা সংসারে জন্ম'। এ পথেই তরী-রূপিণী কুণ্ডলিনী জাগ্রত ও উর্ধ্বগামী হয়ে জীবকে সঙ্গে নিয়ে মেরুদণ্ডের মধ্যবর্তী পরপর পাঁচটি চক্র বা সংস্কার-গ্রন্থি ভেদ করে ওপরে উঠে প্রথমে আজ্ঞাচক্রে, পরে তারো ওপরে সহস্রারে 'মনের মানুষের' সঙ্গে মিলিত হয়। এ মিলন-সাধনই বাউল-সাধনার লক্ষ্য বা সাধ্য। বাউলের ভাষায় এর নাম 'ভব-নদী পার হওয়া'। এ ভব নদী পার হওয়ার সাধন বা উপায় ব্রহ্মচর্যপালনের মধ্যদিয়ে রাগানুগাভক্তির সঙ্গে যোগাঙ্গ কুম্ভক প্রভৃতির অনুষ্ঠান।

বাউলের সাধন-সঙ্গিনী হচ্ছে তার প্রকৃতি বাউলানী। প্রতিমাসে তিন দিন প্রকৃতিরূপিণী বাউলানীর দেহে মূলাধারে কুণ্ডলিনীতে রজঃ-প্রবৃত্তি হয়। সে তিন দিনের নাম 'অমাবস্যা'। তখন নারীর দেহ-মন রজোরূপ তমোদ্বারা ব্যাপ্ত থাকে। রসিক, মায়া-মুগ্ধ জীব বা 'পরশমণি' এই তিনদিন রজঃ-স্রোতে অবগাহন করার জন্য নারীর সহস্রার থেকে মূলাধারে নেমে আসে। বাউল রজঃপবৃত্তিরপর চতুর্থ দিনে মতান্তরে রজঃপ্রবৃত্তির তিন দিনই বাউলানীর সঙ্গে বিপরীতভাবে উপগত হয়ে যৌগিক উপায়ে নিজ উপস্থ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ('ভেকের মুখে দিয়ে ফণী'—পদ নং ৩৭) ঐ জীব বা পরশ-মণিকে' বাউলানীর উপস্থ রজঃ থেকে আকর্ষণ করে রজোমুক্ত করে নিজদেহে নিয়ে আসে এবং কুম্ভকের দ্বারা নিদ্রিতা নিজ তরীরূপ কুণ্ডলিনীকে জাগত করে তার সঙ্গে জীবকে যুক্ত করে, এবং পরে ঐ কুম্ভক দ্বারাই ঐ জাগ্রত তরীরূপ কুণ্ডলিনীও তাতে আরূঢ় জীবকে সুষুম্না-পথে উর্ধ্বগামী করে প্রথমে আজ্ঞাচক্রে পরে সহস্রারে 'মণিকোঠার শিরোমণির' সঙ্গে মিলিত করে। প্রকৃতি-রূপিণী কুণ্ডলিনী ও জীবের সঙ্গে মস্তকস্থ মনের মানুষের বা 'মণিকোঠার শিরোমণির মিলন সাধনই বাউলের সিদ্ধিলাভ বা মুক্তি। বাউল একে 'ভব-নদী পার হওয়া' বলেছেন। কারণ লীলাময় রস-রূপ পুরুষের সঙ্গে লীলাসাথী প্রকৃতি ও জীবের মিলনে তাদের বিচ্ছেদরূপ ভব-চক্রের চির অবসান ঘটে। যতদিন এ মিলন না হয়, ততদিন সৃষ্টিপ্রবাহ বা ভবচক্র অব্যাহত থাকে। ততদিন মায়ামুগ্ধজীব ভব-নদীতে হাবুডুবু খায়। প্রকৃতির মাধ্যমে জীব ও পুরুষের মিলন হলেই জীবের মুক্তি। ৩৭ নং পদে গিরিলাল তত্ত্বটি ব্যক্ত করেছেন :

"ও তৃপিনীর মাঝগহিণী
দেখব ডুবে কতই পানি।
ডুবে উঠে নিব লুটে মণি-কোঠার শিরোমণি ॥

একবার ডুবে আমি জানি
কতই আছে চুনি মণি,
তাইতে বৈসে বৈসে গণি,
এবার ডুবে হব ধনী।

বৈসে আছে মনে করে,
এবার আমি রূপ-সাগরে,
আনব ধরে পরশ-মণি ॥

রসিক হলে করে জব্দ,
এবার আমি করব হদ্দ,
দশ দরজা করব বন্ধ,
সৈদ্দ বুঝব জমিন খানি ॥

প্রভু দীনবন্ধু বলে বাঁকাকলে উর্ধ্ব নালে,
ডুবে থাকি সত্যরে লেলে,
ভেকের মুখে দিয়ে ফণী ॥

যোগাঙ্গ কুম্ভক গুহ্য বাউল সাধনার অন্যতম অঙ্গ। তা বুঝবার জন্য গিরিলাল কুম্ভক এবং কুম্ভকের দ্বারা জাগ্রত কুণ্ডলিনীকে কুমীর-রূপে বর্ণনা করেছেন। কুম্ভক ও কুণ্ডলিনীর নাম ও ক্রিয়ার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। উত্তরবঙ্গ নদীপ্রধান। নদীতে কুমীরের ভাটি থেকে উজানে যাতায়াত গ্রাম্যজন সকলেই জানে। তাই কুম্ভক ও কুম্ভকের দ্বারা জাগ্রত কুণ্ডলিনীকে কুমীর বললে লোকে উজান-সাধন-রূপ কঠিন যৌগিক প্রক্রিয়াকে সহজেই বুঝতে পারবে। কুমীর যেমন সহজেই ভাটি থেকে উজানে যায়, তেমনি গুরু ও শিষ্য কুম্ভকের সাহায্যে জাগ্রত কুণ্ডলিনী রূপ তরীতে চেপে মূলাধার থেকে উপরে সহস্রারে সহজেই উঠতে পারে। যেমন—

কুমীরের জলকপ আছে কে বলেছে,
বর্ষা খরা সমান তারে।
দেখ তার কতভাগ্য কাজ কি স্বর্গ,
পাত্র যোগ্য হলে পরে ॥
গুরু যায় পৃষ্ঠে চরে,
শিষ্য যায় তার চরণ ধরে।
করে সে দিগ্‌ নিরূপণ চতুর্ভুবন,
স্বর্গ-মর্ত পাতাল ঘুরে ॥ (পদ নং ৩১)

'মর্ত' হচ্ছে মূলাধার। 'স্বর্গ'—সহস্রার। সর্বত্র কুম্ভক ও কুণ্ডলিনীর অবাধ অধিকার। তাই এ 'কুমীর' জল-জন্তু কুমীর নয়। তাই তার জল-জনিত 'কফ' বা শ্লেষ্মা হয় না। তার বর্ষাও নেই, খরাও নেই। দুই-ই সমান।

কবি অন্যত্র বলেছেন—

"কাঙ্গাল গিরিলালের সাজ-সাধন,
দীনুর চরণ নিহার কৈরে,

কুম্ভীরেক সহায় করে,
পৃষ্ঠে চরে পারে যাবে অন্তঃপুরে" ॥ (পদ নং ২৮)

এবং

"দম দম মদন বৈশে নাসার পাশে
দম ছেড়না দেদম কৈষে,
প্রভু দীনবন্ধু বলে ঐরে লেলে,
ডুবলি না কেন উঠলি ভেসে" ॥

ইন্দ্রিয়-সংযম, ব্রহ্মচর্য-পালন এবং বিন্দু ধারণ সমস্ত ভারতীয় সাধনার মূল। তা ছাড়া বাউল সাধনার লক্ষ্য যে কামকে প্রেমে রূপান্তর করা তা অসম্ভব। গিরিলাল বহু গানে বারবার যোগাঙ্গ কাম-জয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন—

(১) থাক মন কাম-নগরে বসত করে
কপাট মেরে কামের দ্বারে" ॥ (পদ নং ২৮)

(২) মদন-শোধন কর, সাধন করবি যদি ওরে মন,
থাকিতে মদনের জ্বালা পাবি না তার অন্বেষণ ॥ (পদ নং ১৬)

(৩) ও ভাই করোঙ্গ লও হাতে, একটি দণ্ড সহিতে,
বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করি কুত্তা মারিতে।
করে মদনা-কুকুর ডুকুর ডুকুর।
কামড়ালে জ্বলে জীবন ॥ (পদ নং ১৭)

বাউলের সাধন-সঙ্কেত অধস্তন গানেও বলা হয়েছে :

"যে জন উত্তর ধারে যায়, ও সে কালাপানি পায়,
দক্ষিণ ধারে লোনাজলে, তরী জেরে যায়।
নদীর মাঝখানে চালায়ে তরী পাবি উজান ধার।

নদীর জোয়ার ভাটা বয়, আছে তাই বলে এক ভয়।
তরী কখন পড়ে অগাধ জলে, কখন ঠেকে যায়!
এবার অমাবস্যার যোগে নদী হয় গো একাকার ॥

প্রভু দীনবন্ধু কয়, ও সে কথা ত মিথ্যা নয়,
জগৎকে বুঝালাম। গিরিলালকে বুঝান দায়,
ও সে ঘাটে মাসান্তে পার তিনদিন পরে
কেউ কেউ হচ্ছে পার ॥ (পদ নং ৪৫)

প্রতি মাসে প্রকৃতি-দেহে রজঃ-প্রবৃত্তির তিনদিন অমাবস্যা—ঘোর তামসী রজনী তখন কামের প্রাধান্য। বাউল চতুর্থ দিনে বাউলানীর উপস্থ থেকে জীবকে ধরে এবং যাত্রী হয়ে জীবসহ তরীরূপ কুণ্ডলিনীকে নাড়ীরূপ নদীর মধ্যবর্তী সুষুম্না ধারায় উজান বেয়ে সহস্রারে পৌছে মনের মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়। এর নাম 'মাসান্তে নদী পার' হওয়া। 'উত্তর ধার'—ইড়া, 'দক্ষিণ ধার'—পিঙ্গলা এবং নদীর 'মাঝখান' হচ্ছে—সুষুম্না নাড়ী পথ। জোয়ার ভাটা—রজঃ প্রবৃত্তি ও তার নিবৃত্তি।

২৮নং পদে বাউল-সাধনার তত্ত্বটি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—

যোগাযোগ একই হইলে সময় পেলে
মানুষ মিলে পূর্বদ্বারে।
সে দেশে যাবি যদি ছাড় বিধি
বসত কর নদীর তীরে ॥
সে রসিক এমনি নেয়ে
দিচ্ছে খেয়া— আইসা যাওয়া তিনদিন পরে ॥

থাক মন কাম-নগরে বসত করে,
কপাট মেরে কামের দ্বারে।
সে ঘাটে মাসান্তে পার কেউ হচ্ছে পার
মন আছে যার মুনি-পুরে ॥

কাঙ্গাল গিরিলালের সাঙ্গ-সাধন
দীনুরচরণ নিহার করে,
কুম্ভীরেক সহায় কৈরে,
পৃষ্ঠে চরে পারে যাবে অন্তঃপুরে ॥

'পূর্বদ্বার'—রাগানুগা ভক্তি (চৈতন্যচরিতামৃত-২।২০।১৩৩); বাউল 'রাগানুগা ভক্তির পথিক'; 'বিধি'—বৈধীভক্তি; ইহা বাউল সাধনায় উপেক্ষিত; 'নদীর তীরে'—সুষুম্না নাড়ীর পথে; রসিক-জীবাত্মা—'নেয়ে'। 'তরী'—কুণ্ডলিনী শক্তি; 'তিনদিন পরে'—রজঃপ্রবৃত্তির তিনদিন পরে চতুর্থ দিনে; 'মুনি-পুরে'—সহস্রারে; যদি 'মণিপুর'কে উচ্চারণ বিকৃতিতে 'মুনিপুর' ধরা হয়, তবে মণি-পুর অর্থ-সম্প্রসারণে মূলাধার; মণিপুর থেকে মূলাধার কামের রাজ্য; তা সাধককে জানতে হয়; 'অন্তঃপুর'—সহস্রার; 'কাম-নগর'—দেহ; 'কুম্ভীর'—কুম্ভক ও কুম্ভকদ্বারা জাগ্রত কুণ্ডলিনী-শক্তি।

'কামের দ্বারে'—উপস্থ ইন্দ্রিয়ে; 'কপাট মেরে'—ব্রহ্মচর্য পালন করে, বিন্দু-ধারণ করে; উপনিষদে উপস্থকে বলা হয়েছে—আনন্দ-কেন্দ্র।

৪৪নং গানেও বাউল-সাধন-তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে—

"ঢেউ নাই তরঙ্গভারি, সে নদীর তিন মোহনা,
ও তিন ঘাটেতে বৈসে আছে
ব্রহ্মা বিষ্ট শিব তিনজনা।

সেই নদীর মধ্যস্থলে
তিনফুল ফুইটাছে এক মৃণালে।
ও সে রসিক হলে জেন্তে পারে,
অরসিকে ঠিক পাবে না ॥"

এখানে 'নদী' নাড়ী; 'তিন মোহনা'—ইড়া, পিঙ্গলা, ও সুষুম্না; 'মধ্যস্থলে'—সুষুম্না-পথে; 'তিন ফুল'—প্রকৃতি-দেহে তিনদিন রজঃ প্রবৃত্ত হয়; সে তিন দিনের রজঃ এখানে তিনফুল; 'এক মৃণালে'—প্রকৃতি দেহে বা মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীতে।

বৈষ্ণব সাধন ভজন তত্ত্ব

গিরিলাল বাউল বৈষ্ণব। কাজেই চৈতন্যচরিতামৃত অনুসরণে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার করেছেন। তিনি রাগানুগাপন্থী। ৬নং পদে ব্রজগোপীর ভাব ধরে অন্তর ও বাহ্য সেবার পথে প্রবর্তক, সাধক ও সিদ্ধ হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন:

"যাবি যদি শ্রীবৃন্দাবন ব্রজগোপীর ভাব ধর।
ব্রজগোপীর ভাব ধর, রে মন, ব্রজগোপীর ভাব ধর॥
গুরুপদে আশ্রয় লয়ে বৈষ্ণব সেবা কররে মন।
অন্তর্বাহ্য দুটি সেবা, সেবা আছে আর সেই বিষম সেবা,
নইলে কেবা ঠিক পাইবে তার॥
সেই সেবা লয়ে সেবক নামটি যদি ধরতে পার,
হবে প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধি তাহার ভিতর॥
ইঙ্গিতে সাধিবে সেবা করি অঙ্গীকার।
অন্তর্যামী জগৎস্বামী জানিয়ে অন্তর॥" (৬নং পদ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত সখীভাবে কৃষ্ণ-সেবার আদর্শ, মনে হয়, পদ্মপুরাণ থেকে নেওয়া। সেখানে আছে—'সযত্নে কৃষ্ণের প্রিয়-সখীভাব আশ্রয় করে রাত্রিদিন নিরলসভাবে রাধা-কৃষ্ণের সেবা করবে'[১]। গিরিলাল তা নিয়েছেন।

সকল ভজনের শ্রেষ্ঠ উপায় নাম-যজ্ঞ। নাম কলির মহামন্ত্র। এতে মূর্তি, মন্দির, গুরু-পুরোহিত এবং মন্ত্রাদির অপেক্ষা নেই। চৌষট্টি অঙ্গ সাধন-ভক্তির শ্রেষ্ঠ অঙ্গ এই নাম-সংকীর্তন। শ্রীচৈতন্য 'নাম-প্রেম মালাগাঁথি পরাইল সংসার।'

গিরিলাল ৮৫নং পদে সরস ভাষায় এই নাম-যজ্ঞের মহিমা কীর্তন করেছেন:—

"কেন মনাগুনে মনে মনে
মরিস জলে পুড়ে।
যারে ডাকিলে অঙ্গ শীতল করে
ডাকিস না কেন তারে॥

কেন কর হেলা, গেল গেল বেলা,
বৈস নামের মালা পরে।
ডাক ঐ মধুসূদন, মুরলি-বদন,
স্মরজ্বালা যাবে দূরে॥

কিবা অজ্ঞ-বিজ্ঞ সকলের যোগ্য,
নাম-যজ্ঞ করিবারে।
এ নাম খেতে নিতে শুতে,
পথে চলে যেতে
যে মতে যে জন পারে॥

১। কৃষ্ণ-প্রিয়সখীভাবং সমাশ্রিত্য প্রযত্নতঃ।
তয়োঃ সেবাং প্রকুর্বীত দিবানক্তমতন্দ্রিতঃ॥
পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড, অধ্যায় ৫১।৪৬

যত মনকষ্ট হবে নষ্ট,
বল 'হরে কৃষ্ণ হরে'।
এ নাম নির্ধনীয়ার ধন
অন্ধ জনের নয়ন,
পাপ তাপ সব হরে ॥

বলে দীনদয়াল, ওরে, গিরিলাল,
ফেল মায়াজাল ছিড়ে।
এ নাম মথি সকল তন্ত্র,
নাম মহামন্ত্র,
জপ জিবা-যন্ত্র করে ॥"

কবি ৩নং পদে 'হরিনামের ঘর' তৈরী করে তাতে বসত করতে বলেছেন। এখানে ভাব ও ভাষার সার্থক যুগলমিলনে মর্তে অমর্তলোকের আভাস ফুটে উঠেছে। বাংলা পদাবলী সাহিত্যে এর অনুরূপ পদ বিরল :

"হরি নামের বাঁধিয়ে ঘর,
তাতে বসত কর,
ঘরে পরবে না জলবৃষ্টি বাদল,
মনরে, কত বয়ে যাবে তুফান ঝড় ॥

ঘর দেখতে হবে পরিপাটি,
ষোল নামের ষোল খুটি,
রাধাকৃষ্ণ গাইর ছুটি,
ঘরে, অধ উধ ঠিক করিয়ে, মনরে,
বাঁধ পঞ্চনামে পঞ্চশর ॥

বাঁধিয়ে বাতা পঞ্চবাণে,
গাথিয়ে ছাটন পঞ্চগুণে,
লতাচন্দ্র চারি কোণে,
সাড়ে চব্বিশ অক্ষর ছাউনী খড়, মনরে,
ঘরের মাটকা মার মূল মন্তর ॥

ঘরে জলিয়ে দাও মন প্রেমের বাতি,
জলবে সমান দিবা-রাতি
অনুরাগের কপাট দুয়ারে আট মনরে,
ঘরে পারবে না যেতে শমন চোর ॥

কাঙ্গাল গিরিলাল কয় মনের ভাবে,
ঘর রাখবি যদি ভাবে ভাবে,
চিরদিন সমান যাবে,
ঘরে নিতুই নূতন করবি যতন, মনরে,
দীনবন্ধুকে ঘরামি ধর ॥"

'বঙ্গাল-বাণী'র ব্যাখ্যা

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ কবি বঙ্গাল রচিত দুটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। তার একটিতে বলা হয়েছে যে, গঙ্গা ও বঙ্গাল-বাণীতে অবগাহন করে লোকে পবিত্র হয়। প্রথমে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বলেছিলেন, এখানে "কবি আত্মপ্রশংসার ছলে বঙ্গবাণীর জয় ঘোষণা করিয়াছেন।" এর অর্থ আমি বুঝেছি, সুকুমারবাবুর মতে এতে বঙ্গালের বাণী অর্থাৎ কবির নিজের বাণীর প্রশংসাছলে বঙ্গবাণী অর্থাৎ বাংলাভাষার জয় গাওয়া হয়েছে। অতঃপর পরলোকগত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'বঙ্গাল-বাণী'র বাংলাভাষা অর্থটির উপর কিছু জোর দেন এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় শব্দটিকে বাংলা-বাণী অর্থাৎ বাংলাভাষা-অর্থে ব্যবহার করেন। আমার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (শ্রাবণ, আশ্বিন, ১৩৮৮, পৃষ্ঠা ১-৩)-তে প্রকাশিত প্রবন্ধে আমি দেখাতে চেয়েছি যে, 'বঙ্গাল-বাণী'র 'কবি বঙ্গালের বাণী' অর্থটাই গ্রহণীয়, 'বাংলা ভাষা' অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়। আমার এই ব্যাখ্যাবিষয়ে আমি একসময় প্রবোধবাবু এবং সুকুমারবাবুর সঙ্গে কথা বলেছিলাম এবং তাঁদের দুজনেকেই আমার মতের অনুকূল বুঝেছিলাম। সম্প্রতি প্রবোধবাবু তাঁর পূর্বমত ত্যাগ করে আমার ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছেন. শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বপনকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'উদীচী' প্রত্রিকার আষাঢ়-১৩৮৯ সংখ্যায় তাঁর 'বাঙালি জাতি ও বাংলার জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "এই শ্লোকের 'বঙ্গালবাণী'কথার ব্যাখায় কিছু মতভেদ আছে। কারও মতে বঙ্গালবাণী মানে বংলাবাণী, আর অন্য মতে বঙ্গালকবির বাণী সংস্কৃতভাষায়। এই দ্বিতীয় মতটাই যুক্তিসঙ্গত বলে আমার ধারণা।" (পৃষ্ঠা ৩) এ বিষয়ে সুকুমারবাবুর সম্প্রতি প্রকাশিত কোনও রচনা আজও আমার চোখে পড়ে নি।

এদিকে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার কার্তিক-পৌষ ১৩৮৮ সংখ্যায় (পৃষ্ঠা ১৩০-৩৬) শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয় আমার 'বঙ্গাল-বাণী'র ব্যাখ্যা বিষয়ক সমস্ত যুক্তি-জালকেই নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আমার ব্যাখ্যা ভুল এবং 'বঙ্গাল-বাণী'র বঙ্গবাণী অর্থাৎ বাংলা ভাষা অর্থই ঠিক।

জগদীশবাবুর প্রথম মারাত্মক কথা এই যে, সুকুমারবাবু যে-বঙ্গবাণীর জয়-ঘোষণার কথা বলেছেন, সে বঙ্গবাণী বাংলাভাষা নয়। তিনি 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থটির ১৯৬৩ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১) সালের সংস্করণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখান যে, সেখানে সুকুমারবাবু লিখেছেন, "আমরা শ্লোকটিকে বঙ্গালকবির আত্মশ্লাঘা বলিয়া না লইয়া চিরদিনের বঙ্গবাণীর এবং চিরকালের গঙ্গার প্রশস্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারি।" এ থেকে আমি বুঝি, সুকুমারবাবুর পরিবর্তিত মত অনুসারে বিতর্কিত শ্লোকের 'বঙ্গাল-বাণী' শব্দে বঙ্গালকবির উল্লেখ নেই, ওর অর্থ কেবল বাংলাভাষা। কিন্তু জগদীশবাবুর ব্যাখ্যাটি বেশ চমকপ্রদ। তিনি বলছেন যে, 'চিরদিনের বঙ্গবাণী' নাকি সুকুমারবাবু বাংলাভাষা অর্থে ব্যবহার করেন নি। তবে ব্যাপারটা কি? বঙ্কিমবাবু বলেছিলেন, দুহাজার বৎসর মধ্যে বাংলায় মাত্র দুজন কবি দেখা গিয়েছে—জয়দেব এবং মধুসূদন। এখানে নাকি সংস্কৃত-বাংলা মিলিয়ে বাঙালীর ভাষার ইঙ্গিত আছে এবং সেটা নাকি সুকুমারবাবুর

'বঙ্গবাণী' এবং 'চিরদিনের বঙ্গবাণী'। এই অপরূপ ব্যাখ্যা সুকুমারবাবুর অনুমোদিত বলে বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ আজ যদি কেউ বাঙ্গালীজাতির সুবিখ্যাত কবিদের মধ্যে জয়দেব, রবীন্দ্রনাথ এবং সরোজিনী নাইডুর নাম করেন, তবে তো ইংরাজী ভাষাকেও ঐ 'বঙ্গবাণী' এবং 'চিরদিনের বঙ্গবাণী'র মধ্যে গণ্য করতে হয়।

"বঙ্গাল কোনো কবির ব্যক্তিনাম কিনা", এই সমস্যা নিয়ে জগদীশবাবু অনেক আলোচনা করেছেন। আমি এ সম্পর্কে আগে যা বলেছি, তার বেশী আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। 'বক্রিমা' ও 'বক্রোক্তি' এক কিনা, 'বক্রোক্তি কাব্যনিপুণ' ও 'বক্রোক্তি অলংকাররচনানিপুণ' সমার্থক কিনা, এ বিচারও তৃতীয় পক্ষ করলে ভাল হয়। 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ বঙ্গালের নাম করে যে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে, আমি তাতে বক্রোক্তি অলঙ্কার দেখতে পেয়েছি; কিন্তু জগদীশবাবুর মতে তাতে বক্রোক্তি নেই। আছে কিনা, তার বিচার তৃতীয় পক্ষের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি।

বঙ্গালকবির কোনও কাব্য এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি বলেই ধরা চলে না যে, তাঁর কোনও কাব্যকৃতি ছিল না। কারণ রাজপ্রশস্তি রচয়িতাদের মধ্যে হরিষেণ, রবিকীর্তি, উমাপতিধর প্রমুখ অগণিত উচ্চশ্রেণীর কবির কাব্যাদি এখন বিলুপ্ত। কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র', কল্হণের 'রাজতরঙ্গিণী' প্রভৃতি বহুগ্রন্থে বিলুপ্ত নাটক, ইতিহাস ইত্যাদির উল্লেখ আছে। পরমার ভোজের জনৈক সভাকবি ছিলেন ছিত্তপ; তাঁর উপাধি ছিল 'মহাকবি চক্রবর্তী'। কিন্তু তাঁর কোনও কাব্য আমাদের হস্তগত হয় নি। এ রকমের শতশত দৃষ্টান্ত আছে।

বাদাল প্রশস্তিতে বলা হয়েছে যে, কলিকালবাল্মীকি গুরবমিশ্রকৃত ধর্মেতিহাস-বিষয়ক পর্ব(গ্রন্থাংশ মালায় শ্রুতিসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছিল, এবং এর পরই বলতে দেখি, স্বর্গগঙ্গার ন্যায় সেই কবির বাণী লোককে আনন্দিত ও পবিত্র করে। এখানে 'বাণী' শব্দে আমি 'পর্ব' (গ্রন্থাংশ) অর্থই স্বাভাবিক মনে করেছি। কিন্তু জগদীশবাবুর মতে গুরবমিশ্রের শিষ্যগণ তাঁর মুখের কথায় প্রীত ও পূত হতে পারেন। তিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-এর উদাহরণ দিয়েছেন। কিন্তু বাঙ্গালপ্রশস্তির কবি কলিকালবাল্মীকি গুরবমিশ্রের 'পর্ব' বা গ্রন্থসমূহের উল্লেখের পর তার বাণীর কথা বলেছেন। তা সত্ত্বেও যে বাণী-অর্থে লেখকের মুখের কথা বুঝতে হবে, এমন সূক্ষ্ম বুদ্ধি সকলের না থাকতে পারে।

আর একটি কথা বলে বর্তমান আলোচনার উপসংহার করছি। বঙ্গালকবির বিতর্কিত শ্লোকটির চতুর্থ পাদের অন্তিমবর্ণ 'চ' কোনও পাঠ অনুসারে দীর্ঘ বলে গণ্য করতে হবে। তা না করে আমি ভুল করেছিলাম। আমার চোখে ভুলটি যখন ধরা পড়ল, তখন ইংরেজী প্রবন্ধে সংশোধন করা সম্ভব হল; কিন্তু বাংলাতে সংশোধনের আর সময় ছিল না। অবশ্য এর সঙ্গে 'বঙ্গাল-বাণী'র ব্যাখ্যার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ কিছু নেই।

'বঙ্গাল বাণী'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ঃ

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় বঙ্গাল-বাণী সম্পর্কে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ৮৮ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় [শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৮] তাঁর অভিমত প্রবন্ধাকারে ব্যক্ত করেছিলেন। সে সম্পর্কে পরবর্তী সংখ্যায় আমি আমার বক্তব্য প্রকাশ করেছি। বর্তমান সংখ্যায় অধ্যাপক সরকার পুনশ্চ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তার একস্থানে তিনি লিখেছেন, 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ বঙ্গালের নাম করে যে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে, আমি তাতে বক্রোক্তি অলংকার দেখতে পেয়েছি ; কিন্তু জগদীশবাবুর মতে বক্রোক্তি নেই। আছে কিনা তার বিচার তৃতীয় পক্ষের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি।" আমি বলি শুধু বক্রোক্তি অলংকারই নয়, সমগ্র বিষয়টিই তৃতীয় পক্ষ বিচার করে দেখুন। অলমতিবিস্তরেণ।

জগদীশ ভট্টাচার্য

অপ্রকাশিত ময়মনসিংহ গীতিকা

শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ বর্মণ

[বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ও দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংকলিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা' পাঠ করে এরূপ আরও গীতিকাব্য সংগ্রহ করার প্রবৃত্তি এক সময় মনে জেগেছিল। সেন মহাশয়ের গীতিকাব্যে ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমান্তর্গত বাজিৎপুর ও অষ্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত কোন কাব্যের সংকলন নেই বললেই হয়। আমি ঐ অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে কয়েকটি গীতিকাব্য সংগ্রহ করেছিলাম এবং দীর্ঘ ৫৫ বৎসর ঐগুলি বাক্সবন্দী হয়েছিল। আজ যখন সংসারের সব দায়-দায়িত্ব ত্যাগ করে শেষ নিঃশ্বাসের প্রতীক্ষায় বসে আছি, তখন বহু পরিশ্রমে সংগৃহীত কবিতা সমষ্টিকে বিনষ্ট করার চেয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে সমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করে পরিষৎ-কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানালে পরিষৎ-কর্তৃপক্ষ অনুগ্রহ করে যথোচিত ভাবে কবিতাগুলি সংরক্ষণ ও প্রচারের আশ্বাস দেওয়ায় আমি সানন্দে আমার সংগৃহীত কবিতাসমষ্টি পরিষৎ-কর্তৃপক্ষকে সমর্পণ করলাম। পরিষদের বদান্যতার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।—সংকলক]

(১)

বিদেশী বন্ধুয়ার সনে কি মোর পীরিতি
সে তো নয় আমারি
সাজায়ে বাসর শয্যা শ্যাম
করি শূন্য কুঞ্জ পরে না আসল হরি।
কার কুঞ্জেতে মনচোরা রইল মন করে চুরি।
গাঁথিয়া মালতির মালা কার গলে পরাইব
কে আছে আমার
মালা হইল বিষম জ্বালা, সে জ্বালায় জ্বইলা মরি।
অগুরু চন্দন চোয়া কটরায় ভরি
আশা ছিল শ্যাম অঙ্গে লেপন করি
সে আশা নিরাশ হইল পুনঃ না হই সহচরি।
গোপনে আসিয়া কেন রইল গোপন
না জানিয়া কঠিনে আমি সপেছি জীবন
সাধে কি বিবাদে বন্ধু দিল এ দাগাদারী।
পাবে বাঁকা সখা তোমায় আনন্দে বলে
অলি রইতে পারে নলিনীরে ভুলে
পাবে কালা যাবে জ্বালা ধৈর্যমান কর প্যারী॥

(২)

নিশি পোহাইলরে এস শঠ লম্পট নাগর
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শ্যাম পোহাইল নিশি
প্রভাত সময়ে চলে যথা কমলিনী।

আস্তে আস্তে ধরাধরি মধ্যে কৃষ্ণে রাখি
ঘিরিয়া ঘিরিয়া চলে যত গোপনারী।
অরুণ লোচন বেশ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া
ঘুমের আলস্তে চলে হেলিয়া দুলিয়া।
অভিমানে কমলিনী ভাগ্য সমান
প্রভাত সময় কালে না তুলে নয়ান॥

(৩)

প্রভাতে কি জন্য এসেছ হরি
যাও যাও জানা গেল ওরে বংশীধারী।
শুকাইয়া আছে মুখইন্দু কঙ্কনের দাগ লেগেছে বন্ধু
ভাল চাঁদ মুখে তাম্বূলের চিহ্ন দিল কোন নারী॥
ঘুমে আলুঢুলু আঁখি কপালেতে সিন্দুর পরা দেখি
ভাল নাগর হয়ে সিন্দুর পরে দেখালে হরি॥
রমণীর অঞ্চলের কালি চাপা যায় না হে বনমালী
ভাল নাগর হয়ে নারী বশ না করিলে হরি॥
যেখানে গত রজনী, তথা চলে যাও গুণমণি
এথা মান ··· ··· ··· হয় মালিনী॥
বলে ভট্ট রঘুনাথে ছিল বন্ধু চন্দ্রার মন্দিরে
ভাল প্রেমরসে সউল্লাসে পাশরে শর্বরী॥

(৪)

ভোর হইল সুখ যামিনী
কুহু কুহু রবে প্রাণ যাবে আসিল না গুণমণি।
সই, পুষ্প সজ্জা বাসী হইল শ্যাম কোথায় জানি
কার কুঞ্জেতে বসে রইল সাধের নীলকান্ত মণি।
সই, ভ্রমরা ভ্রমরী গুনগুন ধ্বনি
গুন গুন গুনে নৃত্য করে মওরা মওরাণী।
বিফলে গহিল আমার গত রজনী
এক পুষ্প সজ্জা বাসী হইল, আসল না গুণমণি,
রজনী প্রভাত হইলে উদয় হয় দিনমণি
বাঞ্ছাপূর্ণ হইল না গো বঞ্চিয়াছে স্বর্ণমণি।

(৫)

সুখ বসন্ত সময়ে নবীন কোকিলার সাথে
রাধা কৃষ্ণ বলে
মাঘ বাহিয়া যায়—ফাগুন প্রবেশ
নবীন বসন্ত আইল হিমালয়ের দেশ।
জাগ জাগ কমলিনী মাধবে সুধায়
এই স্থান হইতে প্রস্থান করি তোমাতে বিদায়।

একবার পারলেনা ঘুম ভাঙ্গাইতে
বসতে ও রাই কমলিনী
আমি ধরে তুলি তোমায়
বলি চক্ষু মেল মইলানি।
রজনী প্রভাত হইল পূর্বে উঠে ভানু
রাধিকার অঞ্চল ধরে বিদায় মাগে কানু।

(৬)

গোকুল ছেড়ে এসে হরি উদয় হলে বৃন্দাবন
আজ গোকুলে অন্নপ্রাশন।
যশোদার ধন নীলরতন, আজ গোকুলে অন্নপ্রাশন ॥
শ্রীনন্দের নন্দন শ্রীমধুসূদন বলে চাইনা রত্নধন
নীলমণিরে কোলে নিয়া চুম্বন দিছে চাঁদবদন ॥
যতেক সখীগণ নবীন, কেবল করছে কৃষ্ণ আলাপন
নয়নঠারে প্রাণ বিঁধুরে হেরে নারী অচেতন।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ করে বেদ উচ্চারণ হেরে ব্রহ্ম সনাতন
ব্রহ্মচারী কোলে নিয়া মুখে দিছে সর লবণ।
বলে বৈদ্যনাথ বর্মণ, শ্রীদুর্গা স্মরণ গো
তারা করেছে দু'জন
ধন্যরাণী পুণ্যবতী, কোলে পাইলে কৃষ্ণধন।

(৭)

অযোধ্যা রাজ্যের রাজা নামে দশরথ
মহাযজ্ঞ আরম্ভিল লইয়া মুনিগণ
যজ্ঞেতে বসিল রাম রে—।
সিনান করিয়া নিল রাম লক্ষ্মণ
যজ্ঞসূত্র দিতে নিল জোড় মন্দির করে রে—
যজ্ঞেতে বসিল রাম রে।
সভা করি বসি আছে যত মুনিগণ
রামের গলায় দিল সোনার লগুণ রে—
যজ্ঞেতে বসিল রাম রে।
ব্রহ্ম-গায়ত্রী লইলেন রাম রে
ব্রহ্মচারীর মত ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও মা বলে সতীরে
যজ্ঞেতে বসিল রাম রে।
সুবর্ণের থালেতে ভিক্ষাটি সাজাইয়া
মণি মাণিক্য দিল চাঁদমুখ চাইয়া রে—
যজ্ঞেতে বসিল রাম রে।

(৮)

কেউ নাচে, কেউ গায়, সোহাগ সহিতে যায় গো
ওগো বিপুলার বিবাহের মঙ্গল না ?
মাথায় সোহাগের ডালা কাঞ্চন প্রদীপ মালা
সোহাগ সহিতে শুভধ্বনি না ?
জিরা লবঙ্গ পরিপাটি ওগো চাউলের গুড়ি কুটি
ওগো ঘরে ঘরে চিত্র আলিপনা না ?
আসে যায় ব্রাহ্মণীগণ পাছে যত পুরজন
ওগো মধ্যে চলে বণিকোর মাইয়া না ?
বাড়ী বাড়ী উত্তরিয়া, সোহাগ মঙ্গল গাইয়া
নারীগণ দেওন্তি জোকার গো ॥

(৯)

ধীরে চল নাগর কানাই
ছিলে নিকুঞ্জ বনে শান্তিতে কিশোরী সনে
অসময়ে বাহির হইলে বন ভ্রমণে
বন ভ্রমণের আর সময় নাই ।
কুসুম কলির কানন, প্রবল রোদের কিরণ
উত্তাপেতে ঘামিয়া আছে কমল লোচন
তোমার কঠিন প্রাণে দয়া নাই ।
চন্দ্রের কিরণ জিনি মোদের রাজনন্দিনী
উত্তাপেতে ঘামিয়া আছে চাঁদবদনখানি
তাহা দেখি মনে বড় ব্যথা পাই ॥

(১০)

দেখ বৃষবাহনে শিবরে শ্মশানে বেড়ায়
পথ পাইছে অবোধ চণ্ডী কি হইল মেলায় গো
দেখ সুন্দর গৌরী, হিমালয়ের ঘর—
দেখ শিঙ্গায় ভরিয়া আসিছে ফল্গু নদীর জল
তোমারে করিবে বিয়া ভোলা মহেশ্বর গো—
দেখ বৃষবাহনে শিবরে শ্মশানে বেড়ায় ॥
এই কথা শুনিয়া চণ্ডী উঠে দিলেন লর
লম্ফ দিয়া ধরিল মেনকার অঞ্চল গো ।
মাগো—শিঙ্গায় ভরিয়া আনছে ফল্গু নদীর জল
আমারে করিত বিয়া ভোলা মহেশ্বর—
মাগো না দিতাম তোমারে বিয়া
রাখতাম গো মা ঘরে
শিব ছাড়া দিতাম বিয়া পূর্ব সত্য করি গো—
দেখ বৃষবাহনে শিবরে শ্মশানে বেড়ায় ॥

(১১)

জয় জয় সম্বন্ধ হইল বিবাহ উত্তরার
অর্জুননন্দন বর সুভদ্রাকুমার গো।
অজ্ঞাতের বনবাসে রাজা যুধিষ্ঠির
বিরাটের দেশে গেলেন পঞ্চ মহাবীর
কীচক সব মারিয়া আইল তুষ্ট হইল রাজা
ও কোন দেবতা তোমরার পদে পদে পূজা গো॥
কোন দেবতা তোমরা দেহ পরিচয়
উত্তরার বিবাহ দিতে মোর মন লয় গো।
অর্জুন বলেন তায় শুনহে রাজন্
নৃত্য শিখাইছি কন্যা মোর যোগ্য নয় গো।
আমার কুমার আছে বীর অভিমন্যু
তারে করাইতাম বিয়া কন্যা সুলক্ষণা গো।
বিরাটেতে চলে গেলেন দেব শ্রীহরি
বিরাটেতে চলে গেলেন সুভদ্রা কুমারী
আর যত গোপনারী গেলেন সাথে সাথে গো॥
অভিমন্যু উঠিল রথে উত্তরার তুলি পাটে
তোলাতুলি করে সপ্তবার হে নারায়ণ
ফিরাইয়া সপ্তবার পুনঃ পুনঃ নমস্কার
জোড় করি দুটি কর হে নারায়ণ।
অঙ্গুরীয় করে করে পুষ্পটি সাজন করে
ছিটেন পুষ্প অভিমন্যু শিরে হে নারায়ণ।
ধন্য মোর কন্যা হইল অভিমন্যু পতি পাইল
বিশেষ হইল কৃষ্ণের ভাগিনা হে নারায়ণ।

(১২)

মাগো সীতা স্বর্ণলতা মায়ের কথা রেখ মনে
মুখচন্দ্রিকার কালে রামেরই দুনয়নে।
নয়নে নয়নে চেয়ো তুমি হেসে রাম হাসাও
রামচন্দ্র মেঘবরণ সীতাচরণ সোনার কিরণ
মেঘ যেন সৌদামিনী শোভিয়াছে সুলক্ষণ
মুখচন্দ্রিকার কালে শ্রীরামের ঐ চরণে
সপ্তবার ফুল ছিটিও প্রণমিও রামের চরণে॥

(১৩)

জাম্ববান রাজার কন্যা নাম জাম্ববতী
আরাধন করেন পাইতাম কৃষ্ণ হেন পতি গো।
সত্যের কারণে হরি নামিলেন পাতালে
……চড়িয়া গেলেন রাজার দুয়ারে গো।

নৃত্য গীত আনন্দিত রাজার দুয়ারে
সুবর্ণের প্রতিমা সাজে প্রতি ঘরে ঘরে
ছয়শত বার দিল রাজ্যেতে রাখিয়া—
সত্যভামা কন্যা দিল রতনে জুড়িয়া—
অষ্টবর্গ হস্তী দিল বহুমূল্য ধন
সোমন্তক মণি দিল সত্যের কারণ
বিয়া কইরা নারায়ণ করিলেন গমন
সত্যভামা লইয়া গেলেন আপনার ভুবন ॥

(১৪)

ব্রজে কি দেখিতে যাবে ভাই
বৃন্দাবনে আছে কি নিমাই।
কত কি শুধাব নিমাই
কথা বলতে প্রাণে ব্যথা পাই।
সাধের বৃন্দাবন করিয়ে শূন্য
নদীয়া ধন্য করিলে ভাই।
তোমার নিকুঞ্জ কানন হয়েছে কানন
বনপশুগণ বিচরে সদাই।
তোমার কদম্ব তরু মূলে নিমাই
কত ভুজঙ্গ নিয়েছে ঠাই ॥

(১৫)

যখনি জন্মেছিলিরে নিমাই নিমতরুতলে
হইয়া কেন না মরিলে না লইতাম কোলেরে—
সারি কাইন্দা বলে তোরে কি সন্ন্যাস সাজে অল্পবয়সে ॥
যেই কালে নিমাইচাঁদে বুকে হামাগুরি কাটে
সোনার তারের বলয় দিলাম নিমাইচাঁদের হাতে—
সারি কাইন্দা বলে তোরে কি সন্ন্যাস সাজে অল্পবয়সে ॥
যেই কালে নিমাইচাঁদের বছর চারি পাঁচ
সোনার দোয়াত কলম দিলাম লিখতে দিলাম পাত রে—
সারি কাইন্দা বলে তোরে কি সন্ন্যাস সাজে অল্পবয়সে ॥
লিখিয়া পড়িয়া নিমাই রে পণ্ডিত হইলে বড়
সংসারকে বুঝাইতে পার মায়েরে কেন ছাড় রে—
সারি কাইন্দা বলে তোরে কি সন্ন্যাস সাজে অল্পবয়সে ॥
আগে যদি জানতাম রে নিমাই যাবেরে ছাড়িয়া
কুলবধূ বিষ্ণুপ্রিয়ারে না করাইতাম বিয়া রে—
সারি কাইন্দা বলে তোরে কি সন্ন্যাস সাজে অল্পবয়সে ॥
কুলবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই ওরে জলন্ত আগুন
কতকাল রাখিব মায়ে দিয়া মধুর বাণী রে—
সারি কাইন্দা বলে তোরে কি সন্ন্যাস সাজে অল্পবয়সে ॥

আগে যদি জানতাম রে নিমাই যাবেরে ছাড়িয়া
সোনার শিকল দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া রে—
সারি কাইন্দা বলে তোরে কি সন্ন্যাস সাজে অল্পবয়সে ॥
হাল বাওয়া হালুয়ারে ভাই—হাতে সোনার নরী
এই পথে কি যাইতে দেখছ আমার নিমাইচাঁদ বৈরাগী—
সারি কাইন্দা বলে তোরে কি সন্ন্যাস সাজে অল্পবয়সে ॥
সন্ন্যাসী না হইও রে নিমাই, বৈরাগী না হইও
আগে তোমার মা মরিলে পাছে তুমি যাইও
সারি কাইন্দা বলে তোরে কি সন্ন্যাস সাজে অল্পবয়সে ॥

(১৬)

নিমাই গৃহেতে শুইয়া ছিল, নিশীথে কোথায় গেল
… …আমি জাগিয়া দেখলাম না।
কি উপায়, শচী কাইন্দা বলছে হায়রে হায়
আমি পালন করে ধন কারে দিলাম অঞ্চলের সোনা ॥
কোটী জন্ম আরাধনে নিমাই পুত্র পেলাম কোলে
নিমাই ছাইড়া গেল দুঃখিনীরে বাঁচিব কি ধন নিয়ে—
কি উপায়, শচী কাইন্দা বলছে হায়রে হায়
আমি পালন করে ধন কারে দিলাম অঞ্চলের সোনা ॥
মা জানে সন্তানের বেদন গর্ভে যে বা ধরে
নিমাই ছাইড়া গেল দুঃখিনীরে বাঁচিব কি ধন নিয়ে।
সাধনের ধন নিমাই রে তোরে কে বা নিলরে
আমি জাগিয়া দেখলাম না ॥
কেশব ভারতী আইল নিমাইরে কি বা মন্ত্র দিল
নিমাই ঘরেতে…বাহির হইয়া কি ভাবে কি হইল।
কি উপায়, শচী কাইন্দা বলে হায়রে হায়
আমি পালন করে ধন কারে দিলাম অঞ্চলের সোনা ॥

(১৭)

কংসারী কংস ধ্বংস করিলেন মথুরায়—
চূড়া বাঁশী নিয়া কৃষ্ণ নিদয় হইয়া দিলেন নন্দ বিদায় ॥
নন্দ নিরানন্দে ব্রজে যায় ফিরে ফিরে চায় পুত্রের মমতায়—
চোখের জলে বক্ষ ভেসে যায় বলে হায় হায় হায় ॥
কি বললিরে বনমালী কেমন করে এমন পাষাণ হইলি
যজ্ঞ দেখতে এসেছিলে গোপাল ভুলে রইলি তুই কার মায়ায় ॥
আমি কোন প্রাণে কেমনে যাই ব্রজপুরে
যশোদা চাইলে পরে তারে কি ধন দিব ॥
ধোয়া—
ওরে প্রাণের গোপাল আমার পোড়াকপাল
এই দুঃখ আর কারে কইব

তুই কুক্ষণে ধনু যজ্ঞে এসেছিলে
ও তুই কোন প্রাণেরে নিদয় হয়ে বিদায় নিলে
এ জন্মের মত তোরে রেখে যাই দেশান্তরে
আমি কার গোপাল কোলে কইরে প্রাণ জুড়াব ॥

অন্তরা

না জানি কোন বিধাতা বাদী হইল গোপাল রে—
না জানি কার ছিল অভিশাপ
আমার ভাঙ্গা কপাল ভেঙ্গে গেল, মনে রইল মনস্তাপ।
পেয়ে ধন হারাইলাম তোরে, এ জন্মে কি জন্মান্তরে
কইরে ছিলাম কত পাপ
এখন নমস্তে কর্মেভ্য বলে অনলে দিব ঝাপ ॥
পুত্র শোকের অনল কিসে নিবাইব
একবার কোলে আয়রে কৃষ্ণধন
জুড়াই এ জীবন পুরাই বাসনা
আর ত চাঁদ বদন তোর হেরব না—জন্মে ভুলব না ॥
যার অন্তরে পুত্রের ব্যথা, মরণ জীবন তার সমান কথা
মনকে বুঝাই কত কথা, অবোধ মন ত প্রবোধ মানে না।
আমি কোন প্রাণে কেমনে যাই ব্রজপুরে
যশোদায় চাইলে পরে তারে কি ধন দিব।

পর চিতান

গোপাল এতই কি মনে ছিল, আগে জানতাম না রে—
আগে জানলে পরে ধনুর যজ্ঞে, তোরে আমি আনতাম না রে ॥
যেমন দশরথের প্রাণ যায় পুত্র শোকের তরে
আমার ঘটিল তাই
আমি শ্যামময় সব দেখতে পাই যে দিক্ পানে চাই।
রাম লক্ষ্মণ যায় বনান্তরে সেই শোকে রাজা প্রাণে মরে
দুই পুত্র ছিল ঘরে গোপাল আমার ত আর লক্ষ্য নাই।
আমি কোন প্রাণে কেমনে যাই ব্রজপুরে
যশোদায় চাইলে পরে তারে কি ধন দিব।

(১৮)

এই প্রার্থনা ত্রিপুরারী করি হে তব চরণে
অনুমতি কর প্রভু যেতে যজ্ঞ দরশনে ॥
কেমনে যজ্ঞ করেন পিতে সাধ হয়েছে তাই দেখিতে
এই মিনতি চরণেতে বিদায় দাও প্রফুল্ল মনে ॥
ঐ দেখ আমার ভগিনী চন্দ্রের ২৭ রমণী
পিতৃ যজ্ঞে এখনি আইল আমায় নিতে সনে ॥
সদয় হয়ে দাও হে বিদায় যজ্ঞ দেখে আসি এবার
পিতৃ যজ্ঞে এই দেখা যায় আমার সব ভগিনীগণে ॥

বারণ করি সতী তোমায় এ যজ্ঞে যাইতে দিব না
বিনা নিমন্ত্রণে গেলে কলঙ্কের সীমা রবে না ॥
না নিমন্ত্রণ করে দক্ষে আমারে নিমন্ত্রিত ত্রিসংসারে
কেমন করে যজ্ঞে যাবে সতী তায় আমায় বল না ॥
বিনা নিমন্ত্রণে যাবে কত লোকে কত কবে
কেমন করে প্রাণে সইবে মনেতে ভেবে দেখ না ॥
বুঝেছি দক্ষের অভিপ্রায় অপমানী করবে আমায়
বারণ করি তাইতে তোমায় গেলে যে সম্মান রবে না ॥

(১৯)

শ্রীরাম মিথিলা যাইতে গৌতমের বনেতে
অহল্যা পাষাণ মানবী
চাইয়া পারঘাটের পর পানে পারের তরণী
হেরে অমনি মাধবেরে ডাকে রবিকুল রবি ॥
অমনি ভয়ে দুঃখে তাড়াতাড়ি মাধব কিনারে ভিরাইল তরী
শুনে মধুমাখা রব তরী আরোহি রাম রাঘব ॥
হায়রে জলে রেখে পা দুখানা গঙ্গার পুরাইবে মনের বাসনা
কাঠের তরী করে সোনা পার হয় মাধবের ঘাটে মাধব ॥
শ্রীরাম দিতেছে পারের কড়ি সে মাধবেরে চিত্তসুখে বাৎসল্য রসে
মাধব পত্নী বলে হেসে ওহে শ্রীরাম শশী
আমি পারের কড়ির নই প্রত্যাশী
তুমি নও বিদেশী ভালবেসে এস কোলে ॥
তুমি হও ভবের কাণ্ডারী কি দিবে হরি তুমি পারের কড়ি
পার কর পার হতে পারি যেন অন্তিম কালে ॥
তোমায় চিনেছি হে দেখে আশ্চর্য লীলা
পাষাণ মানব কাঠের সোনা হয়ে রাম কেলে সোনা ॥
পার হয়ে শুদারা দুঃখিনীর ঘরে অধর চাঁদ পড়েছে ধরা
আমরা লোকের যাতায়াতের পথে পার করে দিই কড়ি নিয়ে হাতে
তুমি যে স্বজাতি আমার পারের কড়ি লাগবে না আর তোমার
হায় হায় জীবের জীবন অন্তকালে ভক্তি করে হরি তোমায় মিলে
পার করে দাও বসে হালে ওহে ভবপারের কর্ণধার ॥
তুমি হে কোদণ্ডধারী বৈকুণ্ঠ বিহারী
বাছা ছেড়ে দাও হে ছল চাতুরী ॥
ছিলাম জঠরে কোটরে পাঠালে সংসারে
কৃপা করে দিলে দেখা যেতে মিথিলার ঘাটে
নদী পার হতে পারঘাটে হইল দেখা
আর ত নাই হে দেখা—
তুমি হে কোদণ্ডধারী······ছেড়ে দাও ছল চাতুরী ॥
ধন্য ধন্য হল শ্রীরাম পতি ধন্য হল সতী ভজে পতির যুগল চরণ
শুনে পতির মুখে সেই সব বার্তা পারঘাটে আজ ভবপারের কর্তা ॥

দেখতে পাই অনায়াসে কি ধন চাব হে তব পাশে—
হায় হায় রে—ঐহিক সুখের উপাসনা
পারের কড়ি চাই না তুচ্ছ রূপা সোনা
লোহার দেহ করব সোনা আজি পরশমণির পরশে ॥

(২০)

পুত্র শোকেতে কাতর অতি লঙ্কাপতি দুঃখেতে ম্রিয়মান
যেয়ে লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে মনের দুঃখে হানে শক্তিশেল বান ॥
দারুণ শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণ পড়ল ধরাতে
কি হইল অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত।
হায়, হায়রে বিধিবাদী কপাল মন্দ বিলাপ করে কাঁদে শ্রীরামচন্দ্র
কাঁদে রামের ভক্তবৃন্দ শিরে করে করাঘাত ॥
একে রাজ্য নাশ বনবাস তার উপর সর্বনাশ
ভাই-এর ব্যথা শ্রীরামচন্দ্র কেঁদে কয় দুঃখের কথা কারে কব
লক্ষ্মণ তোরে হারা হইয়ে বক্ষ যায়রে বিদারিয়া
কারে নিয়ে যাব আমি দেশে ॥
যদি যাইরে ভাই অযোধ্যায় জিজ্ঞাসিবে মা তোর কথা
ও রাম তুই দেশে আইলি আমার লক্ষ্মণ কোথা ॥
তখন হায় লক্ষ্মণ হায় লক্ষ্মণ বলে মা ভাসিবে চোখের জলে
তখন সুমিত্রা মায়ের কোলে আমি কি ধন দিব।
তোরে হারা হইয়ে বক্ষ যায়রে বিদারিয়ে
কার মুখ দেখে প্রাণ জুড়াব।
আমরা জন্মেছিলাম চারটি ভাই আগে জন্ম আমি পাই
আগে করলেম পরিণয় আমার সকল কর্ম আগে হয়
বেদমন্ত্রের দীক্ষা আগে অস্ত্রবিদ্যা ভাইরে আমার শিক্ষা আগে
আমি থাকতে আমার আগে তোর মরণ কি উচিত হয় ॥
সীতা হরিল রাক্ষসে তুই মরিলি বিদেশে
লক্ষ্মণরে ভাই আমার মার কেহ নাই, কার মুখ দেখে প্রাণ জুড়াব ॥
ও প্রাণে মানে নারে ভাই লক্ষ্মণরে আমি কি করিব।
চাঁদ মুখ দেখে বুক ফাটে দুঃখে এমন সোনার অঙ্গ ধূলায় লুটায়
শক্তিশেল তোর বুকেরে।
কোন প্রাণে যাবরে ভাই, ও ভাই লক্ষ্মণেরে ফেলে বিদেশে বিপাকে
আমার তাপিত অঙ্গ শীতল কর, একবার দাদা বলে ডেকে রে।
সীতা দিয়ে কাজ নাই ভাই, আয়রে লক্ষ্মণ আয় দেশে যাই
কথা কি ভাই রাখবে না, আর কি দাদা বলে ডাকবে না—
ভাই ভাইরে স্ত্রীপুত্র সব মরে গেলে প্রাণ থাকিতে আবার মিলে
প্রাণের দোসর ভাই মরিলে ভাই তারে আর মিলে না ॥
লক্ষ্মণ—জলেরে জীবন—একবার চাঁদবদনে দাদা বলরে মেলিয়া নয়ন ৮
সত্য করে দশরথে রামকে পাঠায় বনে
রামচন্দ্র বনে যাইতে বিধি যায়রে পাছে পাছে—

লক্ষ্মণ পড়ল শক্তিশেলে সীতা হরিল রাবণে
লক্ষ্মণ জলেরে জীবন, একবার চাঁদ বদনে দাদা বলরে মেলিয়া নয়ন ॥
অযোধ্যাতে মা জননী করতেছে রোদন
আমি গেলে তোর মা শুনিলে
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলে ঝাপ দিবে যমুনার জলে
কে এসে করবে নিবারণ—
লক্ষ্মণ জলেরে জীবন, একবারে চাঁদ বদনে দাদা বলরে মেলিয়া নয়ন ॥
শক্তিশেল খসাইয়া রামে নিরখিয়া চায়
লক্ষ্মণ ভাই-এর বুকে গিয়া পাতাল দেখা যায়
লক্ষ্মণ জলেরে জীবন, একবার চাঁদ বদনে দাদা বলরে মেলিয়া নয়ন ॥
শক্তিশেল খসাইয়া রামে বস্ত্র দিল বুকে
ঝলকে ঝলকে রুধির উঠে নাকে মুখেরে—
লক্ষ্মণ জলেরে জীবন, একবার চাঁদ বদনে দাদা বলরে মেলিয়া নয়ন ॥
সুষেণ বৈদ্যরে আনলাম কিসের কারণ
রাত্রের মধ্যে জিয়াইয়া দাও লক্ষ্মণের জীবন
লক্ষ্মণ জলেরে জীবন, একবার চাঁদ বদনে দাদা বলরে মেলিয়া নয়ন ॥
হনুমান চড়ে যাও ঔষধের কারণ
রাত্রের মধ্যে জীউক আমার প্রাণের জীবন
লক্ষ্মণ জলেরে জীবন, একবার চাঁদ বদনে দাদা বলরে মেলিয়া নয়ন ॥
রাত্র নিশাকালে হনু ঔষধ নাহি চিনে
পর্বত লইয়া আসে লঙ্কাপুরে হনু
সুষেণ বৈদ্য এসে ঔষধ দিল মুখে
লক্ষ্মণ উঠিল জিয়ে শক্তিশেল হতে
লক্ষ্মণ জলেরে জীবন, একবার চাঁদ বদনে দাদা বলরে মেলিয়া নয়ন ॥
লক্ষ্মণ উঠিলরে শক্তিশেল হতে
রামের যত কপিগণে রাম জয় বলে ডাকেরে
লক্ষ্মণ জলেরে জীবন, একবার চাঁদ বদনে দাদা বলরে মেলিয়া নয়ন ॥

(২১)

পাশায় হারিল যখন পাণ্ডব নন্দন গো
হরষিত দুর্যোধন সপুত্র বান্ধব গো
পাশায় হারিল রাজ্যধন ॥
দুর্যোধন বলে ভাই দুষ্ট নরপতি
কেশে ধরে আন দেখি দ্রোপদী হেন সতী
পাশায় হারিল রাজ্যধন ॥
রাজ অনুমতি পাইয়া সেই মতিনাশ গো
কেশে ধরে দ্রোপদী আনিল সভাপাশে গো
পাশায় হারিল রাজ্যধন ॥
যখন কেশে ধরি দ্রোপদীরে দুঃশাসনে আনে

তখন ভয় পাইয়া দ্রৌপদী ভাবেন মনে মনে
পাশায় হারিল রাজ্যধন।
তখন দুই বাহু বাড়াইয়া যায় ভীম মহামতি
যে উরুতে বসাইল দ্রুপদ নন্দিনী
গদাঘাতে সেই উরু চূর্ণ করিব আমি।
সেই দিন মোর দুঃখ বুক থেকে যাইব
দুঃশাসনের রক্ত সেদিন বুকেতে মাখিব।
যুধিষ্ঠির বলে ভাই ভীম মহাশয়
কাল অনুসারে কথা কহিও মহাশয়।
আমি শুনেছি পাণ্ডবসখা তুমি বংশীধারী
না জানি পাণ্ডবের আজ হয় কোন গতি।
পাশায় হারিল রাজ্যধন।
দ্রৌপদী স্মরণ করে হস্তিনা নগরে
দ্বারকাতে ভগবান জানিলেন অন্তরেতে।
তখন রুক্মিণী সহিত বসিয়া আছেন নারায়ণ
চমকে চমকে উঠেন কমললোচন
পাশায় হারিল রাজ্যধন।
তখন কৃতাঞ্জলী করি রুক্মিণী সতী কয় গো
চমকি উঠিলেন কেন প্রভু দয়াময় গো
পাশায় হারিল রাজ্যধন।
আমি শুনেছি পাশাতে হারিল যুধিষ্ঠির
দ্রৌপদী সহিত সব হয়েছে অস্থির গো।
......রাজা যুধিষ্ঠির গো
বিবস্ত্র করাবে বলে ডাকছে ঘন ঘন গো
এখন শীঘ্রগতি যেতে হবে হস্তিনা নগর
বস্ত্ররূপী হবে নারায়ণ।

এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র স্মরিলেন গরুড় গো
অমনি গরুড় রাজ দিলেন দরশন গো
আপনি চড়েন তাহার পৃষ্ঠে নারায়ণ গো
তিলেক মাত্র গেলেন গরুড় হস্তিনা নগরে গো
বস্ত্ররূপী হবে নারায়ণ॥
তখন ভীম অর্জুনকে ডেকে বলছে রাজা যুধিষ্ঠির
আমাদের কৃষ্ণ আসচে দেখিয়া অস্থির
বস্ত্ররূপী হবে নারায়ণ॥
আর না করিও ভয় রাজা দুর্যোধনে
কি করিতে পারে আমার কৃষ্ণ বিদ্যমানে।
হরি সবায় শান্তাইয়া গেলেন দ্রৌপদীর ঠাঁই।
দ্রৌপদী বলেন শুন অনাথের গোঁসাই।
আমি এতক্ষণ ভাবিয়া মরি হইয়া অস্থির
এ বিপদে রক্ষা কর মোরে যদুবীর গো।

বস্ত্ররূপী হবে নারায়ণ ॥
জতুগৃহে যখন অগ্নি দিল পুরোচন
তা'তে রক্ষা করি প্রভু রাখিলেন ছয়জন গো।
স্বয়ম্বরে যখন পঞ্চশঙ্খ বাজাইল
কর্ণ আদি লক্ষবীর সুদর্শনে ডাকিল।
অগ্নিকে সহায় করে খাণ্ডব দাহন করি
ইন্দ্রের সনে যুদ্ধ করলে তা'ত নয় ভারী।
বস্ত্ররূপী হবে নারায়ণ
আর না করিও ভয় রাজা যুধিষ্ঠির
এত বলি বস্ত্রময় হইলেন নারায়ণ গো
বস্ত্ররূপী হবে নারায়ণ ॥
নীল শ্বেত নানা রঙের শাড়ী ক্রমে হইল
বস্ত্রধরি দুঃশাসন টানিতে লাগিল ॥
যত টানে তত হয় সংখ্যা নাহি হয়
দুর্যোধন দুঃশাসন মনে আইল ভয়
তখন কৃষ্ণে বলে ক্ষমা না করিও দুর্যোধনে
ইহার উচিত শাস্তি দেখাব এখন।
বস্ত্ররূপী হবে নারায়ণ ॥
তখন হরি মায়া অগ্নি করিলেন সৃজন
দুর্যোধনের গৃহে যাও বলছেন নারায়ণ
কৃষ্ণ আজ্ঞা পাইয়া অগ্নি গমন করিল
রাজমহল ভিতরে যাইয়া ব্যাপিত হইল
বস্ত্ররূপী হবে নারায়ণ
তখন লম্ফে লম্ফে অগ্নি গিয়া পড়ে রাণী সবার গায় গো
ভয় পাইয়া রাণী সব ভয়েতে পালায় গো।
ভয় পাইয়া রাণী সবে অনুমান করিল
বাস ফেলিয়া তারা দিগম্বরী হইল গো।
বস্ত্ররূপী হবে নারায়ণ ॥
দিগম্বরী হইয়া রাণী সব রাজসভাতে যায়
দুর্যোধন দুঃশাসন পড়িল লজ্জায়
তখন আখ্যান টানে নারদ মুনি
সভাতে দেখায় গো
দেখ দিগম্বরী কার নারী রাজসভাতে যায় গো।
টেনে টেনে বস্ত্র দেয় রাণী সবার গায়
পবনে সেই বস্ত্র উড়াইয়া নিয়া যায় গো
বস্ত্ররূপী হবে নারায়ণ ॥
তখন দ্রোপদীর কাছে গেলেন যত নারীগণ
দিদি, আমাদের লজ্জা কর নিবারণ গো
দ্রোপদীর লজ্জা রাখিলেন চক্রপাণি
দ্রোপদী রাখিলেন লজ্জা যতেক নারীর গো।

নমো নমো নারায়ণ প্রভু দয়াময়
বস্ত্ররূপী দ্রোপদীর লজ্জা নিবারণ গো
বস্ত্ররূপী হইলেন নারায়ণ ॥

(২২)

যখন ইন্দ্রজিৎ পড়ল রণে লক্ষ্মণের বাণে
নিকুম্ভিলা যজ্ঞে
বুকে নিয়ে পুত্রশোক হতমান লঙ্কেশ্বর
যুদ্ধে যায়, হায়, হায়, হায়
কি জানি কি আছে কর ভাগ্যে ॥
যেয়ে লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে
মনের দুঃখে হানে শক্তিশেল বাণ
ক্রোধেতে রাবণ উন্মাদ, শক্তিশেল ভাবে
হায়, হায়, এ কি প্রমাদ
হায়রে হায় প্রণমি রাম পদতলে
লক্ষ্মণের বাণ ভেবে যুদ্ধস্থলে
কার্যসিদ্ধি হবে বলে করেছে রাম আশীর্বাদ ॥
তখন শেল বলে রঘুবর, দিলে আজ এ কি বর
আমি রাবণ প্রেরিত।
কেঁদে রাম বলে একি বিপরীত
ভাগ্যে কি ছিল এত ॥
ওরে ও শক্তিশেল বুকে রইল দুঃখের শেল
আমি কি ভাবিলাম কি হইল আগে জানলেম না।
করিবে না আর বাক্য রক্ষে, পড়িও না আর ভাই এর বক্ষে
লক্ষ্মণ প্রাণ দেরে ভিক্ষে এ জনমের মত ॥
বিদেশে সমুদ্রের কোলে প্রাণের দোসর ভাই
হারা হয়ে কিসে আর প্রাণ রাখি
দুঃখ আর গেল না, দুষ্ট রাবণ বধ হইল না
দুঃখিনীর কপাল ভাল না, আর ত হল না সীতার উদ্ধার।
যাবে রামের জাতি, বিভীষণের নাই অব্যাহতি
থাকিলে দশানন জীবিত।
বিনে প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই, আর লক্ষ্য নাই
কোথা যাই শক্তিশেল রে আমি সব দেখি অন্ধকার।
পরোপকার পরম ধর্ম জানস নাকি তুমি
লক্ষ্মণেরে রক্ষা কর ভিক্ষা মাগি আমি।
শরীরের ছায়ার মত যে ভাই ছিল অবিরত
বিধি করল ছলনা—
হায়, স্ত্রী পুত্র সব মরে গেলে প্রাণ থাকিতে আবার মিলে
প্রাণের দোসর ভাই মরিলে ভাই আর মিলে না।
এলেম দুটি ভাই বনবাসে রইল দেশে

ভরত শত্রুঘ্ন ভাই।
নিয়ে পিতার মনের কথা এল যে দুটি ভ্রাতা
এ যে পেলেম ব্যথা জটাবাকল পাতা
চাঁদ মুখে ছাই ॥
বাদী বিধাতা তাইত বিমাতা রাজা হতে দিল না
মনের আশা পূর্ণ হল না।
হায়রে রামধন বলে উচ্চস্বরে, মা ভাসবেন চোখের নীরে
মা বলে আর ডাকলাম না।
ভ্রাতৃ শোকের দায় আমি হব বিদায়
কে দিবে অযোধ্যায় এই সমাচার ॥

(২৩)

মনে লয় গরল খেয়ে প্রাণ ত্যজিগো ত্রিনয়না।
দুঃখে অঙ্গ জরজর আরত দুঃখ সহে না ॥
অন্ধকূপে ছিলেম যখন প্রীতি পালন করলে তখন
ছিলেম কি আদরের ধন এখন কিছু না ॥
ভবার্ণবে এনে ফেলে মাগো মা তুই কোথায় গেলে
ডাকি আমি মা মা বলে গেলে ত বলে গেলে না ॥
বলে বৈদ্যনাথ বর্মণ দেশে বিদেশে করি ভ্রমণ
তবু না হয় ভরণপোষণ, তাও কি দেখ না ॥
ভাই গো মা যতই ক্লেশ মনে লয় প্রাণ করি শেষ
করলেনা মা আমার উদ্দেশ দিনান্তে অন্ন মিলে না ॥

(২৪)

মা তোর লীলার ক্ষেত্র ভারতভূমে—
কালক্রমে কত লীলা হয়—
মা তোর পূর্ববঙ্গ রঙ্গস্থল, অমঙ্গলের সুমঙ্গল
হল অপূর্ব লীলার অভিনয় ॥
শুনলেম অতি প্রিয় পুত্র তোমার—
জয়দেবপুরের মধ্যম কুমার
মরেছিল দার্জিলিং পাহাড়ে—
রাজার শবদেহটি সংলোকেরা এল সৎকার করে ॥
মাগো চন্দনের বাজার হল অন্ধকার
শ্রাদ্ধ শান্তি হয়ে গেল, মরা মানুষ ফিরে এল
আবার বার বৎসর পরে ॥
দেশের রাজা প্রজা জমীদার সব
কি উৎসাহে ছুটল—
এবার ভাওয়ালের আকাশে উঠল, অমাবস্যার পূর্ণশশী।
আশ্চর্য সব লোক এসে উদয় হইল নরলোকে পরলোকবাসী ॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী জয়দেবপুর শূন্য রাজধানী

মাগো তুই গণেশজননী কোলে নে নবীন সন্ন্যাসী
ভবের খেলা চক্ষে দেখুক, শিখুক ভারতবাসী ॥
রাজার স্বার্থের বন্ধু ছিল যারা স্বার্থ সাধন করতে তারা
রাজকুমারকে বিষ খাওয়াইয়াছিল
হায় হায়, শ্মশান হয়ে তারা শব শ্মশানে নিল—
মাগো বিষম শিলাবৃষ্টি ঝড় বাতাসে শব ছেড়ে পলায় ত্রাসে
নাগা বাবা ধর্মদাস এসে পুনর্জীবন দিল ॥
পুনর্জন্ম পেয়ে ঘোর বনে গিয়ে নিবাসী হল
এবার সঙ্গগুণে মহাযোগী মহাত্যাগী, মহাঋষি,
আশ্চর্য সব লোক এসে উদয় হইল
নরলোকে পরলোক নিবাসী ॥
অনেকের মনে আছে সন্দেহের কেন্দ্র
অঙ্গের চিহ্ন দেখে অনেকে কয়—এই সন্ন্যাসী সেই রমেন্দ্র।
দেখতে সেই চাঁদবদন আসিল সতীলক্ষ্মীর শিরোমণি
এলোনা সে রাজার রাণী, রাজার শালা সত্যেন্দ্র—
আবার বর্ধমানের রাজার মতন, হয় না সে জাল প্রতাপচন্দ্র ॥
এরূপ মায়া মোহে পেয়ে দাগা কত রাজ্যের হতভাগা
কত রাজ্য করেছিল মাটি।
সোণার সংসার করলে শ্মশান, তুই পাষাণের বেটী।
মাগো আমরা হয়ে জীবন্মৃত, ছালিতে ঢালিয়া ঘৃত
অন্ধকারে অবিরত, শুধু ভূতের বেগার খাটি ॥
অসার মায়ার সংসার আমার কেবল সার মা তোর চরণ
যে জন সর্প সহবাস তার প্রাণে আর কি বিশ্বাস
সাক্ষী রাজা রমেন্দ্র নারায়ণ ॥
শুনলেম সুষেনপুরের মুকুন্দ গুণ
দিন দুপুরে হয়েছে খুন।
পাপের আগুন জলে আর নিভে
হল আশুবাবুর বাতব্যাধি ধর্মে কতবই সবে মাগো—
এবার সম্মেলনে মহাবঙ্গে দেখতে পাবে মঞ্চে মঞ্চে
শালার ভাগ্যে রাণীর ভাগ্যে, জানি শেষকালে কি হবে।
হরিচরণ বলে মরণের পর কে আসবে ফিরে
বাংলার ইতিহাসে স্মৃতি রবে যাবৎ রবে রবিশশী।
আশ্চর্য সব লোক এসে উদয় হল
নরলোকে পরলোক নিবাসী ॥

(২৫)

এভাবে যাবে গো মা কতদিন।
আমার দুঃখে দুঃখে জনম গেল, গেল না আর দুঃখের দিন ॥
ছিলেম বা কি, হলেম বা কি, আরও বা কি আছে বাকী
বাকী পরাধীনে থাকি, যত দুঃখ তত কই

মাগো বিষক্রিমির মত আমি বিষ খাই নিশিদিন ॥
দুঃখ কব মনের আশে   যাই আমি যার পাশে
সে না আমায় ভালবাসে কটুভাষে কথা কয়
মাগো মনের দুঃখ মনে রহে   মনে আমি করি লীন।
বৈদ্যনাথ বর্মণে বলে এই ছিল আমার কপালে
তাইত পূর্ণ না হইলে আমার নিষ্কৃতি নাই
মাগো যা কর করগো তুমি   আমি যেন তোমার অধীন

বঙ্গ-সাহিত্যে গণিত

প্রদীপকুমার মজুমদার

ঠিক কবে থেকে বাংলা ভাষায় আধুনিক গণিতচর্চা শুরু হয়েছিল তা বলা কঠিন। তবে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়া হতে থাকে। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডোয়ার্ড হাইড্-ইষ্ট ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে জে. এইচ. হ্যারিংটনকে হিন্দু কলেজে গণিত ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য পত্র লিখেছিলেন। এরপর থেকে বাংলা ভাষায় গণিতের বই লেখার একটা জোয়ার আসে; এবং এ-ব্যাপারে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগ অন্যতম উল্লেখনীয় বিষয়। রবার্ট মে লিখিত অঙ্কপুস্তক ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ হার্লে লিখিত গণিতাঙ্ক প্রকাশিত হয়। ১২৪৬ বঙ্গাব্দে হলধর সেন অঙ্ক পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাছাড়া এই সময় শিশুসেবধি গণিতাঙ্ক প্রথম ভাগ প্রকাশ করা হয়। বাংলা ভাষায় জামিতি গ্রন্থ রচনার অন্যতম পথিকৃৎ হচ্ছেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১১-১৮৮৫)। তাঁর রচিত ক্ষেত্রতত্ত্বে গাণিতিক শব্দাবলী অধিকাংশই লীলাবতী, সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায় প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৫) ক্ষেত্রতত্ত্ব নামে একটি জ্যামিতি বই লেখেন। এছাড়া রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখেরা জ্যামিতির উপর বই লেখেন তবে ঐগুলি প্রকাশিত হয়েছিল কি না বলা কঠিন। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই বইগুলি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসাবেই স্বীকৃত। এগুলিতে উঁচুদরের কোন গাণিতিক তত্ত্ব ছিলনা। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জগতে যে নুতন গাণিতিক চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়েছিল তার প্রভাব এই বইগুলিতে ছিল না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে বেশ কয়েকটি পত্রিকায় গণিতের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং এই প্রবন্ধগুলি মূল ইংরাজীতে লিখিত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ। ডাঃ উইলসনের উৎসাহ ও আনুকূল্যে অমলচন্দ্র গাঙ্গুলী ও কালীপ্রসাদ ঘোষ গণিতের প্রবন্ধ অনুবাদ করেন। এঁরা অঙ্ক ও রেখাগণিত এবং রেখাগণিতবিদ্যার সঙ্গে বস্তুবিষয়ক বিদ্যার বৈলক্ষণ্য নামে একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। অনুবাদটি সুন্দর হয়েছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ৪৭-তম সংখ্যায় অক্ষয়কুমার দত্ত জ্যোতির্বিদ্যার উপর একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধের পাদটীকায় প্রাচীন ভারতের গণিত, বীজগণিত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'রহস্য সন্দর্ভে' (প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৮৬৩) স্যার আইজ্যাক নিউটন-এর বাল্যকালের বিষয় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রচনাটির দ্বিতীয় অংশ প্রকাশিত হয় নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'ভারতী পত্রিকা'য় গণিতের বহু উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরে এই পত্রিকাটি 'বালক' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'ভারতী এবং বালক' নামে প্রকাশিত হতে থাকে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাতেও বহু গণিতের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং এগুলির অধিকাংশই গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস নিয়ে লিখিত। এই পত্রিকার ২৩ বর্ষের সংখ্যায় যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত 'ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য' 'ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ,' 'দশম স্বতঃসিদ্ধ' নামে প্রবন্ধ লেখেন। এই পত্রিকার ২৪ বর্ষের সংখ্যায় তিনি ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য বিষয়ে রচনা প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য এই প্রবন্ধ দুটিতে ইংরাজ লেখক টি. এল. হীথের

লেখার প্রভাব পড়েছিল। ঐ একই বর্ষে আর্যভট্টের জীবনী এবং তার কার্যাবলী নিয়ে 'আর্যভট্ট' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। যোগেশচন্দ্র রায় ২৬ বর্ষ সংখ্যায় 'এদেশে ভূভ্রমণবাদ' এবং ৩৬ বর্ষ সংখ্যায় 'আঙ্কিক শব্দ' নামে দুটি গণিতের প্রবন্ধ লেখেন। 'আঙ্কিক শব্দ' প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের গণিত ও জ্যোতিষ গ্রন্থে বিভিন্ন সংখ্যার পরিবর্তে যে সব নাম সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি চিত্তাকর্ষক অথচ গবেষণামূলক। তারকেশ্বর ভট্টাচার্য ২৬ বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "সূর্য সিদ্ধান্ত ও পঞ্জিকা গণনা" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। একেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৮ বর্ষ সংখ্যায় "আমাদের অয়নাংশ" নামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস নিয়ে বাংলায় সর্বাধিক আলোচনা করেছেন ডঃ বিভূতিভূষণ দত্ত। তাঁর রচনা চিত্তাকর্ষক, তত্ত্ব ও তথ্যবহুল এবং গবেষণাধর্মী। লেখার ভাষাও অতুলনীয়। ইনি এই পত্রিকায় অন্যূন এগারটি প্রবন্ধ লেখেন এগুলি হচ্ছে—'বৈদিক ও পৌরাণিক শিশুমার শব্দ সংখ্যা লিখন প্রণালী' (৩৫ বর্ষ), 'অক্ষরসংখ্যা প্রাণালী' (৩৬ বর্ষ), 'অঙ্কানাং বামতো গতি' (৩৭ বর্ষ), 'জৈন সাহিত্যে নামসংখ্যা' (৩৭ বর্ষ), 'জ্যামিতি শাস্ত্রের প্রাচীন হিন্দুনাম ও তাহার প্রসার' (৩৭ বর্ষ), 'আচার্য আর্যভট্ট ও তাহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ' (৪০ বর্ষ), 'প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্বিদ মল্লিকার্জুন' (৪০ বর্ষ), 'মহাভারতে দশাঙ্ক সংখ্যা' (৪১ বর্ষ), 'আচার্য আর্যভট্ট ও ভূভ্রমণবাদ' (৪২ বর্ষ), 'মহাভারতে স্থানীয়মানতত্ত্ব' (৪৩ বর্ষ)। এছাড়া তাঁর 'বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের বয়স' ইত্যাদি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। এখানে বিভূতিভূষণ দত্তের দু-তিনটি প্রবন্ধের বিশেষ উল্লেখ করছি। প্রথমেই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩৭তম বর্ষে প্রকাশিত "জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রাচীন হিন্দুনাম ও তাহার প্রসার" প্রবন্ধটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। এখানে তিনি ভারতীয় জ্যামিতিশাস্ত্রকে কেন শুল্ব বলা হয়েছে—শুল্বসূত্র বলা হয় নি তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে বৌধায়ন শুল্বসূত্র, কাত্যায়ণ শুল্বসূত্র, প্রভৃতি বই এবং এগুলির উপর লিখিত ভাষ্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কখনও কখনও যে এই শাস্ত্রকে 'রজ্জু' বলা হয়েছে, সে কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন; তাছাড়া আরবী এবং অন্যান্য সেমেটিক ভাষাতেই বা এর নাম কি ছিল এবং গ্রীক ও মিশরীয়রাই বা একে কি বলতো তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনাও প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে গণিতের উপর তখনকার দিনে এত উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ আর কেউ লিখেছিলেন বলে মনে হয় না। ঐ সংখ্যাতেই "নামসংখ্যা" নামে তাঁর একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল। বিভিন্ন সংখ্যার পরিবর্তে বিভিন্ন নাম প্রাচীন ভারতে লেখা হত সেই কথাই এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল। এই প্রবন্ধে তিনি বিভিন্ন প্রাচীন ভারতীয় গণিত ও জ্যোতিষ গ্রন্থ থেকে তাঁর প্রবন্ধের তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, পিঙ্গলের ছন্দসূত্র, বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, মহাবীরের গণিতসারসংগ্রহ, ব্রহ্মগুপ্তের ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের লীলাবতী প্রভৃতি গ্রন্থে যে নামসংখ্যার ব্যবহার আছে সেগুলি তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক আলবিরুণী তাঁর ভারত-বিবরণে নামসংখ্যার যে একটি নির্ঘন্ট দিয়েছেন তাঁরও উল্লেখ প্রবন্ধে আছে। এ ধরণের প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। ঐ সংখ্যাতেই তিনি "জৈন সাহিত্যে নাম সংখ্যা" নামে একটি মহামূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। এতে অর্ধমাগধী সাহিত্যে ও মধ্যযুগের জৈন সংস্কৃতসাহিত্যে কিভাবে নামসংখ্যার ব্যবহার করা হয়েছে তা নিয়ে অতি সূক্ষ্ম আলোচনা করা হয়েছে। জৈন আগমগ্রন্থ, অনুযোগদ্বারসূত্র, জিনভদ্রগণি প্রণীত বৃহৎক্ষেত্রসমাস, নেমিচন্দ্র লিখিত গোম্মটসার, কেশবর্ণী কৃত জীবতত্ত্বপ্রদীপিকা স্থানাঙ্গসূত্র,

ত্রিলোকসার প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে ব্যবহৃত নামসংখ্যা তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। অঙ্কে দক্ষিণাগতি এবং নামসংখ্যার উৎপত্তি সংক্রান্ত সমস্যাসমূহও তিনি উপেক্ষা করেন নি। প্রবন্ধটির প্রতিটি পঙক্তি গবেষণামূলক এবং উপস্থাপনা অতি চমৎকার। গণিতের প্রবন্ধ কিভাবে লিখতে হয় তার আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই প্রবন্ধটি। ঐ সংখ্যাতেই অঙ্কানাং বামতো গতিঃ নামে একটি মূল্যবান অথচ চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ ইনি লেখেন। ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে অঙ্কের বামগতির যে প্রচলন আছে তা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে রবার্ট রেকর্ডের যে মত ছিল তিনি তা যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন। যুক্তিগুলি সূক্ষ্ম এবং প্রামাণিক। তিনি গণেশ দৈবজ্ঞ, নৃসিংহ দৈবজ্ঞ এবং মুনীশ্বরের টীকা এবং ভাষ্য প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন। সংখ্যার নামকরণে যে-সব বিভিন্ন ধরণের বিধি আছে সে বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। বিভূতিভূষণ দত্তের রচনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রয়োজনে উদ্ধৃতি এবং উদ্ধৃতিগুলি সর্বদা মূল সংস্কৃত, অর্ধ মাগধী ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। প্রতিটি প্রবন্ধ গাণিতিক মননশীলতায় পূর্ণ এবং সেই সঙ্গে রচনায় সাহিত্যিক রসবোধও আছে। বঙ্গ সাহিত্যে গণিতচর্চার ইতিহাসে বিভূতিভূষণ দত্তের নাম চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রখ্যাত গণিতবিদ্ সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৪৩ বর্ষে "স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যা লিখনের প্রচলিত সঙ্কেতটির উদ্ভাবনকাল" নামে একট মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ছাড়াও প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকাতেও মাঝে মাঝে গণিতের প্রবন্ধ অনেকেই লিখেছিলেন।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগ

স্বাধীনতার পর মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার একটা প্রবণতা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গেও এর প্রভাব পড়ে। ফলে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে এ ব্যাপারে উৎসাহ দেখা যায়। ১৯৪৮ সালে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ বৎসর থেকে পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। এতে বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের মত গণিত বিষয়ক প্রবন্ধও প্রকাশিত হতে থাকে, তবে এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে গণিতের ইতিহাস সম্পর্কিত রচনাই বেশী। এছাড়া বহু বিজ্ঞানের পত্রিকায় গণিতের অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই বিজ্ঞান পত্রিকা গুলির মধ্যে আশিস সিংহ সম্পাদিত 'গবেষণা', আনন্দ-মোহন ঘোষ ও কমলকুমার মজুমদার সম্পাদিত 'অঙ্ক ভাবনা', সৌমেন গুহ সম্পাদিত 'বিজ্ঞান সংস্কৃতি', প্রদীপকুমার মজুমদার সম্পাদিত 'গণিতজগৎ' পরে 'গণিতবার্তা' এবং নৈহাটী থেকে প্রকাশিত 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি'র নাম উল্লেখযোগ্য। এগুলি ছাড়াও দৈনিক সংবাদপত্রের রবিবারের পাতায় মাঝে মধ্যে গণিতের প্রবন্ধ দেখা যায়। তাছাড়া বেশ কিছু অন্য ধরণের পত্রিকাতেও গণিতের প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। তবে বলা বাহুল্য 'গণিতজগৎ'ই সারা ভারতে মাতৃভাষায় প্রকাশিত একমাত্র 'গণিত-পত্রিকা' যা এখনও প্রকাশিত হচ্ছে, যদিও কিছুটা অনিয়মিতভাবে। যাই হোক এখন 'জ্ঞান বিজ্ঞান', 'গবেষণা', 'গণিতজগৎ' এবং অন্যান্য পত্রিকাতে প্রকাশিত গণিতের প্রবন্ধের উপর কিছুটা সমীক্ষা করা যাক।

জ্ঞান-বিজ্ঞান : ১৯৪৮ সালে শ্রীক্ষমা মুখোপাধ্যায় 'ইউক্লিড ও অনিউক্লিডীয় জ্যামিতি'নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন; প্রবন্ধটিতে জ্যামিতিশাস্ত্রের দুটি ধারা নিয়ে

আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার প্রথমাংশে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত; দ্বিতীয়াংশে তত্ত্বের প্রাধান্য। রচনাটি মনোগ্রাহী। ঐ একই বৎসরে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'মাধ্যাকর্ষণ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটিতে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তবে এবিষয়ে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ নাই।

১৯৫০ সালে শ্রীশিশিরকুমার দে গণিতের সঙ্গে দর্শনের সম্বন্ধ এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক ও গণিতবিদগণের মতামত সম্বলিত 'গণিতের নবজন্ম ও পরিচয়' নামে একটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৫১ সালে শ্রীঅলোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'গণিতে সীমান্ত গোলযোগ' প্রবন্ধে অসীমসংখ্যা ও সহযোগী বিষয় নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। ১৯৫৩ সালে শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন 'গণিতের আদি ইতিহাস, ব্যাবিলন ও মিশর' এবং 'পীথাগোরাস ও পীথাগোরীয় বিজ্ঞান' নামে দুটি মনোগ্রাহী অথচ তথ্যবহুল প্রবন্ধ লেখেন। প্রথম প্রবন্ধে মিশর ও ব্যাবিলনের গণিতচর্চার ইতিহাস নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু পীথাগোরাসের সময় পূর্ণ সংখ্যার বৈশিষ্ট্য এবং অমূলক রাশি। ১৯৫৪ সালে শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর 'টপলজি' নামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। এতে টপলজির সৃষ্টি এবং বহু চিত্র সহ টপলজির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি উচ্চাঙ্গের। সম্ভবতঃ গণিতশাস্ত্রের এই আধুনিক শাখা নিয়ে বাংলা ভাষায় এর আগে অপর কেউ আলোচনা করেন নি। বলা বাহুল্য প্রবন্ধটিতে রিচার্ড কুরান্ট এবং হারবার্ট রবিন্স লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধ 'টপলজি'র প্রভাব রয়েছে। ১৯৫৬ সালে শ্রীসঞ্জয়কুমার লাহিড়ী 'গণিতের প্রগতি' এবং 'ইউক্লিড হইতে নন-ইউক্লিড' নামে দুটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রথম প্রবন্ধটিতে জ্যামিতি শাস্ত্রের কয়েকটি দিক এবং দ্বিতীয়টিতে ইউক্লিডেতর জ্যামিতির ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রচনা দুটি খুবই মনোগ্রাহী। ঐ একই বৎসরে শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পাল 'জ্যামিতি ও বিশ্বরহস্য' নামে একটি মূল্যবান এবং তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ লেখেন। যার বিষয়বস্তু মিনকোস্কির জ্যামিতি। ১৯৫৭ সালে এই লেখকই 'অতিকায় সংখ্যা' এবং 'ইউক্লিড ও জ্যামিতি' নামে দুটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রথম প্রবন্ধে তিনি বৃহৎ সংখ্যা এবং আর্কিমিডীয় সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটি সুলিখিত। দ্বিতীয় প্রবন্ধে ইউক্লিড ও রীমানীয় জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি উচ্চাঙ্গের রচনা। প্রায় অনুরূপ প্রবন্ধ লেখেন শ্রীসঞ্জয়কুমার লাহিড়ী এবং শ্রীনীরেন্দ্রকুমার হাজরা। শ্রীলাহিড়ী তাঁর আধুনিক 'গণিত' প্রবন্ধটিতে আধুনিক গণিতের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে রীমানীয় জ্যামিতি ও সংহতিতত্ত্ব (সেট থিয়োরী) নিয়ে লিখেছেন। রচনাটি উচ্চাঙ্গের হলেও মাত্র দুটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ বলে কিছুটা অসম্পূর্ণ বলে মনে করা যেতে পারে। নীরেন্দ্রকুমারের 'জ্যামিতির অতীত ও বর্তমান' প্রবন্ধটিতে জ্যামিতিশাস্ত্রের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। রচনাটি সুলিখিত ও তথ্যসমৃদ্ধ। সুনীলকৃষ্ণ পালের 'পীথাগোরাস-দর্শনের পুনরভ্যুত্থান' একটি মূল্যবান প্রবন্ধ। প্রবন্ধটিতে পীথাগোরাসের দার্শনিক মতবাদ আধুনিক গণিতজগতকে কতটা প্রভাবিত করেছে সে-সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ১৯৫৮ সালে শ্রীচুনীলাল ভট্টাচার্য লিখিত 'পাটীগণিতে অসীম সংখ্যা' প্রবন্ধে গণিতে নির্দিষ্ট ও পৃথক অসীম সংখ্যাসমূহের প্রবর্তন এবং এগুলির মধ্যে পাটীগণিতীয় গণনাপদ্ধতির অর্থপূর্ণ প্রয়োগ বিষয়ক ক্যাণ্টরের মত নিয়ে মনোগ্রাহী আলোচনা করা হয়েছে। ক্ষমা মুখোপাধ্যায় রচিত 'এক, দুই, তিন, পাঁচ দ...শ' প্রবন্ধটি চিত্তাকর্ষক। সহজভাবে শুরু করে তারপর ধীরে ধীরে গুরু গম্ভীর আলোচনায় শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় প্রবেশ করেছেন।

১৯৫৯ সালে শ্রীশুকদেব দত্ত 'গণিতশাস্ত্রের প্রগতি' নামে একটি মনোগ্রাহী প্রবন্ধ

লেখেন। শ্রীদেবব্রত চ্যাটার্জি লিখিত 'অনন্তের পরিভাষা' প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র কিন্তু চিত্তাকর্ষক। এখানে জর্জ ক্যাণ্টরের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন এই প্রবন্ধটিতে চূণীলালবাবুর রচনার প্রভাব অনেক জায়গায় পড়েছে। 'গাণিতিক তর্ক-বিজ্ঞান' প্রবন্ধে ক্ষমা মুখোপাধ্যায় প্রথমে ম্যাথেমেটিক্যাল লজিকের উৎপত্তি এবং পরে বুল ফ্রীড, হোয়াইটহেড, উইটগেন্‌ষ্টাইন, রাসেল, হিলবার্ট প্রমুখদের তত্ত্বের উপর আলোকপাত করেছেন। রচনাটি সত্যই তথ্যসমৃদ্ধ অথচ সহজবোধ্য। শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ লিখিত 'গণিতে রহস্যবাদ' রচনাটি জনবোধ্য এবং মনোগ্রাহী। প্রবন্ধটিতে গ্রীস, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশের সংখ্যা লিখন পদ্ধতির উপর কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। এই লেখকের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'গণিতে শূন্যের আবিষ্কার ও তার পটভূমিকা' ইতিহাসাশ্রিত একটি মূল্যবান রচনা। এখানে গ্রীস, চীন, ব্যাবিলন, মিশর ও ভারতের সংখ্যালিখন পদ্ধতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে শূন্য ও স্থানীয়মান তত্ত্ব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। রচনাটি তথ্যসমৃদ্ধ।

১৯৬০ সালে 'যাদুবর্গ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন শ্রীমনীন্দ্রনাথ দাস। প্রবন্ধটিতে যাদুবর্গের ইতিহাস নিয়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে বিখ্যাত ভারতীয় গণিতবিদ নারায়ণ পণ্ডিত (১৩৫০ খ্রীঃ) লিখিত 'গণিতকৌমুদী' থেকে কোন তথ্য এই প্রবন্ধে সংযোজিত হয়নি। শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ লিখিত 'নাই অথচ আছে' এবং 'i এর কথা' প্রবন্ধ দুটি সংক্ষিপ্ত হলেও সহজবোধ্য সন্দেহ নাই। এখানে কাল্পনিক রাশি i এবং জটিল রাশি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রীঅশেষকুমার দাস লিখিত 'সংখ্যাতত্ত্ব' ছোটদের জন্য মনোগ্রাহী প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ লিখিত 'প্রাচীন ভারতীয় গণিত ও পঞ্চসিদ্ধান্ত' বরাহমিহির রচিত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'র উপর একটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। শ্রীননীগোপাল কর্মকার লিখিত 'জ্যামিতির ক্রমবিকাশ' তথ্যসমৃদ্ধ একটি মূল্যবান প্রবন্ধ। এযাবৎকাল বাংলাভাষায় জ্যামিতিশাস্ত্রের উপর লিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে এটি শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। রচনাটিতে ইংরাজী শব্দ বহুলব্যবহৃত। গণিতবিদদের নাম, জ্যামিতি শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার নাম ইত্যাদি তিনি ইংরাজীতে লিখেছেন। এই ত্রুটিটুকু না থাকলে লেখাটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর বলা যেত।

১৯৬১ সালে শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল 'আধুনিক গণিতশাস্ত্রের ভূমিকা' নামে একটি মনোগ্রাহী প্রবন্ধ লেখেন। ঐ একই বৎসরে শ্রীঅশেষকুমার দাস 'সংখ্যার কথা' নামে প্রবন্ধে আজটেক, ব্যাবিলনীয়, মিশরীয় প্রভৃতি সংখ্যা লিখন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এঁর 'পাই-এর কথা" প্রবন্ধে পাই-এর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা। গণিত কি এবং গণিতের প্রয়োগপ্রণালী নিয়ে 'গণিতের প্রকৃতি' নামে একটি প্রবন্ধ শ্রীরমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬২ সালে লেখেন। ঐ একই বৎসরে শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ 'গণিতের ভাষা' নামে গণিতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯৬৬ সালে ফারমেটের শেষ উপপাদ্যের উপর ভিত্তি করে শ্রীযুগলকান্ত রায় 'ফারমেট ও তার শেষ উপপাদ্য' নামে একটি জনবোধ্য প্রবন্ধ লেখেন। লেখাটি তথ্যসমৃদ্ধ। ১৯৬৬ সালে শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ 'শূন্য আর এক' নামে একটি নূতন অথচ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। দুঃখের বিষয় ১৯৬৬ সালের পর থেকে 'জ্ঞান-বিজ্ঞানে' গণিতের উপর প্রবন্ধ খুব কমে গিয়েছে। ফলে বাংলাভাষায় গণিতচর্চার ইতিহাসে 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' যে প্রভাব বিস্তার করেছিল দুর্ভাগ্যবশতঃ তা হ্রাস পেয়েছে। তবে মাঝে মধ্যে দু'চারটি মূল্যবান প্রবন্ধ এর পরেও যে প্রকাশিত হয়নি তা নয়।

গবেষণা : এই পত্রিকার প্রথম কয়েকটি খণ্ডে গণিতবিষয়ক প্রবন্ধ তেমন প্রকাশিত

হয়নি। শ্রীপ্রদীপকুমার মজুমদার বিভাগীয় সম্পাদক হিসাবে যোগদান করার পর গণিতের দিকে এর ঝোঁক ক্রমবর্ধমান। তিনি 'গবেষণা' পত্রিকাতে বিভাগীয় সম্পাদক হিসাবে যোগদানের পূর্বে কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্রে 'সাহিত্য এবং ও সংস্কৃতি' পত্রিকাতে প্রবন্ধ লেখেন। 'সাহিত্য সংস্কৃতি'তে 'প্রাচীন ভারতের গণিতচর্চা' নামে প্রকাশিত তথ্যবহুল প্রবন্ধটি পশ্চিমবঙ্গ প্রবন্ধলেখক-সম্মেলন কর্তৃক পুরস্কৃত। প্রদীপকুমার মজুমদার যোগদান করার পর 'গবেষণা' পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে গণিতের সংবাদ, উচ্চতর গণিতের উপর প্রবন্ধ, গাণিতিক সমীক্ষা ইত্যাদি নিয়ে লেখা প্রকাশিত হত। গণিতের সংবাদ বলতেছিল তৎকালীন গণিতশাস্ত্রে আবিষ্কৃত তত্ত্বের বাংলা সারানুবাদ পরিবেশন। এগুলি প্রদীপবাবুই সংকলন করতেন। এই সারানুবাদের মধ্যে 'গূঢ় অপেক্ষক' (জুলাই ১৯৭১), 'গণিতে নূতন তত্ত্ব' (অক্টোবর ১৯৭১), 'বীজগণিতীয় স্থানিকবৃত্তে নূতন তত্ত্ব' (জানুয়ারী-মার্চ ১৯৭২), 'সূক্ষ্মকলণের কয়েকটি নূতন বৈশিষ্ট্য' (এপ্রিল-জুন ১৯৭২) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইনি নিজে অনেক গাণিতিক পরিভাষা সৃষ্টি করে এই সারানুবাদগুলি লিখেছিলেন। সমীক্ষামূলক রচনার ক্ষেত্রে 'ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে ৫৮তম অধিবেশনে বিশুদ্ধগণিত' উল্লেখযোগ্য। রচনাটিতে উক্ত অধিবেশনে পঠিত গাণিতিক প্রবন্ধের উপর পরিসংখ্যানগত সমীক্ষা করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এ ধরণের প্রবন্ধ সম্ভবতঃ কোথাও প্রকাশিত হয়নি। ইনি 'আজকের ভারতে বিশুদ্ধগণিত' (অক্টোবর ১৯৭১), 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফ্যাংসন' (১৯৭৩) নামে দুটি সমীক্ষামূলক অথচ গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লেখেন। প্রথমটির বিষয় ভারতবর্ষে বিশুদ্ধ গণিতচর্চার ক্ষেত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি এবং প্রতিকারের উপায়। রচনাটিতে কিছু প্রতিষ্ঠিত গণিতবিদের বিরুদ্ধ সমালোচনা দেখা যায়। দ্বিতীয় প্রবন্ধে গণিতচর্চার জন্য একটি গণিত সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রদীপকুমার মজুমদার ১৯৭২ সালে 'ক্যাণ্টরের এক সুবিন্যস্ত গুচ্ছ' নামে আধুনিক গণিতশাস্ত্রের উপর একটি তাত্ত্বিক প্রবন্ধ লেখেন। লেখাটি অসম্পূর্ণ। ঐ একই বৎসরে সুবীরকুমার সেন 'রাসেলকূট ও অন্য অনুষঙ্গ' নামে একটি সংবাদ ও ভাষ্য লেখেন। রচনাটি তথ্যপূর্ণ অথচ মনোগ্রাহী।

অঙ্ক ভাবনা : আনন্দমোহন ঘোষ ও কমলকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'অঙ্ক ভাবনা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে। বাংলা ভাষায় অঙ্ক বিষয়ক পত্রিকা এইটিই প্রথম। এতে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত গণিতগ্রন্থের অনুবাদ, পঁয়কারে প্রমূখ পাশ্চাত্য গণিতবিদদের রচনার অনুবাদ প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া জীবনী গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস ইত্যাদি তো আছেই। প্রথম সংখ্যায় দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের লীলাবতী গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদের বাকী অংশ এখনো প্রকাশিত হতে বাকী। বলাবাহুল্য 'লীলাবতী' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ এর আগে রাধাবল্লভ স্মৃতিব্যাকরণ জ্যোতিস্তীর্থ করেছিলেন। যাই হোক 'অঙ্ক ভাবনা' পত্রিকাটি সুসম্পাদিত ও সুলিখিত অঙ্কের পত্রিকা হিসাবে চিরদিন মর্যাদা পাবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গণিত জগৎ : ১৯৭৫ সালে গণিত সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পত্রিকা 'গণিত জগৎ' প্রকাশিত হয়। পরে এটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'গণিতবার্তা'। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন প্রদীপকুমার মজুমদার। প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এটি বিদগ্ধমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই পত্রিকার কার্টুন, গাণিতিক কৌতুক-নক্সা, গণিতবিদদের জীবনী, গাণিতিক দর্শন, গণিতের ইতিহাস, গাণিতিক সমীক্ষা, গণিতের সংবাদ, গণিতের ছড়া, উচ্চতর গণিতের তত্ত্ব ইত্যাদি রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। লেখক-

গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন সম্পাদক নিজে এবং ডঃ অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়। তাছাড়া ডঃ মলয় পাহাড়ী, সমীরণ সাহা প্রমুখ ছিলেন। প্রদীপকুমার মজুমদার ছদ্মনাম 'শ্রীগণিতবিদ্' নামেও বহু প্রবন্ধ লিখেছেন।

'গণিত জগতের' প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত ব্যঙ্গ চিত্রটির বিষয়বস্তু তখনকার দিনের গণিতে এম. এস. সি. পরীক্ষায় গণ টোকাটুকি। ছবিটির বিষয়বস্তু কল্পনা করেছেন প্রদীপকুমার মজুমদার এবং এঁকেছেন তাঁর এক ছাত্রী। 'গণিত জগতে' 'কলিকাতা মাখামাখি সংঘ' এবং ''বারো-ইয়ারী গণিত পরীক্ষা' নামে দুটি গাণিতিক কৌতুক-নক্সাও প্রকাশিত হয়। দুটি নক্সাই লিখেছেন 'শ্রীগণিতবিদ'। প্রথমটিতে কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষণীয়। পশ্চিমবঙ্গের কিছু গণিতবিদকে কটাক্ষ করে এটি লিখিত। পশ্চিমবঙ্গে গণিতবিদরা শুধু দলাদলি এবং স্বজনপোষণের জন্য আজ গণিতচর্চার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছেন এই মনোভাবকে আঘাত করার জন্যই এই নক্সাটি লেখা হয়েছিল।

প্রদীপকুমার মজুমদারের 'গণিত জগতে' প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে 'গণিতের সঙ্কট' (৭৬-৭৭), 'সমাজ ও গণিত' (৭৬-৭৭), 'আমাদের দৃষ্টিতে গণিত' (৭৮) 'গাণিতিক সৃজন' (৭৮-৭৯) প্রবন্ধগুলি গাণিতিক দর্শনের উপর লিখিত, রচনাগুলিতে বিদেশী প্রভাব বর্তমান। গাণিতিক দর্শনের প্রবন্ধগুলি লেখার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন অধ্যাপক নরেন দাশগুপ্ত। ইনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে নিঃস্বার্থভাবে, মাত্র গণিত-শাস্ত্রের প্রতি প্রীতিবশতঃ বহু বিজ্ঞান লেখককে সাহায্য করে থাকেন। বঙ্গ সাহিত্যে গণিত-চর্চার ক্ষেত্রে হয়তো এঁর নাম লেখা থাকবে না, কিন্তু প্রকাশিত গণিত বিষয়ক বহু প্রবন্ধের পশ্চাতে এঁর প্রেরণা ও সাহায্য শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। প্রদীপকুমার মজুমদার লিখিত বহু বিতর্কিত 'আর্যভট' (৭৬-৭৭), 'আধুনিক গণিতশাস্ত্রের শুভ সূচনাকাল' (৭৮-৭৯), 'টপলজির ইতিহাস' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলিতে প্রাসঙ্গিক বহু তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে।

ডঃ অসীম মুখোপাধ্যায় গণিতের প্রশ্নপত্রের উপর সমীক্ষামূলক বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। সম্ভবতঃ এর আগে এ বিষয়ে কেউ এভাবে লেখেননি। ডঃ মুখো-পাধ্যায়ের ভাষা প্রাঞ্জল এবং মনোগ্রাহী। ডঃ মুখোপাধ্যায় এ ধরণের গাণিতিক প্রবন্ধ অন্যত্রও লিখেছেন। 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে'র '৮১ ডিসেম্বর সংখ্যায় 'কিছু পরিমিতি সমস্যা' নামে তাঁর একটি মূল্যবান রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ডঃ মণীন্দ্রচন্দ্র চাকী 'পাই-এর মান' এবং 'ক্লাইন বোতল' সম্পর্কে দুটি চিত্তাকর্ষীয় কবিতা লেখেন। পাই-এর মান তিনি শব্দ সংখ্যায় দিয়েছেন। বলা বাহুল্য এই শব্দ সংখ্যার প্রচলন প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদদের রচনায় দেখা যায়। গণিতের কবিতা অবশ্য এর আগেও দু চারজন লিখেছেন। তার মধ্যে কমলকুমার মজুমদারের নাম করা যেতে পারে।

একথা ঠিক 'গণিত জগৎ' বা 'গণিতবার্তা' উচ্চাঙ্গের গণিত বিষয়ক পত্রিকা হলেও এর নিয়মিত কোন বিভাগ ছিল না এবং অনিয়মিতভাবে এটি প্রকাশিত হত। তাছাড়া লেখকগোষ্ঠীও বাঁধাধরা ছিল। একটি পত্রিকা চালাতে গেলে লেখকগোষ্ঠী তৈরী করতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় পত্রিকাটি এ ব্যাপারে উদাসীন ছিল।

প্রদীপকুমার মজুমদার বাংলা ভাষায় অন্যূন পঁচাত্তরটি প্রবন্ধ লিখেছেন। 'গবেষণা' এবং 'গণিত জগৎ' ছাড়াও 'ইতিহাস', 'বিজ্ঞান সংস্কৃতি', 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি লিখেছেন। 'ইতিহাস' পত্রিকায় "প্রাচীন ব্যাবিলনের গণিতচর্চা"

নামে তাঁর একটি গবেষণা মূলক প্রবন্ধ ১৩৮০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৮ সালের 'বিজ্ঞান সংস্কৃতি' পত্রিকাতে 'প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় চিন্তাধারায় মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব' এবং 'ভারতীয় ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রে Sin' নামে তিনি দুটি প্রবন্ধ লেখেন। এছাড়া প্রদীপবাবু নৈহাটী থেকে প্রকাশিত 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' এবং 'বিজ্ঞানী' পত্রিকাতেও তাঁর কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় 'ভারতীয় জ্যামিতি-শাস্ত্রে মহর্ষি বৌধায়ন' নামে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনা তথ্যসমৃদ্ধ, হলেও তবে ভাষার দৈন্য পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশে গণিতের প্রবন্ধ খুব বেশী প্রকাশিত হয় নি। 'বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিক'ায় দু চারটি গাণিতিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে আল সিদ্দিক রচিত 'বাংলা ভাষায় সংখ্যাপাঠপ্রণালী' (১৩৮৬), এবং প্রদীপকুমার মজুমদার লিখিত, 'সাহিত্য ও গণিত' (১৩৮৮) প্রবন্ধ দুটি উল্লেখযোগ্য। আল সিদ্দিক তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন বাংলা সংখ্যাপ্রণালী বর্ণমালালিখনপ্রণালীর চাইতে অনেক বেশী অবৈজ্ঞানিক। তিনি এই প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং সমস্যা সমাধানে কয়েকটি সম্ভাব্য মডেল নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বই : গণিতের প্রবন্ধের তুলনায় বই প্রকাশিত হয়েছে খুবই কম। জ্যোতির্বিদ্যার উপর লিখিত কয়েকটি বই বেশ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু গণিতবিষয়ক বই-এর মধ্যে গগন-বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'গণিতের কথা', রমাতোষ সরকার লিখিত 'প্রাচীন ভারতের গণিত চিন্তা', প্রদীপকুমার মজুমদার লিখিত 'প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা' এবং 'বাস্তবসংখ্যা ও সহযোগী' উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে প্রকাশিত কাজী মোতাহার হোসেন লিখিত 'গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস' একটি উল্লেখযোগ্য বই। পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে স্নাতক পর্যায়ে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য পুস্তকপর্ষদ ডঃ প্রদীপকুমার মজুমদারের 'আমাদের দৃষ্টিতে গণিত' নামে একখানি গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য আরম্ভ করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর গণিতচর্চা এখন যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তার প্রতিফলন বাংলা ভাষায় গণিতচর্চার ক্ষেত্রে দেখা যায় না। আমরা আশা করবো আগামীদিনের প্রবীণ এবং নবীন গণিতবিদরা এ বিষয়ে নজর দিয়ে বঙ্গ সাহিত্যে গণিতালোচনাকে পূর্ণতর করবেন।

N
TRIPURA STATE.
Scale 16 Miles to an inch
DT. SYLHET
DT. CACHAR
Chorsibari Rs.
MIZORAM
DT. CHITTAGONG
DT. NOAKHALI
Ferny Rs.
REFERENCES
National Highway
Major Rivers
Other important place
Air Routes

ত্রিপুরার উপজাতি লোকগীতি

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

আমাদের চেনাকালে লোকগীতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা দুরূহ। তার কারণ পূর্বেকার সহিত সমাজের শাসন ও বন্ধন একালে শিথিল হয়ে যাচ্ছে। সমাজের সঙ্গে লোক-সাহিত্যের সম্পর্ক আত্মা ও দেহের সম্পর্ক। সমাজ-দেহ ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মাও বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। এই ভাঙনের প্রক্রিয়া আজকের নয়, দু শ বছর আগেকার। দু শ বছর পূর্বে যখন সাগর পেরিয়ে বৃটিশ এলো সেদিনই ভারতবর্ষে অর্থনীতিতে স্বনির্ভর, আত্মকেন্দ্রিক সংহত গ্রামীণ সমাজের ভাঙন শুরু হল। কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই— তিন প্রেসিডেন্সিতে ইংরাজ শাসনের পাকাপোক্ত আসন প্রতিষ্ঠিত হল সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে। তারপর থেকে ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে শুরু হল ইংরেজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিজয়াভিযান। সহস্রাব্দের গ্রামীণ ভারতীয় সমাজের আর্থনীতিক কাঠামো ধীরে ধীরে ভেঙে গেল, ভারতবর্ষ হয়ে উঠল কাঁচামালের জোগানদার ও বৃটিশের উৎপাদিত মালের বৃহৎ বাজার। এর ফলে ভারতের গ্রামীণ কুটির-শিল্প ও হস্ত-শিল্প ধ্বংস হল, সেই সঙ্গে ভেঙে গেল গ্রামীণ সমাজের অবরোধের প্রাচীর। আর তা ভেঙে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লোক শিল্প ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসে পড়ল নতুন অচেনা স্রোত, যা বিনষ্ট করল লোকসংস্কৃতিগত শান্তি ও সুস্থিতিকে। ভারতীয় সমাজ-দেহে ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে লোকগীতিও হারাল বিশুদ্ধি ও সংরক্ষণশীল চরিত্র।

এটা কেবল ভারতবর্ষের পক্ষেই সত্য নয়, দুনিয়ার সবদেশেই তা ঘটেছে। লোক-গীতির বিশুদ্ধি সব দেশেই নষ্ট হয়েছে যেহেতু প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে গেছে। ইংল্যাণ্ডের লোকগীতির বিলুপ্তির কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে এ. উইলিয়ামস লিখেছেন :

Education has played its part. The instruction given to the children of village schools proved antagonistic to the old minstrelsy. Dialect and homely language were discontenanced. Teachers were imported from the towns, and they had little sympathy with village life and customs. The words and spirit of the songs were misundenstood, and the tunes were counted too simple. The construction of railways, the linking up of villages with other districts, and contact with large towns and cities had an immediate and permanent effect upon the minstrelsy of the countryside. Many of the village labourers migrated to the towns or the colonies, and most of them no longer camed for the old ballads, or were too busily occupied to remember them. [A. Williams, Folk-Songs of the upper Thames', London, 1923, P.-3].

গ্রামীণ লোকগীতির বিশুদ্ধি-বিনষ্টি ও ক্রম-অবলুপ্তির কারণ এখানে নির্দেশিত হয়েছে—

১. গ্রামে শিক্ষার প্রসার—বিদ্যালয়ে শহরাগত শিক্ষকের প্রভাবে গ্রামের উপভাষা ও ঘরোয়া ভাষার প্রাধান্য হ্রাস।

২. রেলপথ-নির্মাণের ফলে গ্রামের সঙ্গে শহর, বন্দর ও বাণিজ্য-কেন্দ্রের সংযোগ-সাধনে গ্রামের অবরোধ ও সংরক্ষণশীলতার অবলুপ্তি।

৩. গ্রামীণ সমাজের শাসন-মুক্ত বিভিন্ন পেশার মানুষের শহরে গমন, গ্রামীন সমাজের উপর নির্ভরতা-হ্রাস ও তাদের মারফৎ গ্রামে শহুরে ধ্যান-ধারণা আদবকায়দা আমোদ-প্রমোদের আমদানি।

এইসব কারণ কেবল ইংল্যাণ্ডের পক্ষেই সত্য নয়, দুনিয়ার সবদেশের পক্ষেও সত্য। বঙ্গদেশের পক্ষেও সত্য। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য় গ্রামীণ সমাজের ভাঙন ও অবরোধ-প্রাচীরের বিলুপ্তি ছবি স্পষ্ট-ভাবে ধরা আছে। আর সেখানেই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে, কীভাবে গ্রামীণ লোক-সংস্কৃতির সমাদর ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে কমে যাচ্ছে এবং তার জায়গা নিচ্ছে শহুরে আমোদ-প্রমোদ। সেদিন যা ছিল শহরে টকি-বায়স্কোপ, আজ তা হচ্ছে ট্রানজিস্টারের গান।

পশ্চিমবঙ্গ যেভাবে আধুনিক জীবনের ধ্যানধারণাক্রান্ত হয়েছে, ত্রিপুরা সেভাবে হয়নি। তার কারণ ত্রিপুরার প্রাকৃতিক দুর্ভেদ্যতা, শাসন ও আধুনিকতার কেন্দ্র (কলকাতা) ও ইংরেজ অধিকার-পরিমণ্ডল থেকে দূরে অবস্থিতি। ঠিক যে কারণে ময়মনসিংহ অঞ্চলে লোকসংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ থাকতে পেরেছিল (অন্তত দীনেশ-চন্দ্র সেন ও কামিনীকুমার দে-র ময়মনসিংহ-গীতিকা সংগ্রহকালে), সে কারণেই ত্রিপুরা লোকগীতির সংরক্ষণে ও প্রচারে সফল হতে পেরেছে। আধুনিক শিক্ষা, জীবনযাত্রা ও আদবকায়দা ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চলে এখনো পর্যন্ত প্রবেশলাভ করেনি বলেই ত্রিপুরার লোকগীতি অনেকটা অবিকৃত থাকতে পেরেছে।

ত্রিপুরা আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র (কলকাতা) থেকে বরাবই অনেকটা দূরে থেকেছে। ত্রিপুরার রাজবংশ ভারতের আর পাঁচটা রাজবংশের মতো পৌরাণিক গৌরব দাবি করে থাকে, যা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। সম্রাট যযাতির পুত্র দ্রুহ্য চন্দ্র-বংশাবতংস ত্রিপুরা-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা—এই আষাঢ়ে গল্প বাদ দিয়ে যদি আমরা ইতিহাসের স্পষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভর করি, তাহলে স্বীকার করতে হয়, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে কিরাতবংশজাত বিজয়মাণিক্য স্বাধীন ত্রিপুরার প্রথম রাজা। আরো স্বীকার্য, মুসলমান আমলে ত্রিপুরার রাজবংশ একাধিকবার পাঠানদের হাতে নিগৃহীত ও পরাস্ত হয়েছিলেন এবং সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তথাপি ঢাকা বা গৌড়ের মুসলমান শাসন ত্রিপুরাকে চেপে রাখেনি, মোটামুটি মৌখিক আনুগত্য পেয়েই রেহাই দিয়েছে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে একজন বৃটিশ অফিসারকে বৃটিশের পলিটিক্যাল এজেন্টরূপে ত্রিপুরায় পাঠানো হয়। ১৮৭৮-এ এই পদের অবলুপ্তি ঘটানো হয়। তার জায়গায় ত্রিপুরার সন্নিহিত বৃটিশ শাসিত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির কুমিল্লা জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে পদাধিকার বলে ত্রিপুরার পলিটিক্যাল এজেন্ট রূপে পাঠানো হয়। আর একজন বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে আগরতলায় বসানো হয়। তিনি সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। শেষ পর্যন্ত পূর্বভারতের সকল করদ রাজ্যের একজন (বৃটিশ) পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হন। তিনি ত্রিপুরারও রাজনৈতিক অভিভাবক নিযুক্ত হন এবং কলকাতাস্থিত 'ভারত সরকারের গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট' নামে অভিহিত হন।

এরই অভিভাবকতায় "স্বাধীন" ত্রিপুরা রাজ্যের "রাজারা" ত্রিপুরা শাসন করেন। বীরচন্দ্র মাণিক্য, রাধাকিশোর মাণিক্য, বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য ও বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য উনবিংশ শতাব্দের শেষ প্রহর থেকে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত অর্ধ শতাব্দের অধিককাল ত্রিপুরাকে শাসন করেন। স্মর্তব্য এই চার মহারাজার সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ প্রীতি সম্পর্ক ছিল। আরো স্মর্তব্য, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে মহারাজা বিজয় মাণিক্যের রাজত্বকালে বাঙালি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যজাতীয় গুণীব্যক্তিরা মহারাজার আমন্ত্রণে ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট হন। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ত্রিপুরায় বাঙালি হিন্দু উপনিবিষ্ট হয়েছে। ভারত স্বাধীন হবার পরে ত্রিপুরারাজ্য ভারত ইউনিয়নে যোগ দেয় (১৫ অক্টোবর ১৯৪৯)। চীফ কমিশনার-শাসিত অঞ্চল, 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্য, কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল, শেষ পর্যন্ত ভারতের অন্যতম রাজ্য রূপে ত্রিপুরা পরিগণিত হয় (২১ জানুয়ারি ১৯৭২)। আজ ত্রিপুরা ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত রাজ্য রূপে অন্যান্য রাজ্যের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

পাহাড় উপত্যকা টিলা নদী দড়া অরণ্য পরিবৃত ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের দক্ষিণপূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এর তিনদিক ঘিরে আছে বাংলাদেশ, কেবল কাঁধের উপর এক সরু ফালি জমি দিয়ে আসামের সঙ্গে যুক্ত। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে রেলপথ মাত্র ২১ কিলোমিটার—আসাম-সংযোজক জমিতে উত্তর প্রান্তের শহর চুরাইবারি থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত ঐ রেলপথ বিস্তৃত। আসামের ঐ ফালি-জমি ছাড়া ত্রিপুরার সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের স্থলপথে জলপথে কোনো যোগাযোগ নেই (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। কলকাতা থেকে আকাশ-পথে ৩২০ কিলোমিটার ও রেলপথে উত্তরবঙ্গ-আসাম হয়ে ১৭০০ কিলোমিটার ঘুরপথে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় পৌছনো যায়। ধর্মনগর থেকে আগরতলা মোটরবাসে একদিনের পথ। ঐ থেকে প্রমাণ হয়, ত্রিপুরা নাগরিক সভ্যতা থেকে অনেক দূরে আছে, আর সে কারণেই লোকসংস্কৃতি অনেকটা অবিকৃত রূপে এখানে লভ্য। তবু বড় রেডিও, ট্রানজিস্টর রেডিও, আকাশপথে আনীত কলকাতা-গৌহাটি-দিল্লীর দৈনিক সংবাদপত্র ত্রিপুরাকে মানসিক বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করেছে। এবং সিনেমার প্রবল সর্বগ্রাসী অভিভব ত্রিপুরায় সর্বব্যাপী হতে পারেনি। তবে শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অবরোধ ভেঙে যাচ্ছে।

ত্রিপুরার জনসংখ্যা খুব বেশি নয়, ঘনত্বও কম। ত্রিপুরার আয়তন ১০,৪৭৭ কিলোমিটার, বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমানার দৈর্ঘ্য ৮৫০ কিলোমিটার। প্রতিবর্গ মাইলে জনসংখ্যার গড় ১৪৯। ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য ত্রিপুরা। তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৫০৪ (১৯৭১-র আদমশুমারি অনুযায়ী)। ত্রিপুরার লোকসংখ্যা—১৬ লাখের কিছু কম (১৫,৫৬,৩৪২) ১৯৭১-র জনগণনা অনুযায়ী। ১৯৮১-তে তা ২০।২২ লাখে পৌচেছে। ভারতের মোট লোক-সংখ্যার ০·২৯% অংশ হল ত্রিপুরার লোকসংখ্যা (যেখানে উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যা ভারতের মোট লোকসংখ্যা ১৬·১২%, পশ্চিমবঙ্গের ৮·০৮%, বিহারের ১০·১২%, মহারাষ্ট্রের ৯·২০%, রাজস্থানের ৪·৭০%, ওড়িশার ৪%, কেরলের ৩·৯০%)।

১৯৭১-এর ১লা এপ্রিল ত্রিপুরার জনসংখ্যা ছিল—১৫,৫৬,৩৪২, তার মধ্যে পুরুষ—৮০১,১২৬, নারী—৭৫৫,২১৬। ত্রিপুরায় আছে ছটি পাহাড়, ছটি উপত্যকা, অসংখ্য নদী ও দড়া আর বিস্তীর্ণ অরণ্য। ত্রিপুরা তিনটি জেলায় বিভক্ত। উত্তর ত্রিপুরা, লোকসংখ্যা—৪,০৫,০০৯, পশ্চিম ত্রিপুরা, লোকসংখ্যা—৭,৫১,৬০৫, দক্ষিণ ত্রিপুরা,

লোকসংখ্যা—৩,৯৯, ৭২৮। বড় শহর বলতে একমাত্র আগরতলা (রাজধানী), লোক-সংখ্যা ৭,৫১, ৬০৫ (১৯৭১-এর জনগণনা অনুযায়ী)। আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরায় অবস্থিত, বাংলাদেশ সীমান্তে, তার পাশেই আখাউড়া (বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন)। ত্রিপুরার বেশিরভাগ লোক বাস করে পশ্চিম ত্রিপুরায় প্রতি কিলোমিটারে ঘনত্ব ২২৪, উত্তর ত্রিপুরায় ঘনত্ব ১১৪, দক্ষিণ ত্রিপুরায় ১১২। সহজেই অনুধাবন করা যায়, ত্রিপুরায় বহু এলাকা জনহীন বা সামান্য সংখ্যক অধিবাসী অধ্যুষিত। বিস্তীর্ণ পাহাড়-জঙ্গল এলাকায় বাস করে কিরাত উপজাতি সমূহ। ত্রিপুরার শহর বলা যায় ছটি জনপদকে — আগরতলা, খোয়াই, ধর্মনগর, কৈলাশহর, রাধাকিশোরপুর, বেলোনিয়া। ত্রিপুরার মোট লোকসংখ্যার মাত্র ১০·৪৩/. শহরবাসী। বাকি সব থাকে গ্রামে ও জঙ্গলে। ত্রিপুরায় গ্রামবাসকারীর মোট সংখ্যা—১৩,৯৩,৯৯২। ষোল লাখের মধ্যে প্রায় সাড়ে চোদ্দ লাখ গ্রামে থাকে (১৯৭১-এর জনগণনা অনুযায়ী), শহরবাসীর সংখ্যা দেড়লাখ মাত্র।

ত্রিপুরার সমতলভূমি ("লুঙ্গা") রাজ্যের মোট আয়তনের ৪০·/., আর উচ্চপার্বত্য এলাকা ("টিলা") মোট এলাকার ৬০·/.। আজো পার্বতী মানুষ (উপজাতি) "জুম" প্রথায় চাষ করে। তাদের খুব কম সংখ্যকই শহরে আসে। মগ, জমাতিয়া, চাকমা (ত্রিপুরী সমেত) উপজাতিভুক্ত লোকেরা সমতলভূমিতে বাস করে। রিয়াং আর লুসাই উপজাতি টিলার পর কাঠের ঘর ("টঙ") বেঁধে বাস করে। স্মর্তব্য, ১৯৩১-এর জনগণনায় এই উপজাতিরা ছিল ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যার ৫০·/.র বেশি, ১৯৭১-এর জনগণনায় ৩৩·/.-র কম। ১৯৫১ থেকে ১৯৭১-র মধ্যে পূর্বপাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে বিপুলসংখ্যক বাঙালী হিন্দু ত্রিপুরায় চলে আসে, তার ফলে ত্রিপুরার জনসংখ্যায় আজ বাংলা ভাষীরাই সংখ্যায় প্রধানগোষ্ঠী।

১৯৬১-র জনগণনায় দেখা যায়, ত্রিপুরায় ১১২টি ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত। ১৯৭১-এর জনগণনায় ৬১টি ভাষা ত্রিপুরায় প্রচলিত বলে ধরা হয়েছে। মাত্র সাতটি ভাষায় (বাংলা, ত্রিপুরী, রিয়াং, চাকমা, জমাতিয়া, হিন্দী, মণিপুরী) মোট লোকসংখ্যার এক শতাংশের বেশি সংখ্যা কথা বলে। বাকি সব উপভাষায় সামান্য সামান্য সংখ্যক লোক কথা বলে। এবং বেশির ভাগ উপজাতির লোকেরা দ্বিভাষিক বা ত্রিভাষিক। মোট জনসংখ্যার ৯৩·৬৪·/. অংশ বাংলায় কথা বলে, ত্রিপুরীতে বলে ১·৮৭·/., রিয়াং ভাষায় বলে ০·০২·/., চাকমা ব্যবহার করে ০·০৫·/., জমাতিয়া ব্যবহার করে ০·০১·/., মণিপুরীতে কথা বলে ১·৬৪·/. অংশ। আর হিন্দীতে কথা বলে মোট লোকসংখ্যার ১·৭৯·/., ওড়িয়াতে ০·০৯·/.। ১৯৭১-এর জনগণনায় এই সংখ্যা-বিভাজন পাওয়া যায়। প্রায় ষোল লাখ লোকের মধ্যে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে পনের লাখের উপর।

ত্রিপুরার জনসংখ্যা ও ভাষা ব্যবহারকারীর এই চরিত্র গড়ে উঠেছে বিশ বছরে (১৯৫১-৭১)। আজ ত্রিপুরা রাজ্যে সবদিক দিয়ে বাঙালি ও বাংলা ভাষার আধিপত্য।

এখানে ত্রিপুরার কিরাত উপজাতি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রচলিত লোকগীতির পরিচয়দানের পূর্বে ঐসব সম্প্রদায়ের ভাষা ব্যবহারকারীদের সংখ্যা-তালিকা দেওয়া হইল। (১৯৭১-এর জনগণনা অনুযায়ী):

বিষ্ণুপুরিয়া—৯,৮৮৪ ; চাকমা—২৮,৬১৯ ; কারলঙ—২,৪২২ ; গারো—৫,৫৪৯ ; হালাম—৬,১৬৬ ; জমাতিয়া—২২,৪৪৬ ; কাইপাঙ—২,২৪১ ; কলই—২,২২২ ; কারবঙ—

৬৬; ককবরক—১,৩২১ ; কুকি—৪,৮৫৭ ; লুসাই—৪,৩৮৮ ; মণিপুরী—১৭,১৮৪ ; মারসুম—৩,৪৩০ ; মেইতেই—৪,৪৬৩ ; মঘ—১২,৩৩৩ ; নোয়াতিয়া—৪,১২৭ ; রাংখাল —১.০২৮ রিয়াং—৬০,৩৬২ ; রুপিনী—২,৬৫৭ ; ত্রিপুরী—২,৬৪,৭০২ ।

॥ দুই ॥

ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত লোকগীতির বিচিত্র নিদর্শন এখানে উপস্থিত করছি। এইসব গান আজো সংগৃহীত হয় নি। ত্রিপুরা সরকার কিছু গান সংকলন করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ গান বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের ত্রিপুরা বাসকালে (১৯৭৭-৮০) সংগৃহীত।

ত্রিপুরী লোকগীতি

উপজাতিদের মধ্যে ত্রিপুরীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা অরণ্যপ্রকৃতির সন্তান। তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠে আসছে 'জাহুনি' গান। এই গানের সমর্থনসূচক এক বিশেষ সুরমিশ্রিত শব্দ এ-হু-হু ভাষা-রুচি-সংস্কৃতি-পরিবেশের ব্যবধান ডিঙিয়ে শ্রোতার মনে সাড়া তোলে।

ত্রিপুরীদের নবান্ন উৎসব হয় শ্রাবণ মাসে। এই উৎসবের দিনে তারা পরস্পরকে নিজ নিজ 'টঙে' নিমন্ত্রণ করে, খাওয়ায়। ঐ দিনটি ত্রিপুরীদের জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন। সেদিন তারা নবান্নের গান গায়—

(১) ওয়াতাই ছাতুং মাজাক আই তাংখা বিছিছা।
অ তাই, বায়ারক তিনি তংথকুমা দিন ছা।
মতিাই চংনি বথিা ফুর অই রখা মাইমা।
অ যাতুরক্ ফাইদি ব-ন তিনি খুসুংমা।
কারুক তাংখা, পুন্ তাংখা, যত কাই বাংখা।
অ বায়ারক মতিাই খুমুমই চং মিা ছানাইখা।
ব-ছি চিনি মতিাই বুবাগ্রা।
তা খলাইদি ব-ন, তাখিবিদিবন॥
[ি = অ + ও-র মধ্যবর্তী ধ্বনি। র উচ্চারিত হবে কতকটা রৌ]

অনুবাদ : সারা বছর রোদ বৃষ্টিতে ভিজে করেছি কাজ। তাই ফসল তোলায় আজ আমাদের আনন্দের দিন। ভগবান আনন্দে আমাদের দিয়েছেন ধনৈশ্বর্য। আজ তাঁকে পূজা করবার দিন। পায়রা কাটা হয়েছে, পাঁঠা বলি হয়েছে, আর সকল গ্রামবাসী এনেছে চাল। হে বন্ধুগণ, তাই আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে আরম্ভ করছি নৃত্য। তিনিই হয়েছেন ধনসম্পদের মাতা, তিনিই হয়েছেন আমাদের জীবন। তাই তাঁকে শতকোটি প্রণাম॥

ত্রিপুরার উপজাতি গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান পূজানুষ্ঠান 'গরিয়া' বা 'গুরিয়া' পূজা অনুষ্ঠিত নববর্ষ দিবসে। সাতদিন ব্যাপী এই পূজায় নাচ গান হয়। গরিয়া পূজায় দেবতার উদ্দেশ্যে গাওয়া হয় এই গান :

(২) বাবা গরিয়া নি বুসকাং অ মি ছালাই নাই।
তই মা তই-ন-খকলাই নাই।

বাবা য়াকুর ছুলাই নাই।
ফাইদি মারে তই মা তই-ন-থকলাই নাই।
নং হর-ন দিন থ্লাই মা নাই ছাল্-ন-হর-থ্লাই-মা নাই।
নং ছি বাবা ফাই-খা বিছি ছা উ-ল।
চরি খুমুম্ অ চং মছি া অ॥

অনুবাদ : বাবা গরিয়া-র সামনে আমরা আনন্দে নাচব। গোমতী নদীর জল আমরা আনব। বাবা গরিয়া-র চরণ আমরা ধুইব। এস বান্ধবীগণ, আমরা পবিত্র জল আনি। তুমি রাতকে দিন, দিনকে রাত করতে পার। বাবা, তুমি এসেছ এক বছর পরে। আমরা প্রণাম করি, নৃত্য করি।

বিবাহ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিতদের উদ্দেশে গান পরিবেশন করা হয়। বিবাহ-অনুষ্ঠানেও পরিবেশন করা হয় এই গান :

(৩) চং মান মায়া মা কাইখা বছি া।
মতাই রক নিরক ছি বরকনি ইচ্ছা।
বরক্নি লামা কতর লামা বন নিরকছি কাহাম থ্লাই নাই।
যত ভাখুক রক নিরক্ছি বরক্নি ইচ্ছা।
চং নিরক্নি আর নাই-অ বরক্নি কাহাম কুরুং॥

অনুবাদ : সক্ষমতা-অক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করে আয়োজন করতে হয়েছে এই অনুষ্ঠান। হে ভগবান, তুমিই আমাদের ইচ্ছা। তাদের পথ সুদীর্ঘ পথ, এই পথকে সুগম করার দায়িত্ব তোমার। মালিক তুমি। হে বন্ধুগণ, আপনারাও এসেছেন এ অনুষ্ঠানে, তাদের কুশল আপনাদেরই উপরে। আমরা তাদের (নববিবাহিতদের) কুশল প্রার্থনা করি।

'গরিয়া' পূজা আর 'জুম' চাষ ত্রিপুরীদের বহু গানের উৎস।
জুমের আগাছা পরিষ্কার করার সময় গাওয়া হয় এই গান :

(৪) লাগক্লা লাগক্ল' রিসাদি রিসাদি।
য়ালইমা রিসাদি রিসাদি রিসাদি।
য়াকবাইলি য়াকনি তাল কুরুং রক রিসাদি রিসাদি।

অনুবাদ : চলো চলো, কাজ করে চলো একসঙ্গে। গুণীর মত কথা বলে গান গেয়ে চলো। চলো চলো কাজ করে চলো। কাজ সেরে ফিরে চলো ঘরে॥

'জুম' চাষের সময় ত্রিপুরীরা আরো গান গায়। এই সব গানে জুমচাষের পুরো বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন এই গানটি—

(৫) অ জমিজং জমিজং ফাইবাইদি চিনি সং।
য়াক দমরা বাই মাই ফাইমানি।
সুরুং কোইলা নামি থাইদি।
চাং কাসেলেং খাইডি য়াক দামরা নাডি।
আমা বাই বাবু মাই কাইমামি।
সুরং লাই নামি ফাইডি।

অনুবাদ : হে বন্ধু, সবাই এস, হাতের 'টাক্কান' (একরকম দাও) দিয়ে ধান রোপণ করার পদ্ধতি শিখে নেব। কোমর থাড়া বেধে নাও। হাতে 'টাক্কান' নাও। পিতা-মাতারা যে ধান রোপণ করে তা আমরা শিখে নেবো, এস সবাই।

'গরিয়া' পূজার গানেরও বৈচিত্র্য কম নয়। তিন লাইনের একটি গান নৃত্য সহযোগে পরিবেশিত হয়। প্রতিটি লাইন তিনবার করে গাওয়া হয়।—

(৬) গরিয়ানি সিঙ্গারো আমা মালিমা
গরিয়া রাজা দেশ বেড়াই ও চানা চাবায়া
নং বু নং বায়া।

অনুবাদ : হে গরিয়া-দেবতা, তুমি আমানের পূজা নাও আমাদের দেশে পদার্পণ করো। আমাদের অর্ঘ্য নাও। আমাদের দয়া করো।

'গরিয়া' পূজার মতই অপর প্রধান পূজা 'কের' পূজা। ত্রিপুরীরা নানা দেবতার পূজা করে। যেমন, রঙ্গক পূজা, মাইলুথা ও খুলুথা-পূজা, বারুয়া-পূজা, নকছু-মতাই-পূজা, বেতিকারু ও বাদিয়া পূজা। মা-মিতা পূজা, মতাই বাতর পূজা, যমুনাই রগ, বলিরগ, নকড়ি, ষং, সঙ্গা-পূজা। সর্বোপরি কের পূজা ও গরিয়া পূজা। কেবল ত্রিপুরীরা নয়, চাকমা, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া উপজাতিরাও গরিয়া-পূজা ও কের-পূজা করে।

এখানে ত্রিপুরীদের জুম-চাষের (নৃত্য সহযোগে) গানও গরিয়া-পূজার (নৃত্য সহযোগে) গানের আরো কিছু নমুনা দিই।

নববর্ষদিবসে গরিয়া-পূজার সূচনা হয়। চলে সাতদিন। ত্রিপুরার সব জাত ও ধর্মের নরনারী এতে যোগ দেয়। ত্রিপুরীদের গরিয়া-গানের আর-এক উদাহরণ :

(৭) গরিয়া নি সিঙ্গারো আমা মাইলো মা আমা খ্লুমা
গরিয়া রাঙ্গা দেশ বেরাইয়ু চাও চাবাইয়া
মুংব নং বাইয়া মুংব মুংবাইয়া
হো গরিয়ানি......

অনুবাদ : গরিয়া পূজার প্রধান হলেন মাতা মাইলুমা আর মা খুলুমা। গরিয়া রাজা দেশ ঘুরে ঘুরে খান। খেয়ে শেষ করতে পারেন না। তুমি (মদ) পান করে শেষ করতে পার না।

ত্রিপুরীদের জুম-চাষের সঙ্গে জড়িত ভূমি-বন্দনা ও ঋতু-বন্দনা, যৌবন-বন্দনা ও জননী-বন্দনা। তেমন গান হল :

(৮) ফাই দিবা ফাই দিবা হৈ
টিপরাহা চুং আবাই খা-হৈ
টিপরাহা চুং আবাই খা-হৈ
হৈ-হৈ পিনহা পিনহা
ফাই দিবা ফাই দিবা হৈ।

অনুবাদ : এসো এসো এসো গো। ত্রিপুরার মাটিতে আমরা জন্মেছি। ত্রিপুরার মাটিতে আমরা জন্মেছি। এ যে আমাদের দেশ, আমাদের দেশ। এসো, গান গাইবে। এসো, নাচবে এসো।

(৯) কুকুই ফাইদিবা মুনাই ফাইদিবা
অ ফাইদিবা ফাইদিবা ফাইদিবা।
মাইবর নানি ফাইদি ফাইদি
তন ফাইদিবা ফাইদিবা ফাইদিবা।
হ কি তুবাদি বেনা তুবাদি মাইবার নানি।

মাই মুন খা রামানি ফাইদিবা
আং খুব হামজাখা মাইছেলে হাম খা।
অ আজ খাং বাইদিদো হোক হগলাইনানি যাদু হগলাইনানি।
আংদি তাং বাইদি দাতি ছিম বাইদি
ছময় উংখা ছাল আংখা হিম্মদি নগ খাংনাই
অ তাখুক রগ অ বুথুক রগ চুং তাকুক চুয়াক মুংছি নাই।
চুয়াক মুংগই খাইদি হিমুয়ু।

অনুবাদ : ওগো ছোটবোন ওগো ছোটভাই তোমরা এসো। তোমরা এসো, তোমরা এসো, তোমরা এসো। ধান রোপন করবে এসো। আগুন আন, খড় পাকিয়ে আন। ধান রোপন করবে এসো। ধান পেকেছে কাটবে এসো। ওগো প্রিয় তোমরা জুম পরিষ্কার করতে যাও। তাড়াতাড়ি যাও। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যাও। তাড়াতাড়ি যাও জুম পরিষ্কার করবে। দিবা গড়িয়ে গেছে। বাড়িতে ফেরার সময় হয়েছে। ওগো দাদা দিদিরা আমরা এখন মদ পান করব। হ্যাঁ, মদ পান করব। তাড়াতাড়ি চল।

(১০) অ দনিদং দানদং ফাই বাইদি চিনি সং
ইয়াকনি দামড়া বাই মাই কাইনালি
হিমবাইদি চিনি সং ফাইবাইদি চিনি সং
চাং অ কাচলেং খাদি ইয়াকং দামড়ানাদি
আশাবাই বাবু মাই কামানো সুরুং সৌনানি খাইছি দা
রবক কুবুক দামড়া বাখা বাবুবাই মিঞ্চি জাখা
বাবু খিবিখা আম-ব তুইখা দামড়া কুমুং অংখা
জন মাই-কাইনা চুখা হগ চুংসে দামড়া বাই
আং শো চেকরা বুমং অংখা।
মাইতাং কুতুংসে আ-তকা বাখা
কুমুনসে ব সং লে বুলাক্ জাক্খা।

অনুবাদ : ওগো আমার প্রিয়গণ, ওগো আমরা লোকেরা, হাতের পুরানো দা দিয়ে ধান রোপন করতে এসো। চলো, আসো ওগো আমার প্রিয়জন। কোমরে লাংগা বাঁধো, হাতে নাও পুরানো দা। মা বাবা যা ভুলে গিয়েছেন তা আমরা শিখব। নতুন ধারালো দা-টাই পুরানো দা হয়েছে, যা বাবা ফেলে দিয়েছেন। বাবার ফেলে দেওয়া দা-টাই যা বয়ে এনেছেন। জুমে ধান লাগানোর সময় হয়েছে। আমরা পুরনো দা নিয়ে জুমে গেলাম সত্যি। কিন্তু যে না পেল কাঁচি। পাকা ধানের ছড়া কাগে খেল। কিন্তু মার খেয়ে মরল ভালুক।

(১১) ও রাং চাক ও রাং চাক ও রাং চাক।
ও রাংচাক কতাল কতাল ওয়াদু কাখরাং কাখরাং।
মাইদিবা কতাল লাগিছং।
বিহি কতাল ফাইলাহা বারি খুমতৈয়া বারলাছা।
মছাল কবাক লাইনা।
ফাইদিবা কতাল লাগিছং
কতালদে ফাইনানি কচামলে খাংনানি।
চিরছি তিনি তং মুং যাছু।
কাইদিবা কতাল লাগিছং॥

অনুবাদ : ওগো প্রিয়তম, ওগো প্রিয়তম, ওগো প্রিয়তম, ওগো নবীনপ্রিয় ওগো বনানীপ্রিয়, ওগো নবীন সহচর সহচরী তোমরা এসো। নতুন বছর এসেছে, বাগানে জুঁই চাঁপা ফুটেছে। ওগো নবীন সাথীগণ, এসো আমরা তাকে বরণ করি। পুরাতন যাবে, নতুন আসবে। এতো চিরদিনের রীতি। ওগো নবীন সাথীরা তোমরা এসো।

(১২) ও ফিরগ যাইকা তংথকুমানি
আং তংথকমানি শরৎ নি দিন।
যাইদি ফাইবাইডি হক নাহারদি
আইবুকনি আইতর মা কামানি।
ও ফিরগ যাইকা·········শরৎ নি দিন।
তলেবাই সালল তংথক শরৎ নি
হামজাগ জত বরক ফুনিয়ানি।
ও ফিরগ যাইকা··· ··· ··শরৎ নি দিন।
চুমুই উরিয়া নথাপি লালা।
বাহাই মান অ হেংরা বুবার খুমলি।
ও ফিরগ যাইকা····· ···শরৎ নি দিন॥

অনুবাদ : ফিরে এসেছে আমার সাধের শরৎকাল, ওগো তোমরা সবাই চেয়ে দেখ—ওই যে শুকতারা উঠেছে। আমার সাধের শরৎকাল ফিরে এসেছে। শরতের সূর্যচন্দ্রকে সবাই ভালবাসে। শরতের চাঁদের আলোতে মেঘ ভেসে যাচ্ছে। শিউলির গন্ধ ভেসে আসছে। ফিরে এসেছে আমার সাধের শরৎকাল॥

॥ **তিন** ॥

রিয়াং লোকগীতি

রিয়াং উপজাতি বার্মার শান্ রাজ্য থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে সম্ভবত খ্রীস্টাব্দ চতুর্দশ শতকে ত্রিপুরায় আসে রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালে। জাতি হিসাবে রিয়াংদের সংগোত্রীয়-কুকী ও কুকী বংশোদ্ভূত বলা হয়। ত্রিপুরীদের প্রভাবে তাদের ভাষা (মূলতঃ অস্ট্রো-এশীয়) টিপ্রা ভাষার কাছাকাছি এসে যায়। রিয়াংরা 'মেছকা' ও 'মারছাই' নামে দুটি শাখায় বিভক্ত। তাদের সম্প্রদায়ের প্রধানের উপাধি হল 'রায়'। যাবতীয় কলহ-বিবাদে 'রায়ে'র বিচার চূড়ান্ত। 'রায়ে'র নিজস্ব অনুচরবৃন্দের মধ্যে থাকে একজন পুরোহিত, একজন করণিক, একজন ঢেরাবাদক। তাছাড়া থাকে ছত্রধারী, বংশীবাদক, ভাণ্ডারী। 'রায়ে'র প্রধানমন্ত্রীকে বলে 'রায় কথক'। রিয়াং রমণীদের প্রিয় অলঙ্কার রূপোর টাকার মালা। তারা পুষ্পপ্রিয়।

রিয়াংদের খুব একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠা ত্রিপুরারাজ্যে ছিল না। প্রথমে পাল্কিবাহকরূপে তারা নিযুক্ত হত। পরে সেনাবিভাগে তাদের নিয়োগ করা হয়। রাজাদের আমলে কেউ কেউ সেনাপতি নিযুক্ত হন।

রিয়াংদের গানে বৈচিত্র্য কম নয়। জুম-চাষের গান, বিয়ের গান, গরিয়া পূজার গান তাদের মানসিক ঐশ্বর্যের পরিচায়ক। এবার তাদের গানের নমুনা দিই।

মানুষের আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হয়েছে একটি রিয়াং গীতে, যাতে প্রকাশ পেয়েছে রচয়িতার ভূয়োদর্শিতা।

(১৩) সিংবক য়াচুই করমমা।
বলে মাক্ষিয়া বাকা যাদে সঁলেমা
বসি মাক্ষিও মানদা দরিয়া কাতেমা
তকরে চক্র বসুকুইমা নায়াং তংমারা॥

অনুবাদ : সোনারূপোর মতো উজ্জ্বল জিনিষগুলিকে সবাই পেতে চায়, কিন্তু পায় না। ভুষাকালি-লিপ্ত কুৎসিত জিনিষগুলিকে সহজেই পাওয়া যায়, তবু মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা ভাল জিনিষের॥

নির্জন অরণ্যে গিয়ে জুমচাষের জন্যে জমিবাছাই করা হয় এবং তাতে পূজা দিয়ে গান গেয়ে দেবতাকে তুষ্ট করা হয় :

(১৪) অ বলং মতিাই নিনি আ-র কাইখা বথিা।
হাফার হাফুং পার অংঅই নিনি য়াকং অ ফাইখা।
নংছি আমা নংছি চিনি বাবা য়াচকৃথি চিনি বথিা।
আং নিনি আ-র তংগানি ফাইমা-ন
বথিা ফুরঅই বাচাকদি।
অ মতিাই ন-ন আং খুলুম্ অ॥

অনুবাদ : হে বনদেবতা, আপনার কাছে এসেছি আজ। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পৌঁচেছি আপনার চরণে। আপনিই পিতা, আপনিই মাতা, আমাদের হৃদয়ে গ্রহণ করুন। আমি এসেছি আপনার সঙ্গে থাকবার জন্যে। তাই, হে ভগবান, আপনার কোমল হৃদয়ে আমাদের গ্রহণ করুন॥

'জুম' চাষের কাজ করার সময় রিয়াংরা গায় :

(১৫) রুছাবদি চোরাইরগ ছেলে আলা তাওংদি।
আই চুক মালী বা পাইখা ফুং আইনি হারা হায় খ্লাইদি।
আই চুক মালী বা মুকুফুইমা দ-র-দ-র বাইয়া রগ।
কাহা মুগ্রেই তাং স্রাদি।
সাজালে দিপর কানাইখা রেপুঅ হাবা তুই ছাম তাইস্থক লাইনি
সাজানি খুস সাজা বাপাইখা
সাজা কা পাইখা বাগ্রা বেপুসাজা কারি নাই।
সারিখ খুস সারিগ বাপাইহা কাইমিনি আপাইখ ফিরগনা—
হাবা শনি কাগলাইনি নগনিলক্ষ্মী বাই মা লাইনি।
ওয়াল বো পানুতুই হা জলে পাইহা
সারিগ তাওকুংগ জানাই পাইহা।

অনুবাদ : আলসেমি করো না, ভোরের 'মালী' ফুল ফুটেছে। ভোর হতেই ভাল করে লাইন ঠিক রেখে কাজ করে যাও। 'মালী' ফুল চোখের সাদা অংশের মত সাদা। এবার কাজ আরম্ভ কর। ভাল করে কাজ কর। বেলা তো দুপুর হয়ে গেছে। তোমার লাইন কখন শেষ করবে। দুপুরের ফুল ফুটেছে। কখন 'জুমে'র মালিক আমাদের ভাত খাওয়াবে। বিকালের 'নন্দদুলাল' ফুল ফুটেছে। আমরা যে পথে এসেছি সে পথেই ফিরব। বিরক্তিকর 'জুম' পরিত্যাগ করে যাব আর ঘরে গিয়ে গৃহলক্ষ্মীর সঙ্গে মিলিত হব।

বাঁশের পাতায় বিন্দু বিন্দু শিশির জমেছে, তত্তিফুংগ পাখি তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে॥

রিয়াং উপজাতি জুম চাষের সময় ভূমিলক্ষ্মীর পূজা করে গান গায় :

(১৬) শ্রীব পঞ্চনি তকছাব পঞ্চনি
শ্রীব মুংথামি শ্রীব মুংলাইমি
য়াকলি দাকৃতা বাই চাংশিব রিকথাবাই
ওয়ানার চিম্‌পাই বাই থুইবা নি লাম্বাক বাই
ছুইয়ানি মজবাই আমা লক্‌থী বাই
রংবলি রংতমা বাই
হারুং মাই থাইব থাইরিমা নাইমা।
দান্‌দা বথুল পেরইয়া পেরিমা নাইমা
বুরুই হামিয়াব হারিমা নাইমা
চেলা হামিয়াব হারিমা নাইমা।
আমা লক্‌থী মুংছে।
জরা মচাং নাইমা মাপাব মোচাং নাইমা।
আমা লক্‌থী মুংছে।
কাইব মোবাং নাইমা চমাব মবা নাইমা
আমা লক্‌থী মুংছে।
মুংছে থক্‌বা আচুক তন ফাইনাই মা
ফেরাই কংবা জোত নাইমা মুংছে
বুই মুখুর তা থাংছি
আমা লক্‌থী মুংছে॥

অনুবাদ : শ্রীপঞ্চমীর দিন যেমন শুভদায়ক, খঞ্জনি পাখি যেমন সুন্দর, খনার বচন ইত্যাদি শ্লোকমালা যেমন মানুষের মঙ্গলদায়ক। তুমিও তেমনি আমার মঙ্গল কর। হাতের নতুন দা দিয়ে, কোমরের নতুন কাপড় দিয়ে, মৃদঙ্গ বাঁশের খাড়া দিয়ে, ওঁদালের ছাল দিয়ে দুঃখের অবসান হবে, সুখ আসবে। রংবলি রংতমা-র (জ্ঞান ঐশ্বর্যের) দেবী, তুমি এসো। নিচু বা শুকনো খারাপ জমিতেও তোমার দয়াতে ভাল ফসল হয়ে থাকে। তোমার ক্ষমতা অসীম। খারাপ তুলা বা যেসব তুলা ভালভাবে ফোটে না তা তোমার দয়ায় ভাল হতে পারে। দুশ্চরিত্র পুরুষ বা দুশ্চরিত্রা নারীও তোমার দয়ায় ভাল হয়ে যায়। হাতের অলংকাররূপে তুমি, মানবদেহে সুন্দরের আধার কণ্ঠের অলংকার এবং গায়ের আভরণরূপেও তুমি সৌন্দর্যের আধার। তোমার দয়াতে এগুলি সুন্দর দেখায়। তুমি আমার মাথা—ঘরে বা গাইরীং এ অনুষ্ঠান কর। আমি গরীব। আমার ঘরের ছাউনি ভাঙা থাকলে তুমি নিজ কৃপায় তা মেরামত করে থাকো। তুমি অপরের ঘরে যেও না। অপরের ক্ষেতে না গিয়ে আমার ঘরে অচলা হয়ে বিরাজ করো॥

জ্যৈষ্ঠমাসের শেষে ঘন বর্ষণে জুম-ক্ষেত যখন লতাপাতায় আগাছায় ভরে ওঠে তখন জুম-চাষীরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাঁশি ঢোল সহযোগে গান গায়। জুম নিড়ানোর একঘেয়েমিকে আনন্দে ভরে তোলে। গানে প্রকাশ পায় চাষ করার আনন্দ :

(১৭) রুদাবদি চেরাইরগ।
ছেলে আলা তাওংদি
আইচুক মালী বা পাইথা
ফুং থাইলি হারা হায় থ্‌লাইদি

আইচুক মালীবা মুকফুইমা
দ—র—দ—র বাইয়ারগ।
কাছামগ্নেই তাং প্রাদি।
সাজাল দিপর কানাইখা
রে পুতন হাবা তুই ছাম তাই সুক লাইনি
সাজানি খুস সাজা বাপাইগ।
সাজা কা পাইখা
বা গ্রা বেপু সাজা কারি নাই
সারিখ খুস সারিখা বাপাইহা
ফাইমিনি য়াপাইখ ফেরগনা
হাবা সানি ফাগ লাইনি
নগান মেকথী বাই মা লাইনি
ওয়াল বো পানতুই হা জলে পাইখা
বারিগ তাতকুংগ মালাই পাইআ॥

অনুবাদ : আলসেমি করো না। ভোরের 'মালী' ফুল ফুটেছে। ভোর হতেই ভাল করে কাজ করে যাও। ভোরের 'মালী'-ফুল চোখের ডিমের মত সাদা। এবার কাজ আরম্ভ কর। ভাল করে কাজ কর। বেলা তো দুপুর হয়ে গেছে। তোমার কাজের লাইন কখন শেষ হবে। দুপুরে ফোটা ফুল ফুটেছে। বেলা ঠিক দুপুর হয়েছে। কখন 'জুমে'র মালিক আমাদের ভাত খাওয়াবে। বিকালের 'নন্দদুলাল' ফুল ফুটেছে। আমরা যে পথে এসেছি সে পথেই ফিরব। বিরক্তিকর জুম ছেড়ে যাব। ঘরে গিয়ে গৃহলক্ষ্মীর সঙ্গে মিলিত হব। বাঁশের পাতায় বিন্দু বিন্দু শিশির জমেছে। 'তাতকুংগ' পাখি তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে॥

আউস ধান পাকার পর রিয়াং চাষীরা পাড়া-পড়শীদের নিয়ে ধান কাটতে যায়। প্রথমবার ধান কাটাকে বলে 'বেতিকপরা' আর দ্বিতীয়বার ধান কাটাকে বলে 'বাদিয়া'। এই ধান কাটার সময় রিয়াং যুবক-যুবতী সরস মধুর গানের লড়াইয়ে নিস্তব্ধ বনভূমি মুখর করে তোলে। বলা যেতে পারে, এই গানের মাধ্যমেই যুবক-যুবতীর মনের আদান-প্রদান হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যতের সুখময় দাম্পত্য জীবনের স্বপ্নময় পটভূমি রচিত হয়। রিয়াং ভাষায় 'চেলা' শব্দের অর্থ যুবক আর 'বুরুই' শব্দের অর্থ যুবতী।

ধানকাটার সময় 'চেলা' ও 'বুরুই' এর গানের লড়াই :

(১৮) চেলা—আছঅই মোকন্দা তুই ইয়ং য়্যাকা তুইমা।
কাছলাই সুং বাইমা হিমথ্লাই
থুইঅই খাছকু আংখামুন।
বুরুই—তাতাসই সকবুই ককন সাথ্লাই
কাটিনি আথুকদে কছকতা থংসিদি।
চেলা—তসবাই ভাতা সুংলে রংকাইনি গোদাঅব
আওঅংয়ে ইয়াকুং বামছি ওয়াই মাইয়া দে।
বুরুই—টুই মানি বাকুয়া সুংলে
এক বাং নি আলা আং অ য়াই
আইচুক ছিম বাই ছিবকছা ছিনাইয়া দে।
চেলা—সে কামাই ছিমি মুই খুংকুংসাংঅ

তকৃথুহাদে রে কালাইন
ওয়া খইয়া নাদুং বাই
খুস্‌বইয়া আমুংবাই।
কাইয়ে বা রেছমই চালাই নাদি॥

অনুবাদ : যুবক—মগদামের পাতা ছাড়ালে তা যেমন সুন্দর দেখা যায়, তুমিও তেমন সুন্দর। তোমার সঙ্গে মিশে হেঁটে ঘুরে আমি মরলেও শান্তি পাব।

যুবতী—হে ভাই, তুমি আমাকে সত্য করে বল যে, তুমি যদি আমাকে ভালবাস তবে ঘাটের চিংড়ি মাছের মত পিছন দিকে যেও না।

যুবক—তুমি কচি পাতা গাছের মত। আমার কোদাল যদি নতুন হত তবে আমি শিকড় সমেত তা তুলতে পারতাম না কি?

যুবতী—তুমি যদি বর্ষার দিনের কুড়াল পাখি হতে আর আমি যদি ঘরের পাশের মোরগ হতাম তাহলে দুজনে ভোরে সুরে সুর মিলিয়ে ডাকতে পারতাম না কি?

যুবক—গাছে-বসা কুকি পাখি, শিকারীর দ্বারা বিদ্ধ হলে যেমন সুন্দর দেখায়, নিশিরাতে পেঁচার সুর যেমন মানানসই, কানের দুলের সঙ্গে ফুল পরলে যেমন সুন্দর দেখায়, 'জুমে'র লাল ফুল যেমন কানের দুলের সঙ্গে মামানসই, তেমনি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হলে তেমনি মানানসই হবে॥

তারপর চেলা (যুবক) ও বুরুই (যুবতী) একসঙ্গে গান গেয়ে পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

চেলা বাই বুরুই—তাবুক সালাইম দে বাক্ অংঘে
বারভীত হয় তংগানু বার গঙ্গা তুই তুংগাক্
তাবুক সামাছে বাক্ অংইয়া ঘে
বার গঙ্গা ফ তুই রাইয়ানু
বার তীত ফ হর থুইয়ানু॥

চেলা ওয়াইছা } তক্রই শিকার থংলাই ন ফন।
বুরুই ওয়াইছা } ন খা তা গরি তা অংগ্রাপুন॥

অনুবাদ : যুবক ও যুবতী (একসঙ্গে)—আমরা এখন যা-যা বলাবলি করেছি, তা যদি মিথ্যা হয়, তবে বারোতীর্থের অগ্নি নিভে যাবে আর জল শুকিয়ে যাবে। আর যদি সত্যি হয় তবে অগ্নি আর জল থাকবে।

যুবক (একবার) ও যুবতী (একবার)—চাঁদ যখন মধ্য গগনে ডুবে যাবে তখন মখুরা পাখি শিকারে যাবে [এখানে ৫মী, ষষ্ঠী, ৭মী তিথির মধ্যরাতের ইঙ্গিত করা হচ্ছে, তখন প্রণয়িযুগল পালাবে।]॥

তারপর রিয়াং-প্রণয়িযুগল দুএকদিন কোথাও লুকিয়ে থাকে। তারপর বাইরে চলে আসে। তখন রিয়াংসমাজ তাদের মিলনকে সামাজিক স্বীকৃতি দেয়, তাদের বিয়ে হয়।

রিয়াং বিবাহানুষ্ঠানে অনেক গান গাওয়া হয়। তেমনি একটি গানের কথা (ধ্রুবপদ)—বঙ্গানুবাদে—'ঘটির জল আনিস না। গরিরা রাজা বইতে চায়।'

বিয়ের দিন বরযাত্রীরা বরকে নিয়ে নানারকম বাজনা বাজিয়ে কনের বাড়ির দিকে যাত্রা করে। যখন কনের বাড়ির কাছাকাছি আসে তখন বরযাত্রীরা সমস্বরে গান গাইতে

থাকে। সে গান শুনে কনের বাড়ির লোকেরা কনেকে লুকিয়ে রাখে। বরযাত্রীদের সেই গান :

(১৯) দখিন কুলিয়া সন্ন্যাসী ফাইস
রাশি গুণলি ফাইস।
নিনিছে রাশি হামিয়া
আনি দে হামিয়া, রাশি গুণলি ফাইস।
রাশি গুণলি ফাইমালে
তকলিং তক্ছাখে দেখে ফাইফন
চানাই বাই চানাই
সাইলাই থুইতন চাইয়া বা
দখিন থাই থাং থকদি
থারই থাং মা দ চান॥

অনুবাদ : দক্ষিণের সন্ন্যাসী এসেছি॥ তোমার রাশি না আমার রাশি খারাপ, তা গণনা করতে এসেছি। রাশি যদি খারাপ হয় তবে রাত-পাখি যেমন মোরগ-ছানা ছোঁ মেরে নিয়ে যায় তেমনি করে নিয়ে যাব। ভাল গৃহস্থের সঙ্গে ভাল গৃহস্থই মিলে থাকে। গরীবের পক্ষে পলায়ন কর॥

বিয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে বর ও বরযাত্রীদের কনের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘরে বিছানো একটা পাটির উপর রাখা হয় একটা নতুন বক্ষাবরণ (রিয়া) আর এক বোতল মদ। সেই ঘরে ওঝা মন্ত্র পাঠ করে। সেখানে বর ও কন্যাপক্ষের লোক উপস্থিত থাকে। মন্ত্রপাঠের পর বিবাহ সম্পন্ন হল বলে ধরে নেওয়া হয়। তখন বরপক্ষের লোকেরা আবার গান করে :

(২০) আইয়ালে ত নাইয়া তগলালে কছিথা।
থুমু চুলিনি চুলে তং মুথাই লাম্বাক নাই অং।
ব্রুম পর্বত ওয়ালে তংঅ ছিম্বক ওয়াছে নাইঅ রাই ছাই অই।
ব্রুম পর্বত রাইলে তং অ চাইছড় চুকছে নাইঅ রাই ছাই অই।
মাক্রাইমান মাথাবা ছাওনি ছাওদে মা তংসি অ
মহামাকে রং ছং ফাইফন
ছা-পলক কাথং আছে ফাইঅ
থুমুছচুং তকফন বথা তুই নাইছে ফাইছে॥

অনুবাদ : রাত ভোর না হয়ে থাকবে না, মোরগ ডেকেছে। বনে অনেক রকম গাছ থাকা সত্ত্বেও খাড়াতে লাম্বাক ছালেরই দরকার হয়। তেমনি সংসারে আরও অনেক মেয়ে থাকা সত্ত্বেও আমার ছেলের জন্য আপনার মেয়েকেই প্রয়োজন। বনে হরেক রকম বাঁশ আছে, কিন্তু 'ছিম্বক' (বিছানাপত্র রাখার মাচা) তৈরী করতে ছিম্বক বাঁশ দরকার। হে বন্ধু, বনে বহু প্রকার বেত আছে কিন্তু 'চাইছড়' (আলনা) তৈরি করতে ভাল বেতের প্রয়োজন। ছেলের মা বাবা মারা যেতে পারে, কাজেই তোমাদেরই (কন্যাপক্ষ) ছেলের মা-বাবার মতো হতে হবে। ছেলেকে বিয়ে করাতে বহু মেয়ে দেখেছি। কিন্তু আপনার মেয়ের মতো সুলক্ষণা মেয়ে আর দেখিনি। তাই আপনার মেয়ের সঙ্গেই আমার ছেলের বিয়ে দিতে এসেছি। বনের তুলা, ফুলের মধু যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি আপনার মেয়ের চরিত্রও ঠাণ্ডা ও নম্র। সে সবারই মনোরঞ্জন করতে পারবে॥

পূজার গান ত্রিপুরার সব উপজাতির মধ্যে প্রচলিত। তারা যে-সব দেবদেবীর পূজা করে তারা মূলত অনার্য (আর্য-পোষক পরিয়ে তাদের আনা হয়)। পূজা অনেকরকম। যেমন, রন্ধক পূজা। মাইলুমা ও খুলুমা পূজা। বাকৃয়া, নকছু-মতাই, বেতিবপরু ও বাদিয়া-পূজা। মামিতা, মতাই বাতর, যুমনাইরগ, বলিরগ, নাকড়ি, ষং-পূজা। গঙ্গাপূজা, কের-পূজা, গরিয়া-পূজা।

এসবের মধ্যে প্রধান পূজা—কের-পূজা ও গরিয়া-পূজা। সব উপজাতি এ দুই পূজা করে থাকে।

রিয়াং উপজাতিও গরিয়া-পূজা করে। গরিয়া-রূপী দেবতাকে রিয়াংরা কাঁধে নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করার সময় গান গায়। গরিয়া-দেবতাকে সাধারণত রাতে বাড়ি বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয় যখন পাড়া-পড়শী ঘুমায়। তখন যে গানে তাদের সজাগ করা হয় তার বঙ্গানুবাদ :

(২১) ঘটির জল আনিস না
গরিয়া-রাজা বইতে চায়।
দিন রাত চলিয়া যায়
জল-ঘটি আনিস না
গরিয়া-রাজা বইতে চায়।
না মানিলে চলতে চায়
আইস গো খেরেং বাই
ডিমা পাইলে গরিয়ায় দে
মোরগ পাইলে গরিয়া দে।
সোনারূপা ঘর ভইর‍্যা
ধানসুতা ঘর ভইর‍্যা
টাকা পয়সা বান্ধিয়া
গরিয়া রাজা আসন বাদে বইতে চায়
চকি বাদে বইতে চায়

তারপর গরিয়া-রাজাকে স্থাপন করা হলে সবাই মিলে নাচের সুরে গেয়ে ওঠে

দুয়ার মেল ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া নাচ।

বৃত্তাকারে সবাই দাঁড়িয়ে এই লাইনটি বারবার গায়। সকলেরই হাতে থাকে এক এক টুকরা কাপড়। সমস্বরে গায়—

হাতের কাপড় সমান কর।

নাচের ভঙ্গিতে হাতের কাপড়খানা কোমরে বাঁধার সময় গেয়ে ওঠে—আইয়া—আইয়া—আইস। শক্ত করে কোমরে কাপড় বাঁধার পর আরম্ভ হয় তালে তালে নাচ আর গান—

মা চাইয়া ফাই মাইয়া
মা মুংইয়া ফাই মাইয়া
গরিয়ানি ফাই মিছে
গরিয়াকি ছেং কারাক রগ।
হাত মুইয়া চা হামিয়া
গরিয়া বাইতং হামিয়া॥

তারপর গরিয়া-দলের সঙ্গে আনা একটি ডিম ভেঙে বাড়ির মালিককে দেওয়ার সময়

আগতেরা প্রশ্ন করে—'অ গরিয়া ছেং কারাকরগ' (তার ঘরে কি ?)। উত্তর—ধান দূর্বা। আবার প্রশ্ন : অ গরিয়া ছেং কারাকরগ। উত্তর—ঘটি। প্রশ্ন : সোনা রূপা ধান পাইছে নি ? উত্তর—পাইছে, পাইছে, পাইছে। তখন নাচ শেষ হয়, গৃহস্থের কাছ থেকে টাকা নিয়ে গরিয়া-দেবতাকে কাঁধে নিয়ে আগতেরা অন্য বাড়ি যায়।

। চার ।

চাকমা লোকগীতি

চাকমাদের আদিবাসস্থান নিয়ে মতভেদ আছে। কোনো অভিমতে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী। কোনও অভিমতে তাদের আদি বাসস্থান আরাকান। চাকমাদের সমাজ-বন্ধন সুদৃঢ়। সমগ্র চাকমা সম্প্রদায় কয়েকটি 'গোজা' বা শাখায় বিভক্ত। যেমন—মলিমা, তন্যা, ধামেই, বায়াং সা, কার্মে ইত্যাদি। প্রত্যেক 'গোজা' আবার একাধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত। যেমন—ধুর্যা, কুর্যা, ধাম্মানা ইত্যাদি। স্বদেশপ্রীতি, আত্মনির্ভরশীলতা, সরলতা ও অতিথিসেবা চাকমাদের সামাজিক আদর্শ। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের চেয়ে বেশি পরিশ্রমী। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে কৃষিকাজ করে। আহার করে একসঙ্গে। চাকমাদের সমাজে বারমাসী গান, পালা-গান, প্রণয়গীতি, বিয়ের গান, ঘুমপাড়ানী গান, ছেলেভুলানো ছড়া, গল্প, ধাঁধাঁ, প্রবাদ প্রচলিত। একসময়ে চাকমা 'গেংকুলী'রা (চারণ কবিরা) প্রাচীন ইতিকথামূলক পালা গান গাইত। পল্লীবালার প্রণয়ঘটিত কাহিনী বারমাসী গানের উৎস। এই বারমাসী 'কির্ব্যাবি', 'মেয়াবী', 'তান্যাবী' নামে অভিহিত।

চাকমা লোকগীতির মধ্যে প্রধান প্রণয়গীতি আর কর্মভিত্তিক গান (জুম চাষের গান)। অনেক সময় জুম চাষের গানের মধ্যেই প্রণয়-উপাদান ছড়ানো থাকে।

'জুম' ক্ষেতে চাষ করতে করতে বা ফসল পাহারা দিতে দিতে চাকমা যুবকেরা প্রণয়ভাব প্রকাশ করে। চাকমা ভাষায় 'গাভোর' শব্দের অর্থ যুবক আর 'গাভোরী' শব্দের অর্থ 'যুবতী'। যুবক-যুবতীর দ্বৈত প্রণয়গীতি (জুমচাষের সঙ্গে যুক্ত প্রণয়গীতি) উদ্ধার করি :

(২২) গাভোর—চিগণ ছড়া চিগণ চেই
খুগিত ডাঙ্গ নাগর চিগণ বেই
ছড়াছড়ি বিল হোবো
তুর হস্তর পান খিলি হিল হোবো।
গাভোরী—ইনজরার মতহত বই চান তাগে।
খাড়ি মোল দিয়ুম পান খাগে।
গাভোর—ধুন্দা বাজেই তৌছি
এটক মাগিলুম নউ দিলি।
গাভোরী—শিলার কাজারা কলে ধর
পরানে মাগিলে বলে ধর।
গাভোর—শিলার কাজারা দর গরে
বলে ধুজুম লাজ গরে।

গাভোরী—মেইল গরত খের ঝারি
ময় খিয়ুম বেরে থাজি।
গাভোর—বোলয়া নিগলিয়ে তিতি পেইক
থুয়ুক বাজেইম বয়নিছি রয়তু॥

অনুবাদ : যুবক—চিকনপানা ছড়া (ছোট খরস্রোতা নদী)
আর আগুন হল ফাঁদ
ও মেয়ে, তোমাকে পাবার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব।
মাছেরা কত খুশি
যদি জল থাকে ছড়ায়।
তার চেয়েও বেশী খুশি হব আমি
যদি তোমার নরম হাত থেকে পাই পান।

যুবতী—বারান্দা থেকে তুমি দেখতে পার চাঁদ
যখন আমি খুলব রিয়ার(বক্ষ-বন্ধনীর) বাঁধ
পানের স্বাদ দিতে তোমায়।

যুবক—আমি বাজাই বাঁশি যখনি তোমায় দেখি
তোমায় পাবার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব
তবু ভাল তুমি বাসো না আমাকে।

যুবতী—ফাঁদ পাতো কৌশলে
যদি তুমি এতই উদ্‌গ্রীব
তবে জোর করে ধরার মতো সাহসী হও।

যুবক—ফাঁদ পাতার মতো মনের জোর পাই না
আর বলে তোমাকে ধরতে লজ্জা পাই।

যুবতী—আমি থাকব গোশালে
বেড়ার পাশে বিচুলি তোলার ছলে।

যুবক—সূর্য অস্ত গেলে যখন ডাকবে বনের পাখি
আমি থাকবো বসে গাছের নিচে সেখানে॥

চাকমা প্রণয়গীতির বৈচিত্র্য কম নয়। চাকমা মেয়েরা সাংসারিক কাজকর্মে যেমন, প্রণয়চর্চাতেও তেমন অগ্রসর। তার পরিচায়ক দুটি গান :

(২৩) দালা পরিভাগ্‌না
খাড়ি দিবা খাব্‌না।
তব্‌ নেবাধ্যায়ে ময়
রতদিন গ্রারায়ার ভাব্‌না॥

অনুবাদ : বাগন ফল আমি প্রায়ই পাড়ি। খাড়িতে নৌকা যায় ঠেকে। আমার দিন-রাতের একই ভাবনা—কেমন করে আমার প্রিয়তমকে পাই॥

(২৪) তেঙা দে তেঙাধান কিনি
দাবি নাউ পারবাউ নাব দিনি।
হালিয়া কুনাত বাধা মেঘ
খেইয়া জুদাস্তে সারাস্তে এক॥

অনুবাদ : এক বা দু টাকার ধান আমি কিনি। হে প্রিয়, নাম ধরে তোমাকে ডাকতে পারি না। দেখ, পশ্চিমে ঢলেছে বিদায়ী সূর্য। আমাদের দেহ ভিন্ন হলেও আত্মা এক॥

জুম-চাষকে নিয়ে অসংখ্য চাকমা লোকগীতি রচিত হয়েছে। চাষের আনন্দ নানা-ভাবে ব্যক্ত। তেমনি একটি গান :

(২৫) হিল্লো মিলেবো জুমত কায়দে
হাল্লো পিদিট তাগন হাদত জুমত কায়দে
যাদে যাদে পদওন পিচ্ছো মিরি চায়
সূর্য ফুলুন দোস হেদত্ বুঝে তার জুড়োয়॥

অনুবাদ : পাহাড়ী মেয়ে 'জুমে' যাচ্ছে। পিঠে 'খাড়া' আর হাতে 'টাক্কান' নিয়ে জুমে যাচ্ছে। যেতে যেতে মাঝপথে পিছন ফিরে ফিরে চায়। ভোরের সূর্যের রক্তিম আভায় চোখ জুড়িয়ে যায়॥

॥ পাঁচ ॥

মণিপুরী লোকগীতি

ত্রিপুরী, রিয়াং, চাকমা উপজাতির পর সংখ্যা-গরিষ্ঠ উপজাতি জমাতিয়া ও মণিপুরী। শেষোক্তের লোকগীতি বিশেষ সমৃদ্ধ। এখানে সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যের পরিচায়ক কয়েকটি গান উপস্থিত করছি। প্রথমে দুটি প্রেমের গান :

(২৬) চাওরো শাং লো
হুমিৎনা কারিডৈ কা হো-রো
যবীনা হেল্লিডৈ হেল জোরো
ইপা মচুম্ তারো
ইপু মচুম্ তারো।
তিং তিং চাওরো।

শিশুর প্রতি মায়ের স্নেহমমতার ছবি ফুটে উঠেছে এই গানে। মা তার আদরের শিশুকে হাল্কাভাবে ধরে একটু একটু করে উপরের দিকে ছুঁড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিচ্ছে গানটির তালে তালে। আর শিশুটিও হাসছে।

(২৭) শাবী থংলেন লু বাওবা
মানুজ চন্দ্রা তৈথো লাও।
ঐ না বাউগে রাঙ বরা।
লাই মতোন কোকংবগী চীং দোন্দা
উ তোংঙা লেং কোৎ পুবদা
খোয় দোদা মুং শিং রৈদুনা
রাউ থরবা হক্‌চাংনি।

অনুবাদ : দুঃখ, কষ্ট, অভাব, অভিযোগ—এগুলিও যেন কোনো কোনো সময় জীবনে

চলার ছন্দকে ব্যাহত করে, দুর্বিষহ হয়ে ওঠে জীবন। কিন্তু তাই বলে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক গভীর প্রেম প্রীতি ভালবাসার দ্রব্য মলিন হবে কেন ?

(২৮) শাবী লাও লাও
চৎ শি লাও
কন্নকৃপা য়াম্মী
কঞ্চাউ বা য়াম্মী
মাঙদা থারো শও।

দুই যুবক যুবতী এক লক্ষ্যে এক পদক্ষেপে তাদের জীবনের পথে এগিয়ে যেতে চাইছে, কারও ঈর্ষা বা হিংসা যেন তাদের বিচ্ছেদের কারণ না হয়, পথের কাঁটা না হয়ে দাঁড়ায়। এর জন্যে একে অপরকে আহ্বান জানাচ্ছে সামনে এগিয়ে আসার জন্যে।

এরপর ভক্তিগীতি—প্রভুর প্রতি নিবেদন :

(২৯) ঙাই-বিথো ঙাই-বিথো ইবুঙো ঙহা কতংদি ঙাই বিথো।
ননাই পাঙগণ শল্লবিনা দলাই-থাংব ঙমজদরে
হা ইবুঙো লৈবাক্সী থাজ ওয়রিবা
করিগী মুংশী বিদবনো ঙাইবিথো ঙাইবিথো ইবুঙো।
শল্লবা ঐখোয়বু করম্না হিংহনা লৈ-হৌগণী
স্না লৈবাক যাদোক্তনা মকম কৈদবু লেংবিগে হায় বনো।
হা ইবুঙো লৈবাক্সীলন ওয়রিবা
করিগী মুংশী বিদবনো॥

হে আমাদের প্রভু, একটু অপেক্ষা করো, দয়া করে একটু অপেক্ষা করো। আমরা দুর্বল মানুষ, নানা দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারি না। হে আমাদের প্রভু, আমরা কেন তোমার দয়া সাহায্য থেকে বঞ্চিত হব। একটু অপেক্ষা করো, প্রভু, দয়া করে অপেক্ষা করো। আমরা দুর্বল মানুষ, বাঁচার পথ খুঁজে বেড়াই। দয়া করে আমাদের জানাও এই স্বর্ণভূমি ও আমাদেরকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাও। হে আমাদের প্রভু, আমাদের এই স্বর্ণভূমি অমূল্য রত্ন। তুমি আমাদের ছেড়ে কোথায় যাও। আমরা বুঝতে পারি না কেন আমরা তোমার স্নেহ সাহায্য থেকে বঞ্চিত হব॥

॥ ছয় ॥

জমাতিয়া-মরসম-লুসাই লোকগীতি

ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে লোকগীতির অভাব নেই। এখানে জমাতিয়া, মরসম, ও লুসাই উপজাতির একটি করে গান উদ্ধার করে প্রসঙ্গের ছেদ টানি।

জমাতিয়া উপজাতির সামাজিক অনুষ্ঠানে নৃত্যসহযোগে পরিবেশিত একটি গান :

(৩০) ফাইদিবাও ফাইদিও
অ বায়াবক অ মারেবক।
তিনি দিনঅ চং তং থ কথা।

কামি কচারনি মাধবী ঘুম
থাকঅই থাজোঅ কা লাই নাই
অ মাধবীবাই চংি মংিচাংমানি
ছামায়া বলংমছিাংথা মাধবীবাই বংব্রাই ॥

অনুবাদ : এসো গো, এসো, এসো। এসো বন্ধুগণ, এসো বান্ধবীগণ। তোমরা চলে এসো, আজকের দিনে আমরা আনন্দে উচ্ছল। গ্রামের মাঝখানে অবস্থিত মাধবী গাছের ফুল তুলে খোঁপায় দেব। তাই মাধবীতে আমাদের কেমন সৌন্দর্য বাড়ে, তা বলা যায় না। বন মাধবীফুল আর ভ্রমরে শোভিত। এসো বন্ধু, আমরা সবাই সেখানে যাই।

মরসম উপজাতির লোকগীতির নমুনা :

(৩১) হৈ-হৈ-হৈ-হৈ-হৈ ॥
নং মালে কৈসা মলং আর ঐ মুং
তুই-তা তাং স্নুম মৈ
অ থান প্যাইয়ই হৈ। হৈ-হৈ-হৈ ॥
মাবে কোল কনতা থাওকে বাবাতে
যানপ নপদো। হৈ-হৈ-হৈ ॥
নৌপন কোল-কনতা আর চা থং বাচাতে
যানপ নপদো। হৈ-হৈ-হৈ ॥
দে দে নতুম দৌ। থে তুমতে তুমলৌ নীম
যানপ নপদো। হৈ-হৈ-হৈ ॥
থেন দাইয়া বুরি যানপ মাং আইতি হৈ। হৈ-হৈ-হৈ ॥

অনুবাদ : ওগো আমার প্রাণসখা, আমাদের দুজনার মন যদি এক হয় তবে নদীটাকেও আমরা ডাঙ্গা করে তুলতে পারব। মাঠের ঐ সুন্দর রঙিন ফড়িংটা আমাকে আমার প্রাণসখার কথাই মনে করিয়ে দেয়। উজ্জল মানিকটির চেয়েও যে আমার প্রাণ-সখা উজ্জল। পোড়াবাঁশের অবশেষের চেয়েও সে সুন্দর। জুম-ক্ষেতের পাশের বন-মোরগের যে রঙ বৈচিত্র্য সৌন্দর্য, তার চেয়েও সখা আমার সুন্দর। সখার সঙ্গে আমার মিলন হলেও রান্নার কাজে লাগবার মতো অসম্ভব কাজও আমি সম্ভব করব ॥

লুসাই উপজাতির লোকগীতির একটা উদাহরণ দিয়ে প্রসঙ্গে ইতি ঘটাই :

(৩২) জৌতথলাং শং আতাজৌ লুইতে তুই-থিয়ং
আলুয়াং দেম্ খেম্।
সাভালে পাং পাররিন তুর আনপেয়া
আন-মুই হিয়াও হিয়াও জেল-আ।
জৌ তুই থিয়াংতে লুয়াং দেম দেমর।
তুই-পুই কন ভেল পাল-ইন
জৌ তুই মিয়াংতে লুয়াং দেথ দেমর।
থিরাং থিলম না থলা থাইন।
আলোলুয়াং ইন আলৌ দরজাও জেল-আ।
রি হের হের ইন আকাল জেল-আ।
আকাল না পিয়াং রামাল মস আথেলং বিন
আন-মুই হিয়াও হিয়াও জেল-আ ॥

অনুবাদ : আমাদের সুরম্য পাহাড়ের গা বেয়ে নেবে চলেছে সুন্দরী ঝর্ণা। নীল সমুদ্রে চলার পথে আশীর্বাদ করে যায় পাখি আর ফুলকে। ঝর্ণার শীতল জলের চলার ছন্দে ও আশীর্বাদে নিয়ন্ত্রিত ও পুষ্ট আমাদের জীবন। সূর্যের খরতাপ থেকে আমাদের রক্ষা করে বনস্পতির ছায়া। এসো, আমরা সবাই মিলে পবিত্র ও সুখী জীবন পথে এগিয়ে চলি।

ত্রিপুরার দর্পণে উত্তর-পূর্ব ভারতের লোকজীবন প্রতিফলিত। ত্রিপুরার উপ-জাতিদের লোকগীতিতে যে সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য তা সভ্যতাভিমানী ভারতীয়দের কাছে পরম বিস্ময়ের। অপরিচয়ের বিস্ময় ও কৌতূহলের প্রাচীর ডিঙিয়ে যেতে পারলেই আমরা ত্রিপুরার উপজাতি-লোকগীতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারব।

এই প্রবন্ধ রচনায় সরকারী কাগজপত্রের সাহায্য পেয়েছি। তা পরিমাণে সামান্য। বেশিরভাগ লোকগীতি বিভিন্ন উপজাতিভুক্ত নরনারীর কাছ থেকে সংগৃহীত। এই কাজে সাহায্য করেছেন আমার দুই ছাত্র—শ্রীব্রজগোপাল রায় ও শ্রীমতী রত্না ঘোষ। তাঁদের কাছে লেখক কৃতজ্ঞ। লেখকের ত্রিপুরাবাসকালে (১৯৭৯-৮১) গানগুলি সংগৃহীত। ১৯৮১-র জনগণনার ফলাফল লভ্য না হওয়ায় ১৯৭১-এর জনগণনার উপর নির্ভর করতে হয়েছে। তাতে মূল বক্তব্যের হানি হয়নি। উৎস : 'Tripura : A Portrait of population' (Census of India 1971)—A.K.Bhattacharya, Director of Census Operations, Tripura, Published by the Govt. of India (1975).

আলোচনা :

'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধুর পুথি এবং রামপ্রসাদ রায়ের কাল'

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৮৮ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধুর পুথি এবং রামপ্রসাদ রায়ের কাল' শীর্ষক আলোচনা পড়লাম। বিশ্বনাথবাবু কবি প্রচলিত শকাঙ্ক গ্রহণ না করে লোকব্যবহার থেকে শকাঙ্কের নতুন ব্যাখ্যা দিতে চান। নিজ মতের সমর্থনে বিশ্বনাথবাবু "প্রথিতযশা পুঁথিবিশারদ" ডঃ সুকুমার সেনের চণ্ডীমঙ্গল (সাহিত্য একাডেমি প্রকাশিত) আলোচনার একটি পাদটীকা উদ্ধৃত করেছেন। দুঃখের বিষয়, বিশ্বনাথবাবু ডঃ সেনের মূল বক্তব্য উদ্ধৃত করেননি এবং যেটুকু উদ্ধৃত করেছেন, তাও যথাযথ নয়। আমরা ডঃ সেনের মূল বক্তব্য উদ্ধৃত করছি : "মুকুন্দরামের সময়ে সাধারণ ও পণ্ডিতসমাজে শকাঙ্ক হিসাবে 'রস' ছয় (৬) বুঝাইত। বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্ত্রের 'অষ্ট নায়িকা' হইতে 'অষ্ট রস' উৎপন্ন। তাহা হইতে অষ্ট=৮ হইতে পারে, কিন্তু কোন **শিষ্ট প্রয়োগ নাই**। 'নব রস' ও 'নব রসিক'—আসলে নূতন রস, নূতন রসিক ছিল। পরে লোকব্যুৎপত্তিতে সংখ্যা অর্থ আসিয়া গিয়াছে। নয় অর্থেও রসের **শিষ্ট প্রয়োগ নাই**।" (নিম্নরেখ আমার)

ডঃ সুকুমার সেন স্বয়ং 'রামে'র অঙ্ক সর্বত্রই তিন (৩) ধরেছেন। যথা—

'শক লিখে রাম গুণ রস সুধাকর'—ঘনরামের ধর্মমঙ্গল
'শকে হৈল চন্দ্রকলা রাম করতলে'—রামেশ্বরের শিবায়ন
'ইন্দু রাম ঋতু বিধু'—রামজীবন বিদ্যাভূষণের সূর্য পাঁচালী ইত্যাদি।
(দ্রষ্টব্য : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, অপরার্ধ)

বিদ্যাপতির এক পড়ুয়া ছাত্র শ্রীরূপধর হলায়ুধ মিশ্রের ব্রাহ্মণসর্বস্ব পুথিত্রকলের শেষে পুষ্পিকা দিয়েছেন—"লসং ৩৪১ মুড়িয়ার গ্রামে.........পণ্ডিত শ্রীবিদ্যাপতি-মহাশয়েভ্য পঠতা ছাত্র শ্রীরূপধরেণ লিখিতমদঃ পুস্তকম। পক্ষে সিতেঽসৌ শশিবেদরামযুক্তে নবম্যাং নৃপলক্ষ্মণাব্দে।"—এখানেও 'রাম' এবং ৩ সংখ্যা একই সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। (বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী—সুকুমার সেন, ১৩৫৪ পৃ. ২২-২৩) কাজেই 'রামে'র অঙ্ক ১ ধরবার গরজ কোথায় ?

বিশ্বনাথবাবু 'যেন-তেন-প্রকারেণ' রামপ্রসাদকে নিছক আঠার শতকের কবি প্রতিপন্ন করতে চান। তেমনি 'যেন-তেন-প্রকারেণ' 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু'কে উনিশ শতকের কাব্য প্রতিপন্ন করা চলে। তিন বৎসরের মধ্যে কাব্যের তিনটি খণ্ড লেখা কি নিতান্তই অসম্ভব ? রচনাকাল যদি উনিশ শতকের সীমা স্পর্শই করে থাকে, তাতে কি কবি কিংবা গবেষকের মর্যাদা খুবই ক্ষুণ্ণ হয় ?

বিশ্বনাথবাবুর প্রবন্ধে সাহিত্য পরিষদের পুথির উল্লেখ না দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। এখন অনুল্লেখের যুক্তি দেখে আরো বিস্মিত হয়েছি। বিশ্বনাথবাবু লিখেছেন—[সাহিত্য পরিষদের] "সেই পুঁথি শুধু আদি খণ্ডের এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট পুঁথি, প্রায়শঃ ভুলে ভরা। একস্থলে লেখক যথাযথ পাদপূরণ করতে পারছেন না বলে নিজেই আশঙ্কাপ্রকাশ করেছেন।"—বিশ্বনাথবাবুর পুঁথি দেখবার সুযোগ আমাদের নেই। বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কবির জন্মভূমি বাঁকুড়া থেকে 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু-আদিলীলা'র একখানি সম্পূর্ণ পুঁথি সংগ্রহ করেন, সেটিই এখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পত্তি।

বিশ্বনাথবাবুর বিচারে তার উল্লেখযোগ্যতা নেই। তাই "রামপ্রসাদ রায়ের নবাবিষ্কৃত কাব্য" তিনি প্রবন্ধ লিখলেন। তাঁর অধুনা দৃষ্ট চারটি পুঁথির কোনটিতেই সমগ্র কাব্য পাওয়া যায় না। বলতে ভুলেছি—"রামপ্রসাদ রচিত বিশাল গ্রন্থ কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু পুঁথি সম্প্রতি আবিষ্কার করে তার উপর কাজ করেছেন শ্রীমান সুনীতকুমার রায়।" (পঞ্চানন মণ্ডল সঙ্কলিত পুঁথি পরিচয় চতুর্থ খণ্ড, ১৯৮০, ভূমিকা পৃ. ৮) সুনীতবাবুর (বা অন্য কারো) পুঁথিতে সমগ্র কাব্য পাওয়া গেলে তাঁরই (বা অন্য কারো) 'নবাবিষ্কারে'র দাবী কিন্তু আমাদের মানতে হবে! সাধারণতঃ পুঁথির শেষে পুঁথির লিপিকাররা লেখার ত্রুটি, বর্ণাশুদ্ধি, অক্ষর বা পদ পড়ে যাওয়ার জন্য পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন, এটা তাঁদের সততারই পরিচয়। (দ্রষ্টব্য) পুঁথির শেষ কথা—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সা. প. পত্রিকা ১৩৫৭, পৃ. ৭৬; পুঁথিপত্রের আঙিনায় সমাজের আলপনা—চিত্রা দেব ১৯৮১, পৃ. ১৯; বাঙ্গালা পুঁথির পুষ্পিকা—সুকুমার সেন বিচিত্র সাহিত্য ১ম খণ্ড, ১৯৫৬, পৃ. ২১৯ ইত্যাদি সাহিত্য পরিষৎ পুঁথির লিপিকার পুঁথির শেষে লিখেছেন—

"সুন সুন সর্ব্বজন করি নিবেদন। লিক্ষ [কের] দোস ভাই করিবে মার্জ্জন॥
দু'এক অক্ষর জদ্যপি পড়ি থাকে। জুড়িআ পড়িবে দোশ না দিবে লিক্ষকে॥"৮৭ পত্র

এতেই 'মহাভারত অশুদ্ধ' হয়ে গেল? পুঁথি নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা কেউ একথা জোরের সঙ্গে বলতে পারেন কি? বসন্তরঞ্জন আংশিক গ্রন্থ সংগ্রহ করেন, অনালোচিত সম্পূর্ণ গ্রন্থের উপর কাজ করেছি, একথা বললেই বিশ্বনাথবাবু সততার পরিচয় দিতেন। পূর্বস্বূরিদের প্রযত্নকে চাপা দিয়ে আত্মযশ প্রচার শোভনও নয়—সঙ্গতও নয়।

—অক্ষয়কুমার কয়াল।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৯০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে সম্বর্ধনা ও প্রতিভাষণ।

সভাপতি প্রেরিত বাণী

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্যবৃন্দ ও সমাগত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ। আজ পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। কয়েকজন প্রবীণ ও বিশিষ্ট সাহিত্য সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকে পরিষৎ সম্মান জ্ঞাপন করবেন পুরস্কার দিয়ে। আমার অনুপস্থিত থাকা মোটেই শোভন নয়।

কিন্তু শারীরিক অপটুতার উপর কথা নেই। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।

আমি সকলকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি।

ইতি—

শ্রীসুকুমার সেন

[১]

বিশেষ সম্মাননীয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃপক্ষ পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু—

সসম্মান বিনীত নিবেদন,

আকস্মিকভাবে আপনাদের ২৮শে আষাঢ়, ১৩৮৯ পত্রে জানিলাম্ শ্রদ্ধেয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে আগামী ৮ই শ্রাবণ ১৩৮৯ তারিখে শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্যিক স্বর্গীয় হরনাথ ঘোষ পদক প্রদানে সম্মানিত করা হইবে।

এই বিশেষ সম্মানের যোগ্যতা আমার আছে কিনা আমার জানা নেই বলা বাহুল্য। কিন্তু এই বিশেষ সম্মানে আমি যেমন সম্মানিত তেমনি ধন্য ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া এই স্বীকৃতির জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে আমার বিনীত অভিবাদন নমস্কার কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পুনরায় আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে জানাইতেছি। নিবেদন

ইতি—

বিনীতা

জ্যোতির্ময়ী দেবী

[২]

আমি সকলকে আমার আন্তরিক শুভকামনা, কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের মত শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান আমাকে আজ যে সম্মান প্রদর্শন করলেন আমি তার যোগ্য কিনা জানিনা। আমার তুচ্ছ রচনা যদি কারুর ভাল লেগে থাকে সেটাই আমার একমাত্র পুরস্কার।

আমি অন্তঃপুরিকা। আমার সাহিত্য রচনা অন্তঃপুরে বসেই করেছি। আমি স্কুল কলেজে পড়িনি। আমার শিক্ষা হয়েছে জীবনের কাছে। আমি যে-টুকু দেখেছি মাত্র সেইটুকু লিখবার চেষ্টা করেছি। অচেনা জগতে আমার পা বাড়াবার সাহস ছিল না।

বাল্যবিবাহের পরে উত্তরবঙ্গের এক বিশিষ্ট পরিবারে বধূ হয়ে গেলাম। দেশ-বিভাগের পরে সেই অবলুপ্ত পরিবেশ এপারে আমাকে স্মৃতির টানে আচ্ছন্ন করে

রেখেছিল। তাই শেষ বয়সে ভুলে-যাওয়া বাংলাদেশের পালপার্বন, ক্রিয়াকলাপ, রীতিনীতি আমি আমার 'রায়বাড়ী' উপন্যাসের দুইখণ্ডের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে ভবিষ্যতের জন্য দেবার চেষ্টা করেছি। তারা যেন ভুলে না যায়। এইটুকুই আমার বলবার কথা।

আমি আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ জানাচ্ছি।

গিরিবালা দেবী:

[৩]

প্রীতিভাজনেষু

আপনাদের আমন্ত্রণ পত্র পেয়ে অনুগৃহীত হলাম। আপনাদের সম্মেলনে আমার পক্ষে সশরীরে উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। আমার হয়ে শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের শ্রীহিমাংশু নিয়োগী আপনাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন এবং আমার কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন আপনাদের সকলকে। বলা বাহুল্য সাহিত্য-পরিষদ্ গৃহ আমার অপরিচিত নয়। পাঠ্যাবস্থায় অনেকবার সেখানে গিয়েছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ বাঙ্গালীমাত্রেরই সুহৃদ। তার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি—

নলিনীকান্ত গুপ্ত

[৪]

জাতীয় প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আজ তার শুভ নবতিতম প্রতিষ্ঠা দিবসে আমাকে আমার এই অন্তিম জীবনে যে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন, তা সাহিত্য ভারতীর পরম আশীর্বাদ রূপে গ্রহণ করে ধন্য বোধ করছি। আজ আট বৎসর আমি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত এবং গৃহবন্দী হয়ে শান্তি পারাবারের স্বপ্ন দেখছি। বেশি কিছু বলার ক্ষমতা আমার নেই, তা ছাড়া আমার সর্বাঙ্গ সাহিত্য জ্ঞানও খুবই সীমিত। বিনয় নয়, এটা মর্মান্তিক সত্য। একথা অবশ্য সত্য, এই ৮৩ বছর বয়সের ষাট্ বছর-ই নাট্য সাহিত্য নিয়ে চর্চা করে আসছি। আজ এই নাট্য সাহিত্য সম্পর্কেই দুচার কথা নিবেদন করছি। আমি বিশ্বাস করি সব নাটকই প্রচার, কিন্তু সব প্রচারই নাটক নয়। অন্যান্য দেশের কথা সঠিক না বলতে পারলেও আমাদের এদেশে, দেশ ও সমাজের প্রয়োজনেই নাটক তার সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছে। নাটকের এই ঐতিহ্যই গড়ে উঠেছে এ দেশে। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক অভিনীত হতেই এ দেশে নাটকের অন্তর্নিহিত শক্তি আবিষ্কৃত হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ নাট্যকারদের বহু নাটক আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল তা চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামে নয়, সমাজ সংস্কারেও আমাদের নাটক এগিয়ে এসেছে, সার্থকও হয়েছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রফুল্ল, বলিদান প্রভৃতি নাটক এ বিষয়ে সার্থক নিদর্শন। ধর্মানুশীলনে আমাদের পৌরাণিক নাটকগুলি এক অক্ষয় অবদান। স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষভাগে শোষিত ও নির্যাতিত কৃষক শ্রেণীর দুঃখ দুর্দশা নিয়ে রচিত ও ভারতীয় গণনাট্যসংঘ-প্রযোজিত বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' সমাজ সচেতন নাটকরূপে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধু তাই নয়, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর দুঃসহ জীবনচিত্র রূপে আধুনিক কালে বহু সার্থক নাটক দেশ ও জাতির মর্মস্পর্শ করছে। আমি

পূর্বেও বলেছি, আজও বলছি জাতি ও সমাজের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-স্বপ্ন যদি নাটক ও নাট্যশালায় প্রতিফলিত না হয়, তবে সে নাটক ও নাট্যশালা লক্ষ্যভ্রষ্ট ও নিরর্থক। আজকের সমাজ জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে আমরা পয়ত্রিশ বৎসর স্বাধীনতা ভোগ করলেও আবার এক দুর্ধর্ষ জাতীয় সংকটের সম্মুখীন। একদিকে আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্য অপর দিকে অপরিসীম ধনবৈষম্য। আমার আপনার কথা থাক্, দেশের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত, সদ্য অবসর প্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি শ্রী নীলম সঞ্জীব রেড্ডী আজ থেকে ঠিক ছয়মাস পূর্বে গত ২৪শে জানুয়ারী তাঁর বাঙ্গালোর ভাষণে যা বলেছেন তা শোনা যাক্। গত ২৫শে জানুয়ারীর আনন্দবাজার পত্রিকায় "কিছু একটা গলদ আছে" শিরোনামে যা প্রকাশিত হয়েছে তা উদ্ধৃত করছি। উদ্ধৃতি: "রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডী দেশে মাথাপিছু আয় কম হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন—কোথাও কিছু একটা গলদ রয়েছে।...রেড্ডী বলেন অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ অত্যন্ত কম। তার ওপর ৪৮ শতাংশেরও বেশি মানুষ বাস করেন দারিদ্র্য সীমার নিচে। কি ভাবে তাঁরা বেঁচে আছেন সেটা একটা রহস্য। ঈশ্বরই তা জানেন।" উদ্ধৃতি শেষ। ঈশ্বর জানেন ঠিকই, কিন্তু ঈশ্বর কোটি কোটি এই হতভাগ্য মানুষগুলির এই দুর্দশা থেকে পরিত্রাণও নিশ্চয়ই চান। এই দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি কাঠামোতে সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্নের ঝিলিকে। পয়ত্রিশ বৎসরের ফলশ্রুতি—ধনী হচ্ছে আরো ধনী, গরীব হচ্ছে আরো গরীব। রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডী গতকালই তাঁর বিদায়ী ভাষণে দেশবাসীকে বলেছেন [আজকের আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত] "গত কুড়ি বছরে আয় এবং সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য বেড়ে গিয়েছে। সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।" উদ্ধৃতি শেষ।

এই পাপচক্র থেকে আমারা উদ্ধার পেতে পারি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়। দেশের প্রত্যেকটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল সমাজতন্ত্রকেই জাতীয় লক্ষ্য রূপে ঘোষণাকরেছেন। সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হল মানুষ। সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। আর, মূল মন্ত্র হল Each to all and All to each যা আমাদের দেশেরই কবি বহু পূর্বেই রচনা করে দিয়ে গেছেন—সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। এই সহানুভূতি, এই সহমর্মিতা গড়ে তুলতে হবে দেশের প্রতিটি মানুষের মনে—সমাজতন্ত্রের এই মহা সাধনায় মেতে উঠতে হবে আমাদের নাট্যশিল্পকে।

আমাদের নাটক ও নাট্যশালা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামকে জয়যুক্ত হতে সাহায্য করেছে। সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামকেও জয়যুক্ত করতে পারবে এ আশা ও বিশ্বাস আমার আছে। আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি—আমার 'কারাগার' নাটক বৃটিশ শাসনে নিষিদ্ধ হওয়াতে নিজের জীবনেও উপলব্ধি করেছি—Pen is Mighter than Sword—অসির চেয়ে মসীর শক্তি অনেক বেশি।—আমরা পেরেছি—আমরা পারব।

নমস্কার—

মন্মথ রায়

উননবতিতম বর্ষের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির পত্র :

বন্ধুগণ

পরিষদের আজ বার্ষিক অধিবেশনের দিন। শারিরীক অপটুতার জন্যে আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারলামনা বলে দুঃখ অনুভব করছি।

অপটু আমাকে বিদায় দেওয়া আপনাদের আগেই উচিত ছিল। অনেক যোগ্য এবং যোগ্যতর ব্যক্তি উপস্থিত রয়েছেন।

এটা বুঝি যে আপনারা আমাকে স্নেহ করেন। আমি চেষ্টা করেছি আপনাদের স্নেহ ও আস্থার সম্মান রেখে চলতে।

পরিষৎ আপনাদের সকলের। আপনারা রাখলে থাকবে, না রাখলে থাকবে না।

আশা করি যে বর্ষ সামনে উপস্থিত সে বর্ষে পরিষদের কাজ ভাল ভাবেই চলবে। নমস্কার জানবেন। ইতি—

শ্রীসুকুমার সেন

উননবতিতম বর্ষের সম্পাদকীয় বিবরণ

(১লা বৈশাখ হইতে ৩১শে চৈত্র ১৩৮৮)

আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উননবতিতম বার্ষিক অধিবেশনে সমাগত সদস্যগণকে যথোচিত শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উননবতিতম বর্ষের কার্যবিবরণ সদস্যগণের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করিতেছি।

সভার সূচনায় আলোচ্য কালসীমার মধ্যে লোকান্তরিত সাহিত্য সেবী ও সংস্কৃতি-সাধকগণ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য), নির্মলেন্দু চৌধুরী, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, দেবকুমার চক্রবর্তী, বিশু মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য), হীরেন্দ্র-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, (কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য) বিনয়চন্দ্র সেন, রাধিকামোহন মৈত্র, মোতাহার হোসেন, (বাংলাদেশ) রাইচাঁদ বড়াল, মধুসূদন মজুমদার, (পরিষদের আজীবন সদস্য) বীরেন মুখোপাধ্যায় (কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য) অনাথবন্ধু দত্ত, ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, বিমল ঘোষ—ইঁহাদের উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

বিভিন্ন অধিবেশন—১৩৮৮

স্মারক বক্তৃতামালা :

ক) বৈষ্ণবাচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ স্মারক বক্তৃতা : ১২ই ও ১৩ই আষাঢ় ১৩৮৮ বৈষ্ণবাচার্য রাধা-গোবিন্দ নাথ স্মারক বক্তৃতা দেন শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী। তাঁহার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'বাংলার বৈষ্ণব কথা ও ব্রজসাহিত্য।' সভার উভয় দিনেই শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করেন।

খ) রামলাল হালদার ও হরিপ্রিয়া দেবী স্মারক বক্তৃতা : ২৬শে ও ২৭শে আষাঢ়, ১৩৮৮ শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রামলাল হালদার ও হরিপ্রিয়া দেবী স্মারক বক্তৃতা দেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বাংলার মন্দির গাত্রস্থ ভাস্কর্যে প্রতিফলিত সমাজ চিত্র।' সভার প্রথম দিনে শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরী ও দ্বিতীয় দিনে শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

গ) বনফুল স্মারক বক্তৃতা : ২২শে ও ২৩শে শ্রাবণ ১৩৮৮ বনফুল স্মারক বক্তৃতা দেন শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদার। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'বনফুলের ছোট গল্প।' সভার প্রথম দিনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য ও দ্বিতীয় দিনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

অন্যান্য স্মারক বক্তৃতা মালায় নির্বাচিত বক্তাগণ আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের অসুবিধাবশতঃ এই বৎসরের বক্তৃতাগুলি অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

স্মরণ সভা : ক) গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মরণ সভা :

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রয়াণে ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির যৌথ উদ্যোগে পরিষৎ মন্দিরে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সভায় সভাপতিত্ব করেন। শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু, (সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ) শ্রীকান্তিলাল চৌধুরী, শ্রীমৃণাল দাশগুপ্ত, শ্রীরতনলাল খান, শ্রীযুগলকান্তি রায়, শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস (পরিষদ সম্পাদক) প্রয়াত মণীষীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

খ) নীহাররঞ্জন রায় স্মরণ সভা :

বিশিষ্ট মনীষী, পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য নীহাররঞ্জন রায়ের প্রয়াণে ৩রা মাঘ, ১৩৮৮ পরিষৎ মন্দিরে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস প্রয়াত মনীষীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

চিত্র প্রতিষ্ঠা : ৩০ চৈত্র তারিখে পরিষৎ ভবনে সাহিত্যিক ও সাধক ৺নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ীর চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সভায় সভাপতিত্ব করেন। শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী, শ্রীনির্মলকান্তি বসু, শ্রীঅখিল নিয়োগী, শ্রীভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ-এর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিশেষ অধিবেশন : ১। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮ উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় 'বাংলা চৈতন্যচরিতসমূহের ঐতিহাসিকতা' প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

২। ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮ পরিষৎ মন্দিরে কথাশিল্পী মনোজ বসুর অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। পরিষৎ সভাপতি শ্রীসুকুমার সেন সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় কথা সাহিত্যিক শ্রীবসুকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শ্রীঅন্নদা-শঙ্কর রায়, শ্রীঅমলেন্দু বসু, শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমারেশ ঘোষ, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ,

শ্রীশচীন মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅবনী সিংহ ও শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস শ্রীবসুর সাহিত্য জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন।

শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য "দুজনে বলাকা পড়ি" কবিতা আবৃত্তি করেন।

প্রতিষ্ঠা দিবস : ৮ই শ্রাবণ, ১৩৮৮ অপরাহ্ণে ৮৮টি প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান সুরু হয়। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরী সভায় সভাপতিত্ব করেন। পরিষৎ সম্পাদক, শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এই পবিত্র দিনের স্মরণে বক্তৃতা করেন। শ্রীঅনুপরঞ্জন চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন। শ্রীতুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদকে একশত টাকা দান করেন। পরিষৎ কর্মিগণ রবীন্দ্রনাথ রচিত 'বশীকরণ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত।

বার্ষিক অধিবেশন : ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৮৮ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরী। পরিষৎ সদস্য শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার বৈধতার প্রশ্ন তুলিলে সভাপতি সেদিনের সভা মুলতুবী করিয়া দেন। অতঃপর ১৩ই ভাদ্র, ১৩৮৮ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমান বর্ষে কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন—১২ মাসিক অধিবেশন—৩
আয়-ব্যয় উপসমিতি—১০ পুস্তক প্রকাশ উপসমিতি—১ গ্রন্থাগার উপসমিতি—২
ন্যাসরক্ষক সমিতি—৩ পুঁথি সংরক্ষণ ও তালিকা প্রণয়ন উপসমিতি—২

বর্তমান বর্ষে পরিষদের উল্লেখযোগ্য কৃত্য : বর্তমান বর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য হইতে পরিষৎ গ্রন্থাগারের পুরাতন কাঠের আলমারিগুলির পরিবর্তে ষ্টীল র‍্যাকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গ্রন্থশালা, পুঁথিশালা ও চিত্রশালার নিরাপত্তার জন্য অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। অবিলম্বে দুইজন কর্মী এই বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করিতে যাইবেন। পরিষদের নিজস্ব একটি মাইক ও ইনভার্টার ক্রয় করা হইয়াছে। পুঁথি ও পুস্তকগুলির সুষ্ঠুভাবে রক্ষণের জন্য পাঁচটি 'ফিউমিগেশন চেম্বার' ক্রয় করা হইয়াছে। গ্রন্থাগারের জন্য 'কার্ড ক্যাবিনেট' ও চিত্রশালার জন্য 'শো কেশ' করা হইয়াছে। ত্রিবান্দ্রমে অনুষ্ঠিত ১৫শ সারা ভারত মিউজিয়াম ক্যাম্পে ১০ দিনের সেমিনারে পরিষৎ কর্মী শ্রীপ্রশান্তকিশোর রায় যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। বর্তমান বর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে 'ন্যায়পরিচয়' এবং আরতি মল্লিক অনুদানের অর্থে তিনখানা সাহিত্য সাধক চরিতমালা—বিপিনচন্দ্র পাল, প্রমথ চৌধুরী, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া স্বপ্ন, পালামৌ ও সাহিত্য সাধক চরিতমালার ১২, ১৩, ১৮, ৬১, ৬৩, ৬৬, ৬৭, ৭৩ সংখ্যক গ্রন্থগুলি এবং শকুন্তলা ও বৌদ্ধগান ও দোঁহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া নূতন সাহিত্য সাধক চরিত—যদুনাথ সরকার, ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী ও সরলাবালা দেবী, বাংলার (মধ্যযুগে) হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, নিবেদিতার 'Some notes of wanderings with the Swami Vivekananda'. গ্রন্থগুলির মুদ্রণ কার্য চলিতেছে। পরিষৎ পত্রিকার তিনটি সংখ্যা এই বৎসর প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। শেষ সংখ্যাটি যন্ত্রস্থ। বর্তমান বর্ষে ন্যাশনাল মিউজিয়ামের প্রাক্তন ডিরেক্টার শ্রীনীলরতন ব্যানার্জী, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক জে. এল. বার্কিংটন, জাপানের কেইকো আজমা, ভদ্রক কলেজের ওড়িয়া

বিভাগের প্রধান গঙ্গাধর বল, ডঃ কপিলা বাৎস্যায়ণ ও শ্রী এন. ডি. গুপ্ত পরিষৎ গ্রন্থাগার পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। পরিষৎ মন্দিরের গৃহ সংস্কারের কাজ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। পরিষদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কর্মচারী-বেতনখাতে ও অন্যান্য ব্যয় প্রায় তিনগুণ বাড়িয়া গিয়াছে অথচ পরিষদের আয় বৃদ্ধি ঘটে নাই। পরিষৎ সদস্য ও বঙ্গদেশবাসীর নিকট আবেদন তাঁহারা এই বিষয়ে চিন্তা করিবেন ও যত্নবান হইবেন। পঃ বঃ সরকার ও ভারত সরকারের অধিকতর সহানুভূতি প্রাচীনতম সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে।

আর্থিক দুরবস্থার মধ্যেও পঃ বঃ সরকারের ন্যায় আমরাও কর্মিগণের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করিতেছি। যদিও আমরা জানি ইহা প্রয়োজনের তুলনায় অতীব নগণ্য। সকলের সহযোগিতায় পরিষদ্ তাহার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ইহা আশা করি।

১৩৮৮ বঙ্গাব্দে প্রাপ্ত সরকারী আর্থিক সাহায্য

কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত

১। গ্রন্থাগার উন্নয়ন খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান—৪০,০০০'০০

২। পুঁথি সংরক্ষণ খাতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত—১৮,০০০'০০

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত

১।	কর্মচারী নিয়োগ খাতে	৩০,৮৪৫.৬৫
২।	পত্রিকা প্রকাশ খাতে	৩,৮০০.০০
৩।	ঘাটতি বাজেট পূরণ খাতে	১১,০০০.০০

রামমোহন ফাউণ্ডেশান প্রদত্ত

১।	বই বাঁধাইবার জন্য	১০,০০০.০০

পরিশিষ্ট

গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিবরণ—১৩৮৮ বৈশাখ-চৈত্র

১। বর্তমান বৎসরে পরিষৎ খোলা ছিল ২৪১ দিন।

২। মোট পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়াছেন ১৭,৭১৫ জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৬৬ জন।

৩। লেনদেন বিভাগ :

(ক) মোট পাঠক-পাঠিকার উপস্থিতির সংখ্যা ৮,৩১১ অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৩০ জন।

(খ) পাঠকক্ষে মোট পাঠক-পাঠিকার উপস্থিতি ৯,৩০৪ অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৩৫ জন।

৪। পাঠকক্ষে ও লেনদেন বিভাগে সর্বাধিক উপস্থিতি ৪৬ জন, (৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮) ও ৫২ জন (২৬শে বৈশাখ, ১৩৮৮)।

বর্তমান বর্ষে (১৩৮৮) নূতন সদস্য—৩২৮, বিশিষ্ট সদস্য—১১, আজীবন সদস্য—নূতন ২, পুরাতন ৭০, সাধারণ সদস্য—১২০৭ মফঃস্বল সদস্য নূতন—৬।

পুস্তক আদান-প্রদান : ১৩৮৮

বিষয়ানুযায়ী

		লেনদেন	পাঠ কক্ষ	মোট
দর্শন	১০০	৬৫	১৫০	২১৫
ধর্ম	২০০	২২৩	৫৯৮	৮২১
সমাজ বিজ্ঞান	৩০০	৬১	১১৩	১৯৪
শিক্ষা	৩৭০	৪৯	১০৩	১৫২
ভাষা	৪০০	২৪১	২৫২	৪৯৩
বিজ্ঞান	৫০০	৮	৬২	৭০
ফলিত বিজ্ঞান	৬০০	৯	৪৭	৫৬
শিল্পকলা	৭০০	১৬	৫০	৬৬
সঙ্গীত	৭৮০	১৭৬	৩০৩	৪৭৯
সাহিত্য	৮০০	৮৪৬৯	৭৯৯৪	১৬৪৬৩
ভূগোল	৯১০	১১৯	২০১	৩২০
জীবনী	৯২০	৪৫২	৮৫৪	১৩০৬
ইতিহাস	৯৩০৯৯৯	১৪৬	৬৩৭	৭৮৩
সহায়ক গ্রন্থ	···	৫৯	৫৪৪	৬০৩
পত্র-পত্রিকা			৭৯০২	৭৯০২
		১০,০৯৩	১৯,৮৩০	২৯,৯২৩

শান্তিময় মিত্র ১৭-৪-৮৯ বাং

(গ্রন্থাগারিক)

৮৯তম বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণী

গত ১৬ই আশ্বিন, ১৩৮৮, ৩রা অক্টোবর ১৯৮২ রবিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮৯তম বর্ষের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সম্পাদক ১৩৮৮ বঙ্গাব্দের লিখিত কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সদস্যগণ তাহা অনুমোদন করেন এবং উক্ত লিখিত বার্ষিক কার্যবিবরণী অনুমোদিত হয়।

কোষাধ্যক্ষ ডঃ কানাইচন্দ্র পাল ১৩৮৮ বঙ্গাব্দের পরীক্ষিত আয়-ব্যয় বিবরণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন। শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহা সমর্থন করেন। উক্ত পরীক্ষিত আয়-ব্যয় বিবরণ সভায় অনুমোদিত হয়।

কোষাধ্যক্ষ ডঃ কানাইচন্দ্র পাল ১৩৮৯ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন। তাহা সমর্থন করেন শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন। উক্ত আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ অনুমোদিত হয়।

সম্পাদক ১৩৮৯ বঙ্গাব্দের জন্য ১৭ জন কর্মাধ্যক্ষের নাম সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন। শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করেন। কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত ১৭ জন কর্মাধ্যক্ষের নাম সভায় অনুমোদিত হয়।

সভাপতি : ডঃ সুকুমার সেন

সহকারী সভাপতি : (১) ডঃ রমা চৌধুরী, (২) ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, (৪) ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহা, (৫) শ্রীমনোজ বসু, (৬) শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত, (৭) ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, (৮) শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

সম্পাদক : শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, সহকারী সম্পাদক : (১) ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত, (২) ডঃ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ : শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী। পত্রিকাধ্যক্ষ : ডঃ সরোজমোহন মিত্র। গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : শ্রীঅসীমকুমার দত্ত। পুঁথিশালাধ্যক্ষ : ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। চিত্রশালাধ্যক্ষ : ডঃ কানাইচন্দ্র পাল।

সম্পাদক ১৩৮৯ বঙ্গাব্দের জন্য কুড়িজন নির্বাচিত সদস্যের নাম ঘোষণা করেন। সভায় তাহা অনুমোদিত হয়।

(১) শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, (২) শ্রীদেবকুমার বসু, (৩) শ্রীযুক্তা উষা সেন, (৪) শ্রীধীরাজ বসু, (৫) শ্রীতুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৬) শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ, (৭) শ্রীকুমারেশ ঘোষ, (৮) শ্রীমনুজচন্দ্র সর্বাধিকারী, (৯) শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ, (১০) শ্রীহারাধন দত্ত, (১১) ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী, (১২) শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, (১৩) শ্রীহৃষিকেশ ঘোষ, (১৪) শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৫) ডঃ উত্তমকুমার দাশ, (১৬) শ্রীকার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৭) ডাঃ বিমলেন্দুনারায়ণ রায়, (১৮) শ্রীশিব মুখোপাধ্যায়, (১৯) শ্রীশঙ্করপ্রসাদ নস্কর, (২০) শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ইহার পর সম্পাদক ১৩৮৯ বঙ্গাব্দের জন্য শাখা-পরিষৎ প্রতিনিধি নির্বাচনের ফল ঘোষণা করেন। (১) শ্রীসদানন্দ দাস, (২) শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, (৩) শ্রীসমীরেন্দ্র সিংহ রায়, (৪) ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী শাখা পরিষৎ প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত হন।

সম্পাদক চারিজন বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করেন :

(১) শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী, (২) শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত,
(৩) শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, (৪) শ্রীরাধারমণ মিত্র

১৩৮৯ বঙ্গাব্দের জন্য আয়-ব্যয় পরীক্ষক হিসাবে বি. সি. কুণ্ডু এ্যাণ্ড কোং এর নাম প্রস্তাব করেন শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস। শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করেন। অতঃপর বি. সি. কুণ্ডু এ্যাণ্ড কোং ১৩৮৯ বঙ্গাব্দের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আয়-ব্যয় পরীক্ষক নির্বাচিত হন। তাঁহারা আয়-ব্যয় পরীক্ষার জন্য ১০০০ (এক হাজার টাকা) সম্মান দক্ষিণা পাইবেন। সম্পাদকের এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

পরিষৎ সম্পাদক সভাপতি, উপস্থিত সদস্য ও পরিষৎ কর্মিগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাহার পর সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পরিষৎ-সংবাদ

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে আয়-ব্যয় উপসমিতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তীব্র আর্থিক সঙ্কটের কথা বিবেচনা করিয়া আপাতত নূতন করিয়া গ্রন্থ ও পত্রিকা মুদ্রণ ও বাঁধাইবার কাজ স্থগিত রাখিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। কার্যনির্বাহক সমিতি এই সুপারিশ অনুমোদন করিয়া ১৩৮৯ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১ম ও ২য় সংখ্যাকে যুগ্মসংখ্যা রূপে প্রকাশ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই হিসাবে পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত একটি যুগ্মসংখ্যা রূপে প্রকাশিত হইতেছে।

শোক সংবাদ : আলোচ্য কালসীমার মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি প্রয়াত অধ্যাপক সুশোভন সরকার, অধ্যাপক অনিলেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লার স্মরণে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। সদস্যগণ প্রয়াত ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

প্রতিষ্ঠা দিবস : গত ৮ই শ্রাবণ, রবিবার অপরাহ্নে শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরীর মঙ্গলাচরণের পর নব্বইটি প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মধ্য দিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নব্বইতম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য।

এই অনুষ্ঠানে অশীতিপর সাহিত্যসেবী হিসাবে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী, শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী, শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ইঁহাদের সকলকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে মানপত্র, পঞ্চফল ও মাল্য দ্বারা সংবর্ধিত করা হয়। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীনলিনীকান্ত সরকার শারীরিক কারণে উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহাদের মানপত্র ইত্যাদি অরবিন্দ আশ্রমের শ্রীহিমাংশু নিয়োগী গ্রহণ করেন।

অতঃপর তৃতীয় বর্ষের সাহিত্যিক হরনাথ ঘোষ স্মৃতিপদক (স্বর্ণখচিত রৌপ্য পদক) দেওয়া হয় শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীকে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সেবার জন্য শ্রীত্রিদিবনাথ রায়কে গোবিন্দ গৌরী স্মৃতিপদক দেওয়া হয়। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী সম্বর্ধনার উত্তরে একটি লিখিত ভাষণ দেন। এই ভাষণটি পাঠ করেন তদীয়া কন্যা শ্রীযুক্তা বাণী রায়। নাট্যকার মন্মথ রায়ও সম্বর্ধনার উত্তরে একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করেন।

এই অনুষ্ঠানে সাগরদিঘী নিবাসী শ্রীকিশোরীমোহন সিংহ আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর একটি পাথরের বিষ্ণুমূর্তি পরিষৎ মন্দিরে উপহার দিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকিশোরীমোহন সিংহ ইতিপূর্বেও একাধিক মূর্তি পরিষৎ প্রত্নশালায় উপহার দিয়াছেন। গত বৎসরে পরিষদে উপহৃত পুস্তকগুলিও প্রদর্শিত হয়।

এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ব্যতীত শ্রীমহাদেবপ্রসাদ সাহা, ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসমরেশ বসু, শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী ভাষণ দেন।

বার্ষিক অধিবেশন :

গত ১৬ই আশ্বিন, ১৩৮৮ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮৭তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান পত্রিকায় তার বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

আজীবন সদস্য :

সাহিত্য পরিষদের ৮৯তম বর্ষের তৃতীয় অধিবেশনে (২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯) ১০১/৮ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলি-১৪ নিবাসী শ্রীসর্বনাথ ভট্টাচার্য পরিষদের আজীবন সদস্যরূপে মনোনীত হইয়াছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি গ্রহণ :

কার্যনির্বাহক সমিতির সর্বসম্মত সুপারিশক্রমে গত বার্ষিক অধিবেশনে সাহিত্য পরিষদের নিয়মাবলী সংশোধিত হইয়াছে। সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের দুইজন করিয়া মনোনীত প্রতিনিধি এবং পরিষৎ-ভবন কলিকাতা কর্পোরেশনের যে ওয়ার্ডে অবস্থিত সেখান হইতে নির্বাচিত কাউন্সিলার কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরূপে গণ্য হইবেন।

সুনীতিকুমার স্মারক টিকিট :

সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক ও তার বিভাগের নিকট অনুরোধ জানাইয়া একটি প্রস্তাব কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

বিভিন্ন শাখা সমিতি ও উপসমিতির সদস্যগণ :

কার্যনির্বাহক সমিতির ২৬ আশ্বিন, ১৩৮৯ তারিখের সভায় বিভিন্ন শাখা সমিতি ও উপসমিতির গঠিত হইয়াছে।

সাহিত্য পরিষদের নামে কুৎসা প্রচার :

'আধুনিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা' নামক এক গ্রন্থে শ্রীকুমুদকুমার ভট্টাচার্য নামে একজন লেখক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও পরিষদের কয়েকজন সম্মানীয় কর্মাধ্যক্ষ সম্পর্কে মিথ্যা ও বিকৃত তথ্য প্রকাশ করিয়া পরিষদের যে মর্যাদা হানি করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তাব কার্যনির্বাহক সমিতির ২৬শে আশ্বিন তারিখের অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

সুদৃশ্য বাঁধাই

১ম খণ্ড : টা: ২০·০০

২য় খণ্ড : টা: ৩০·০০

[স্বল্প সংখ্যক পুস্তক অবশিষ্ট আছে]

বাংলা সাময়িক পত্র

১ম খণ্ড : টা: ১১·০০

২য় খণ্ড : টা: ৯·০০

স্বপ্ন

গিরিন্দ্রশেখর বসু প্রণীত

প্রায় এক যুগ পরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। সুদৃশ্য বাঁধাই

মূল্য : পনের টাকা

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, সম্পাদক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত
ও শ্রীহরি প্রিণ্টার্স, ১২২/৩ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট কলিকাতা-৪ হইতে
শ্রীমতী রেখা দে কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : আট টাকা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৯তম বর্ষ ॥ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা ॥

কার্তিক-চৈত্র

১৩৮৯

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৮৭তম বর্ষ ॥ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা
কার্ত্তিক-চৈত্র
১৩৮৭

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৮৯ বর্ষ ॥ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা

কার্তিক-চৈত্র

১৩৮৯

॥ সূচীপত্র ॥

প্রথম শূরপালের দ্বাদশ রাজ্যবর্ষের মূর্তিলেখ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কলাম্বাসনগরে অবস্থিত The Ohio State University-র অধ্যাপিকা Dr. Mrs. Susan L Huntington আমাকে একবার তাঁর পালযুগের ভাস্কর্য-বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কিয়দংশ পড়তে দিয়েছিলেন। তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের History of Art বিভাগের Associate Professor. গত মে মাসের (১৯৮২) গোড়ার দিকে তিনি আমাকে অভিলেখসংবলিত একটি বিষ্ণুমূর্তির আলোকচিত্র পাঠিয়ে অনুরোধ করেন, আমি যেন তাঁর গ্রন্থখানিতে প্রকাশের জন্য ঐ মূর্তিলেখটির পাঠ ও অনুবাদ তাঁকে পাঠাই। তিনি পরে আমাকে লিখেছেন যে, ঐ বিষ্ণুমূর্তি বর্তমানে গয়াসংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। শুনেছি, মূর্তিটি গয়া জেলার কুর্কীহার গ্রামে পাওয়া গিয়েছিল।

বিষ্ণুমূর্তি-লেখটির তারিখ রাজা শূরপালের ১২শ রাজ্য-সংবৎসর। এই শূরপাল অবশ্যই পালবংশীয় দেবপালের পুত্র। পূর্বে অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই প্রথম শূরপালকে নারায়ণপালের পিতা প্রথম বিগ্রহপালের সঙ্গে অভিন্ন মনে করতেন। কিন্তু এখন আমরা জেনেছি যে, এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ বিগ্রহপালের পিতা ছিলেন ধর্মপালের কনিষ্ঠভ্রাতা বাক্‌পালের পুত্র জয়পাল এবং সম্প্রতি আবিষ্কৃত শূরপালের তাম্রশাসনানুসারে তিনি দেব-পালের মহিষী মাহটাদেবীর গর্ভজাত পুত্রছিলেন।

পূর্বে প্রথম শূরপালের সর্বাধিক রাজ্যবর্ষ জানা ছিল ৫ম সংবৎসর। ৩২ বৎসর পূর্বে আমি Indian Historical Quarterly (Vol. XXVI, 1950, p. 139) পত্রিকায় বিহারের অন্তর্গত মুঙ্গের জেলায় রাজৌনাগ্রামে প্রাপ্ত শূরপালের ৫ম রাজ্যবর্ষের একটি মূর্তিলেখের উল্লেখ করেছিলাম। পরে শ্রীযুক্ত প্রিয়তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় Journal of Ancient Indian Hist ry (Vol. VII, 1973-74, pp. 102 ff.) পত্রিকায় অভিলেখটির পাঠ প্রকাশ করেন। যাহোক, পরলোকগত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত History of Ancient Bengal গ্রন্থে রাজৌনার মূর্তিলেখটি লক্ষ্য না করে শূরপালের সর্বাধিক রাজ্যবর্ষ ৩য় সংবৎসর এবং আনুমানিক রাজত্বকাল ৪ বৎসর ধরা হয়। তাঁর উক্তির সমালোচনায় আমি বলেছিলাম যে, এই রাজার সর্বাধিক রাজ্যবর্ষ ৫ম বৎসর; সুতরাং তাঁর আনুমানিক রাজত্বকাল ৮ বৎসর হতে পারে। কিন্তু এখন এই নূতন মূর্তিলেখ আবিষ্কারের ফলে দেখা গেল, প্রথম শূরপালের সর্বাধিক রাজ্যবর্ষ ১২শ বৎসর এবং তাঁর রাজত্বকালের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩।১৪ বৎসর। তাঁর আনুমানিক রাজ্যকাল ৮৪৭-৬০ খ্রীস্টাব্দ মনে করা যায়। এই প্রসঙ্গে আমার পাল-সেনযুগের বংশানুচরিত, পৃষ্ঠা ১২ এবং ৩৯ ও ৪১ দ্রষ্টব্য।

দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্তির পৃষ্ঠভাগে বামাংশে উপরদিক্ থেকে অভিলেখটি আরম্ভ করা হয়েছে। পঙ্‌ক্তিটা নীচের দিকে ঘুরে মূর্তির ডান দিক্, সামনের দিক্ এবং বামদিক্ শেষ করে ওর অবশিষ্টাংশ বামদিকের নীচে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি ও পশ্চাদ্দিকের নীচে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি হিসাবে উৎকীর্ণ করে শেষ করা হয়েছে। লেখা এবং খোদাই, এই দুটি কাজেই ত্রুটি দেখা যায়।

অভিলেখে বলা হয়েছে যে, জনৈক চর্মকার আপণক মহাবিহারে মূর্তিটি তার দেয়ধর্ম হিসাবে দান করেছিল। মানৎ করে কামনা সিদ্ধির পর উৎসর্গীকৃত মূর্তিকে দেয়ধর্ম বলা

হত। কিন্তু বৌদ্ধ বিহারে বিষ্ণুমূর্তি কেন? বর্তমান বিহার অঞ্চলের মধ্যযুগীয় বৌদ্ধ বিহারসমূহের মধ্যে আপনক বা আপণক বিহার একটি সুপ্রসিদ্ধ বিহার। কতকগুলি মূর্তিলেখ এবং পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকায় এর নাম পাওয়া যায়। রামপালের রাজত্বের ১৮শ বর্ষে আপণক মহাবিহারে অনুলিখিত 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকাতে আছে—"দেয়ধর্মো'য়ং প্রবর-মহাযান-যায়িনঃ মলয়দেশ-বিনির্গত-শাক্যভিক্ষু-স্থবির-পূর্ণচন্দ্রস্য যদত্র পুণ্যং তদ্ভবত্বাচার্যোপাধ্যায়-মাতাপিতৃ-পূর্বঙ্গমং কৃত্বা সকল-সত্বরাশেরনুত্তর-জ্ঞানাপ্তয় ইতি। মহারাজাধিরাজ-শ্রীমদ্ রামপালদেব-রাজ্য-সম্বৎ ॥ ১৮ ॥ শ্রীমদাপণক-মহাবিহারাবস্থিত-বমতানক-জয়কুমারেণ লিখিত ইতি।" এখানে দেখা যাচ্ছে, একখানি শাস্ত্রগ্রন্থ লিখিয়ে বৌদ্ধমন্দিরে দান করা হবে, এই মর্মেই মানৎ করা হয়েছিল। মন্দিরে বা উপযুক্তপাত্রে গ্রন্থদান পুণ্যকার্য বলে গণ্য হত। আপণকবিহার বর্তমান কুর্কীহার গ্রামে অবস্থিত ছিল, মনে করা যায়।

বিষ্ণুভক্তের পক্ষে বৌদ্ধবিহারে বিষ্ণুমূর্তিদানের কারণ হয়তো এই যে, বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার বলে তার কাছে বুদ্ধ ও বিষ্ণুর মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না। কিন্তু মন্দিরের কর্তৃপক্ষ মূর্তিটিকে কোন্ মনোভাব থেকে গ্রহণ করলেন? বুদ্ধের সহিত অভিন্ন হিসাবে, না কি উত্তরকালীন গোঁড়া বৌদ্ধগণ যেমন হিন্দু দেবদেবীকে বৌদ্ধ দেবদেবী অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরবর্তী মনে করত, সেই ভাবে? আমরা জানি যে একাদশ শতাব্দীতে কাকতীয় রাজা প্রথম প্রতাপরুদ্রের গুরু ছিলেন গোঁড়া শৈব মল্লিকার্জুন পণ্ডিত; কিন্তু তাঁর স্ত্রী গৌরী ছিলেন গোপীনাথ নামক বিষ্ণুবিগ্রহের ভক্ত। মল্লিকার্জুনের পক্ষে এটা সহ্য করা কিছু অসম্ভব হয় নি। কারণ তাঁর কাছে বিষ্ণু ছিলেন শিবের ভক্তমাত্র। যাহোক, বৌদ্ধ-বিহারে বিষ্ণুর প্রবেশের এই উদাহরণ পূর্বভারতে বৌদ্ধগণের ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজে মিশে যাবার কাহিনীর অঙ্গীভূত বলে বোধ হয়।

বাংলা অঞ্চলের চর্মকারগণ অনেকে মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করে এবং দেবদেবীর পূজা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে জীবিকার্জন করত এবং তাদের মধ্যে সম্পন্ন গৃহস্থের অভাব ছিল না। বিহারের অবস্থাও তদ্রূপ ছিল বলে মনে হয়।

অভিলেখের পাঠ

মূর্তির পশ্চাদ্দিকের বামভাগে— দেয়ধর্মোয় শ্রীশূরপাল-রাজ্যে
পশ্চাদ্দিকে নীচে—[পঙ্ক্তি ১] সম্বৎ ১২ শ্রীমদাপণক-
বামদিকে নীচে—মহাবিহারে ঠী-
সম্মুখদিকে নীচে—সব্যা চর্মকার-তিয়াবচস
ডানদিকে নীচে—[পঙ্ক্তি ১] কপিলাকত-
[পঙ্ক্তি ১] স্য পু [ত্রে]-মহু-
পশ্চাদ্দিকে নীচে—[পঙ্ক্তি ২] কেন কারিতং

সংশোধিত পাঠ

দেয়ধর্মো'য়ং শ্রীশূরপাল-রাজ্যে সংবৎ ১২ শ্রীমদাপণক-মহাবিহারে ঠীসব্যাঃ চর্মকার তিয়াবচস্য কপিলাকতস্য পুত্রেণ মহুকেন কারিতম্।

বঙ্গানুবাদ

এই ধর্মদানটি শ্রীশূরপালের রাজত্বকালের ১২শ বৎসরে শ্রীমদ্ আপণক-মহাবিহারে ঠীসবী-গ্রামবাসী চর্মকার তিয়াবচের দেওয়া। [বস্তুটি] কপিলাকতের পুত্র মহুকের দ্বারা নির্মিত।

চর্মকারের নাম 'তিয়াবচ' স্থলে 'তিয়াবক' উদ্দিষ্ট হতে পারে। শিল্পের ইতিহাসে মূর্তি-নির্মাতার নামোল্লেখের বিশেষ মূল্য আছে।

সমাজ সংগঠনের পথের সন্ধানে

শ্রীঅম্লান দত্ত

সমাজ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, এ সব কথা আজ আমরা সবাই মানি। যে হেতু পরিবর্তনের ভালোমন্দ যা কিছু ফল মানুষকেই ভোগ করতে হবে, অতএব এ ব্যাপারটা আমাদের একটা আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। কী ভাবে, কোন পথে পরিবর্তন ঘটলে তার পরিণাম শুভ হয়, কেনই বা বিপত্তি আসে, এই সব প্রশ্ন আমাদের অনেকেরই মনে মাঝে মাঝে ছায়া ফেলে যায়। এই রকম বড় প্রশ্নের কোনো শেষ উত্তর হয় তো আশা করাই ভুল। কিন্তু ভবিষ্যৎ নিয়ে মানুষ চিন্তা করবে এতেই তো তার মনুষ্যত্বের পরিচয়। আমরা অবশ্য এই বড় প্রশ্নের সীমাবদ্ধ দুয়েকটি দিক নিয়েই এখানে আলোচনা করব।

সামাজিক পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে কথা বলবার আগে সমাজ সংগঠনের কাঠামো অথবা বিন্যাস নিয়ে খানিকটা চিন্তা করে নেওয়া দরকার। বিভিন্ন মানুষকে নিয়ে যেসব গোষ্ঠী ও সংগঠন গড়ে উঠেছে তাদের দু'টি মৌলরূপের কথা প্রথমেই বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। একটিকে বলব আত্মীয় গোষ্ঠী, অন্যটিকে ব্যবসায়িক সংগঠন। আত্মীয়গোষ্ঠীতে আমার অল্পবেশী নিজেকে অন্যের ভিতর এবং অন্যকে নিজের ভিতর স্থাপন করে দেখি, অন্যের সুখে সুখ, অন্যের দুঃখে দুঃখ অনুভব করি; অন্যের গর্বে নিজে গর্বিত, অন্যের অসম্মানে নিজে অসম্মানিত বোধ করি, ব্যবসায়িক সংগঠনে প্রত্যেকের পৃথক স্বার্থ, লাভক্ষতির পৃথক হিসেব। সেখানে সাময়িক স্বার্থে, সীমাবদ্ধ প্রয়োজনে, বিভিন্ন মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, আবার সেই কারণেই কখনও সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

বলা বাহুল্য, এই দুটি মৌলরূপের পাশে পাশে কিছু মিশ্ররূপও দেখা যায়। যেমন ব্যবসায়িক বা বৃত্তিমূলক কারণে কিছু মানুষ একত্র হয়, তারপর বৈবাহিক ও অন্যান্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে আত্মীয়গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

আদিম আত্মীয়গোষ্ঠীতে রক্তের সম্পর্কটা প্রধান কিন্তু সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর গোষ্ঠী স্থাপিত হয় ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে। একটা সম্প্রসারিত আত্মীয়ভাব সেখানে স্পষ্ট, রক্তের সম্পর্কটা তেমন প্রত্যক্ষ নয়। তবু সুখে দুঃখে, উল্লাসে বিষাদে, উৎসবে অনুষ্ঠানে ব্যবসায়িক স্বার্থের অধিক একটা আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করা যায়। সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের সেই ঐক্যবদ্ধ রূপকে এই কারণেই আত্মীয়ধর্মী বলা চলে।

সামাজিক ইতিহাস ও বিবর্তন সম্বন্ধে খুব মোটা তুলিতে আঁকা দু'টি ছবি এখানে পাশাপাশি রাখা যেতে পারে। প্রথমটিতে মূল কথা এই যে, মানুষের ছোট ছোট বৃত্ত অথবা গোষ্ঠীকে নানাভাবে বৃহত্তর বৃত্তে যুক্ত করে উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে সমাজ এগিয়ে চলেছে। কয়েকটি পরিবার মিলে একটি উপজাতি, বিভিন্ন উপজাতি, একত্র হয়ে জাতি, জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব-মিলনের বন্ধুর পথ ধরে এক মহাজাতির অভিমুখে যাত্রা। এই বৃহত্তর মানবসংহতির গঠনের ধারায় ভাষা ও ধর্ম তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা নির্বাহ করে চলেছে, সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটছে, জাতীয় দ্বন্দ্ব-কলহের মীমাংসার জন্য কতরকম প্রণালী ও সংগঠন উদ্ভাবিত হচ্ছে। এইসব মিলিয়ে মানবজাতি ও সমাজের ক্রমবিবর্তনের একটি ধারণার সঙ্গে আমরা পরিচিত। ভারতের ইতিহাসের যে দিকটি রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ'

কবিতায় স্মরণীয় হয়ে উঠেছে অথবা 'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতায় দার্শনিকভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, তার সঙ্গে এই ধারণার অনেকখানি মিল আছে।

অর্থাৎ, মানুষের গোষ্ঠীজীবনের মূলে যে আত্মীয়ধর্মিতা, সংস্কৃতির অভিব্যক্তিতে যে বহুত্ব ও বৈচিত্র্য আবার সেই সঙ্গে সমন্বয়ের প্রয়াস ও ঐক্যমুখিতা, এই সব আশ্রয় করে মানুষের বৃহত্তম সমাজজীবন গঠনের পথে যে-পরীক্ষা নিরীক্ষা, ইতিহাস বিষয়ে একটি দৃষ্টিভঙ্গীতে এসবই প্রাধান্য পেয়েছে। অন্য ধারণাটিতে প্রধান করে তুলে ধরা হয়েছে সমাজের ভিতর ধনী দরিদ্রের বৈষম্যকে এবং আরো বিশেষভাবে শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের ঘটনাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গী একটা দৃঢ়বদ্ধ সূত্রাকারে লক্ষ করা যায় মার্কসবাদী চিন্তাধারায়। অপেক্ষাকৃত শিথিল আকারে এই ধরণের একটা চিন্তা অথবা অনুভব বহু সংস্কারপন্থী এমন কি রক্ষণশীল ব্যক্তির বক্তব্যেও ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। উদাহরণত উল্লেখ করা যেতে পারে উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনায়ক ডিজরেলির সেই বিখ্যাত উক্তি, ধনী ও দরিদ্র এই দুই জাতিতে বিভক্ত বিটিশ সমাজ। বস্তুত উনিশ শতকের অনেক লেখক, সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজসংস্কারকের চিন্তা ভাবনাতেই শ্রেণীস্বার্থের সংঘাতের কথা খুঁজে পাওয়া যায়। তবু ইতিহাসের ব্যাখ্যার ভিত্তি ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে মার্কসীয় সমাজদর্শনেই।

এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর কোনোটিই সম্পূর্ণ ভুল নয়। কোনো একটিকে সমগ্র সত্য বলে মনে করাটাই ভুল। ইহুদীদের ভিতর ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য আছে। কিন্তু এই বৈষম্যকে অতিক্রম করে ধর্মের ভিত্তিতে বিশ্বজোড়া ইহুদীর ভিতর একটা আত্মীয়ভাবও আছে। ব্রিটিশ সমাজ শ্রেণীতে বিভক্ত। আবার শ্রেণীবিভাগ সত্বেও ইংরেজের ভিতর ভাষা ও জাতীয়তাবাদের আধারে একটা ঐক্যের বন্ধন আছে। উনিশ শতকের শেষভাগে ও বিশ শতকের গোড়াতে ইংল্যাণ্ডে ও জার্মানিতে শ্রমিক আন্দোলন দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করে। ঐ সময়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সাম্যবাদী সংগঠনও দেখা দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে কোনো কোনো সাম্যবাদী নেতার মনে আশা ছিল যে, ইংরেজ ও জার্মান শ্রমিক ঐ যুদ্ধকে ধনিক শ্রেণীর চক্রান্ত বলে চিনে নেবে এবং শ্রেণীগত ঐক্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমভাবে নিজ নিজ দেশে শাসকশ্রেণীর বিরোধিতা করবে। সেই আশা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সংকটের মুহূর্তে ধনী ও দরিদ্র ইংরেজ একই পতাকার নীচে দাঁড়িয়েছে সমান ঐক্যবদ্ধ জর্মান জাতির বিরুদ্ধে।

যুদ্ধকালীন জাতীয় ঐক্যবোধে একটা উত্তেজনা এবং মাদকতা থাকে, যাকে সব সময় স্বাস্থ্যকর বলা চলে না। কিন্তু এটাই সব নয়। এই সব উত্তেজনার বাইরেও জাতি ও গোষ্ঠীর জীবনে একটা স্বাভাবিক আত্মীয়ভাব আছে, মানবপ্রকৃতির সম্পূর্ণতার জন্য যেটা প্রয়োজন। জার্মানিতে ভ্রমণকালে রেলগাড়ীর এক কামরায় বসে কোনো বাঙালী যখন অন্য কামরা থেকে হঠাৎ রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধ্বনি শুনতে পায়, অথবা বিদেশে কোনো স্বদেশবাসীর সঙ্গে যদি হঠাৎ সাক্ষাৎ ঘটে, তখন যে-যোগাযোগের আনন্দ উৎপন্ন হয় সেটা আত্মিক মিলনেরই আনন্দ, সেই অপ্রত্যাশিত যোগে আমাদের হৃদয়ের একটা প্রচ্ছন্ন অথচ স্থায়ী আকাঙ্ক্ষাই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। ব্যবসায়িক বুদ্ধি এবং আত্মীয় ভাবের বিচিত্র মিশ্রণে সমাজের ছোট বড় নানা কাজ চলে। এরই গুণে প্রতিদিনের নানা কলহ উত্তীর্ণ হয়েও যৌথ জীবনের সংহতি এবং ব্যক্তির জীবনে একটা ন্যূনতম সাম্য রক্ষা পায়।

অথচ মাত্রা রক্ষা যে পাবেই এমন কোনো নিশ্চিন্ত আশাবাদে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। ব্যবসায়িক বুদ্ধির প্রাবল্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়ভাব যখন তার প্রাণশক্তি

হারায় অথবা যখন গোষ্ঠীগত সংহতির ভিতর বিরোধী গোষ্ঠীর প্রতি হিংসার ভাবটাই প্রধান হয়ে ওঠে, তখন সেটা ব্যক্তি ও সমাজ দুয়েরই পক্ষে অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। দুরকম বিপত্তিই আধুনিক সমাজে বারবার দেখা দিয়েছে। এই দুই ব্যাধির প্রকোপ থেকে রক্ষা করে মানুষের যৌথ জীবন কী করে গড়ে তোলা যায় সেটাই আজ সমাজে সংগঠনের একটা মূল প্রশ্ন। এযুগের দক্ষিণপন্থী আন্দোলন কোনোটিই এই ব্যাধির আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে নি। নতুন সমাজ সংগঠনের উপায় নিয়ে অতএব পুনরায় চিন্তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

মানুষের বুদ্ধি, চিন্তা অথবা পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাজকে পরিবর্তিত ও সংগঠিত করা যায় এমন কথা অতীতে বড় শোনা যেত না। ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য সাধনা ও সন্ন্যাসের পথ প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সমাজের কোনো ব্যাপক পরিকল্পিত পরিবর্তন সম্ভব নয়, এই রকম ধারণাই সেকালে প্রাধান্য পেয়েছে। আঠারো শতক থেকে একটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রচারিত ও প্রসারিত হতে থাকে। এদেশেও উনিশ শতকে নবজাগরণের সঙ্গে যুক্ত এই চিন্তাধারা ক্রমে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। মানুষই সেই অদ্বিতীয় জীব যে নিজের সামাজিক জীবন ও ইতিহাস নিজে সচেতনভাবে রচনা করে এগিয়ে যেতে পারে এই চিন্তায় অনেকটা নতুনত্ব আছে।

আঠারো ও উনিশ শতকে সমাজকে নতুনভাবে সংগঠিত করবার কথা যাঁরা বলেছিলেন তাঁরা অনেকেই ছিলেন যুক্তিবাদী। মানুষের যুক্তি অথবা বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত করা, চিন্তাকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা, এসব ছিল তাঁদের মতে উন্নত সমাজসংগঠনের জন্য প্রাথমিক কাজ। সমাজে যেমন একদিকে অসাম্য ও অন্যায় জমে ওঠে তেমনি অন্যদিকে মানুষের ধ্যানধারণায়ও একটা বিকৃতি ঘটে। সত্যের এই যে বিকৃতি, সমাজের মনে যখন সেটা সাধারণভাবে ব্যাপ্তিলাভ করে, তখন সেই গৃহীত অসত্যকেই বলা যেতে পারে কুসংস্কার। অন্যায়ের সঙ্গে কুসংস্কারের একটা অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে, একে অন্যের কাছে আশ্রয় লাভ করে, একে অন্যকে পুষ্ট করে। কাজেই সমাজের শোধনের জন্য সত্যেরও নির্ভীক অন্বেষণ প্রয়োজন। মানুষের মন থেকে কুসংস্কার টলাতে না পারলে অন্যায়কেও দূর করা যাবে না।

এই রকম একটা প্রত্যয় থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগে মহারাষ্ট্রের মহান চিন্তানায়ক যতিরাও গোবিন্দরাও ফুলে 'সত্যশোধক সমাজ' গঠন করেন। এই সত্যশোধক আন্দোলন ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্ম আশ্রিত সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বদ্ধসংকল্প। যে-সংস্কার হিন্দু সাধারণকে শেখায় যে, গোমূত্র পানে পবিত্রতা লাভ হয় কিন্তু শূদ্রের হাত থেকে পানীয় জল গ্রহণ করলে উচ্চবর্ণের মানুষ অপবিত্র হয়, সেই সংস্কারকে মহাত্মা ফুলে সামাজিক অসাম্যের ধারক বলে জানতেন। এই আন্দোলনেরই পরবর্তী পর্যায়ের নেতা সুপণ্ডিত আম্বেদকার তিনি দেখিয়েছিলেন যে, শতাব্দীসঞ্চিত কুসংস্কারের প্রভাবে হিন্দু সমাজের বিবেক অসার হয়ে গেছে। নিম্নবর্ণের প্রতি সব রকমের অন্যায় ও অপমানই ঐতিহ্যের নামে গ্রহণীয় ও সহনীয় হয়ে উঠেছে। আম্বেদকার ভারতীয় রাজনীতির এক বিরাট পুরুষ। কিন্তু তিনি একথা জানতেন যে, শুধু রাজনীতির দ্বারা সমাজকে শুদ্ধ ও মুক্ত করা যায় না। সমাজের চিত্ত ও বিবেককে জাগাতে হলে একটা বৌদ্ধিক আন্দোলনেরও অত্যন্ত প্রয়োজন। জাগ্রত বিবেকই মানুষের মৌল অধিকারকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো রক্ষা করতে পারে, আইন হতে পারে শুধু তার সহায়ক। আমাদের ধর্মে চিত্তশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। সেখানে জোর পড়েছে চিত্তকে বাসনা কামনা থেকে মুক্ত করবার ওপর। এরও প্রয়োজন স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু এযুগে ফুলে অথবা আম্বেদকার যে আন্দোলনের নেতা ও পথিকৃৎ তাতে চিন্তার আলোক পড়েছে ভিন্নস্থানে। সামাজিক বিচারবুদ্ধি অথবা বিবেকের

শোধনই এঁদের চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে। আম্বেদকার সংবিধান বিষয়ে জ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু তিনি একথা জানতেন যে, সংবিধানের জোরে অন্যায়কে দূর করা যাবে না। তাই তিনি বলেছিলেন, "rights are protected not by law but by the social and moral conscience of society···Social conscience······is the only safeguard of all rights fundamental or non-fundamental." (১৯৪৩ সালে রাণাডের জন্মদিবসে পুণায় প্রদত্ত ভাষণ থেকে উদ্ধৃতি।) চিন্তাকে স্বাধীন ও সামাজিক বিচারবুদ্ধিকে ন্যায়নিষ্ঠ করবার জন্য হিন্দুসমাজের অভ্যন্তর থেকে যেমন সত্যশোধক আন্দোলনের উৎপত্তি ঘটে মুসলমান সমাজের ভিতর থেকেও তেমনি অনুরূপ কিছু আন্দোলন দেখা দেয়। উদাহরণত এই শতকের বিশের দশকে ঢাকার কয়েকজন চিন্তানায়কের উদ্যোগে বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন নামে পরিচিত ভাবধারার উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানেও উদ্দেশ্য ছিল মোল্লা-মৌলবীদের আধিপত্য থেকে উদ্ধার করে মুসলমানমানসে নতুন চিন্তার উন্মোচন এবং সেই মুক্ত বিচারধারার সাহায্যে বৃহত্তর সামাজিক ন্যায়ের অনুকূল ক্ষেত্র রচনা।

উনিশ শতকের দূরদর্শী নেতারা সমাজের অগ্রগতির জন্য সাংস্কৃতিক রূপান্তর ও নবজাগরণের ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। বিশ শতকে দৃষ্টিভঙ্গীর একটা পরিবর্তন দেখা যায়। রাজনীতিকেই যেন নতুন যুগের নেতারা সমাজপরিবর্তনের প্রধান সহায় বলে মেনে নিয়েছেন। জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে এটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। বিদেশী শাসকের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া স্বদেশী নেতাদের কাছে সেদিন সবচেয়ে জরুরী কাজ বলে মনে হয়েছে। রাষ্ট্রশক্তি যতদিন বিদেশীর হাতে আছে ততদিন দেশের কোনো স্থায়ী উন্নতি সম্ভব নয়। আর রাষ্ট্রশক্তি দখলের জন্য যে কর্মপন্থা ও আন্দোলন তারই নাম তো রাজনীতি। কাজেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগে, অন্তত বিশ শতকে, এদেশে এবং অন্যান্য পরাধীন দেশে রাজনীতিকেই অনেকে বেছে নিয়েছেন জাতীয় উন্নতির প্রধান উপায় হিসেবে।

বলা বাহুল্য, এই চিন্তাধারা সকলে গ্রহণ করেন নি। আম্বেদকারের কথা এইমাত্র বলা হয়েছে। পুণায় প্রদত্ত যে বক্তৃতা থেকে ওপরে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেই ভাষণে তিনি রাজনীতি-সর্বস্বতার খোলা সমালোচনা করেছেন। ইংরেজের হাত থেকে হিন্দু উচ্চবর্ণের কিছু নেতার হাতে ক্ষমতা এলেই দেশের কোনো মৌল উন্নতি ঘটবে একথা আম্বেদকারের মনে হয় নি। তাই সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন তাঁর কাছে প্রকৃত স্বাধীনতার পূর্বশর্ত বলে মনে হয়েছে। এদিক থেকে বামপন্থী সাম্যবাদী নেতাদের সঙ্গে আম্বেদকারের মতামতের মিল ও অমিল দুই-ই লক্ষ করবার যোগ্য।

সাম্যবাদী নেতারাও বিশ্বাস করেন যে, এদেশীয় মধ্যবিত্তের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটলেই তাতে সমাজের কোনো বড় পরিবর্তন সাধিত হবে না। অন্তত মার্কসীয় দৃষ্টিতে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতার হস্তান্তরই সমাজের অধিকাংশ মানুষের মুক্তির পূর্বশর্ত। কিন্তু আজকের দিনে মার্কসবাদীও কার্যত রাজনীতিকে প্রাথমিকতা দিয়ে থাকেন। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করাটাই প্রধান কথা। শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় সাম্যবাদী দলকে প্রথমেই সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে এই ক্ষমতা দখলের কাজে। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে এলে তবেই সাংস্কৃতিক অথবা বৌদ্ধিক রূপান্তরের কাজ সফল হতে পারে।

যিনি প্রকৃতই মার্কসবাদে বিশ্বাসী তিনি ধর্মে বিশ্বাস করেন না কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন অথবা শাস্ত্রের সমালোচনা অথবা জাতিভেদের বিরোধিতায় এদেশে সাম্যবাদী দল আপাতত তেমন সক্রিয় ও উৎসাহী নয়। অপসংস্কৃতিবিরোধী আন্দোলনেও আজ বামপন্থীদের সঙ্গে ঐতিহ্যপন্থীদের মতের অনেকটা মিল চোখে পড়ে। লোকসংস্কৃতির

যে দিকটা কুসংস্কারচ্ছন্ন তার কঠোর সমালোচনা উনিশ শতকী প্রগতিপন্থীদের চোখে যেমন গুরুত্ব পেয়েছিল আজ আর তেমন নয়। জনগণের সংস্কার অথবা কুসংস্কারের আমূল বিরোধিতা করতে গেলে জনসাধারণের সমর্থন হারাবার ভয় আছে। রাজনীতির কৌশলের দিক থেকে এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে জনগণকে যথাসম্ভব সঙ্গে রাখাই বেশী জরুরী। এই রকম একটা চিন্তাধারা যেমন জাতীয়তাবাদী তেমনি সাম্যবাদী রাজনীতিতেও প্রভাব বিস্তার করেছে। রাজনীতির প্রাথমিকতা এযুগে বামপন্থী আন্দোলনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ বামপন্থী অথবা প্রগতিবাদী কি না সেই বিচারে আমরা আজ তার সামাজিক আচরণ অথবা সাংস্কৃতিক বিচারবুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া তেমন প্রয়োজন মনে করি না, বরং তাঁর রাজনীতির উগ্রতাকেই প্রধান মানদণ্ড বলে মানি। ভবিষ্যতের সমাজসংগঠনের পথ হিসেবে এই রাজনীতিসর্বস্বতা কতটা উপযুক্ত অথবা হিতকর সেটাই আমাদের সামনে আজ প্রশ্নের আকারে আবারও দেখা দিয়েছে।

রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করবার দু'টি উপায়ের কথা বলা যায়। একটি সশস্ত্র বিপ্লবের পথ, অন্যটি দলীয় রাজনীতির সংবিধানসম্মত পথ। গান্ধীজী একটি তৃতীয় পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করা তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর কথা পরে আলোচনা করা যাবে। যে সব দেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথ খোলা নেই সেখানে সশস্ত্র বিপ্লবের আবেদন সহজে স্বীকার্য। রুশ-বিপ্লবের পটভূমিতে আছে জারের স্বৈরতন্ত্র। ঐ বিপ্লবের ফলে ইয়োরোপ আজ দু'ভাগে বিভক্ত। এই দুই ব্যবস্থার তুলনামূলক বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ক্ষমতাদখলের রাজনীতি এবং তার কিছু ফলাফলই এখানে আলোচ্য। বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে যে-দল গড়ে উঠেছে তার কিছু নিজস্ব গুণাগুণ দেখা গেছে। এই সব দলে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়তা এবং আত্মসমালোচনার রীতি আছে। কিন্তু নেতৃত্বের প্রতি কুণ্ঠাহীন আনুগত্য, কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধতা এবং গোপনীয়তারক্ষা স্বাভাবিক কারণেই বিপ্লবীদের পক্ষে অপরিহার্য। যে-হেতু বিপ্লবীদল প্রতিপক্ষকে উচ্ছেদ করতে বদ্ধসংকল্প, অতএব প্রতিপক্ষের কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি অথবা বিবেচনা আশা করতেও সে অভ্যস্ত নয়। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলই কিছুটা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থা রক্ষা করবে, এই রকম আশা করা হয়। বিপ্লবের রাজনীতিতে সেই প্রত্যাশার ভিত্তি নেই। বরং প্রতিপক্ষকে প্রতি পদে সন্দেহ এবং সতর্কতার সঙ্গে দেখাই সহিংস বিপ্লবীর পক্ষে স্বাভাবিক। কখনও আবার বিপ্লবী আন্দোলনেরই একভাগ অন্যভাগের প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে। দলের একাংশ যখন বিপ্লবে আস্থা রক্ষা করে শ্রেণীশত্রুর উচ্ছেদের জন্য অনুপ্রাণিত, অন্য অংশ হয় তো তখনই আপসের রাজনীতিকে ক্ষমতালাভের আশায় কৌশল হিসেবে বেছে নেয়। এই দুই গোষ্ঠীর অতি নির্মম ভ্রাতৃকলহ তখন রাজনীতিকে বিষাক্ত করে তোলে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, এই সব অবস্থার ভিতর দিয়ে যে বিপ্লবী দলটি গড়ে ওঠে ক্ষমতা হস্তগত হবার পর সেই দলই মহানসংকল্পের নামে অত্যাচারের একটি নতুন নির্দয় যন্ত্রবিশেষে পরিণতি লাভ করে।

কিন্তু আজকের সমস্যা শুধু বৈপ্লবিক হিংসায় বিশ্বাসী দলকে নিয়েই নয়। সংবিধান-শাসিত সমাজের অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিবেশেও দলীয় রাজনীতির যে অবনতি ঘটে সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার সাক্ষ্য সুস্পষ্ট। ক্ষমতার লড়াই যখন রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে তখন সুনীতির সঙ্গে রাজনীতির একটা বিরোধী সম্পর্ক দেখা দেয়। যে কোনো উপায়ে, নীতির বালাই না রেখে, ক্ষমতা দখল করবার জন্য দুপক্ষই সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এদেশে গত কয়েক বছরে ব্যাপারটা নাটকীয় আকার ধারণ করেছে নীতিহীন দলত্যাগের ভিতর দিয়ে। কিন্তু দল থেকে দলে সুযোগসন্ধানী আবর্তন-প্রত্যাবর্তন শুধু বাইরের দৃশ্য।

তারও পিছনে টাকার খেলা, গুপ্ত হত্যা, চরিত্রহননের মিথ্যা চক্রান্ত, অজস্র কাপট্য এবং সমাজজীবনে দাঙ্গা ও কলহ সৃষ্টিকারী উস্কানি ও প্ররোচনা নিয়ত চলতে থাকে। মূল্যবোধের ধ্বংসস্তূপের ওপর দলীয় রাজনীতি গড়ে ওঠে। দলীয় রাজনীতির একটা অপেক্ষাকৃত সদর্থক দিকও নিশ্চয়ই ছিল, এখনও আছে। সেটা উপেক্ষণীয় নয়। তবু সমস্যার জটিল দিকটাই এখানে তুলে ধরা প্রয়োজনীয়। সেটা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। রাজনীতির পরিপূরক স্বতন্ত্র ও বহুমুখী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন যখন সবল থাকে তখন পরিস্থিতির চেহারা একরকম। রাজনীতি যখন সব কিছু গ্রাস করতে উদ্যত হয় তখন পরিস্থিতি অন্যরকম। এই নতুন পরিস্থিতিতে সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষেরা সঙ্গত কারণেই চিন্তিত হয়ে ওঠেন।

মূল প্রশ্নে আবারও ফিরে আসা প্রয়োজন। কিছু মূল্যবোধের আশ্রয়েই সুস্থ সমাজ রক্ষা পেতে পারে। সেই মূল্যবোধকে কে রক্ষা করবে? রাজনীতি কি তার রক্ষক হতে পারে? আজকের রাজনীতি দেখে তো তা মনে হয় না। রাজনীতির কদর্যতায় শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা উৎকণ্ঠিত। তারই আক্রমণে মূল্যবোধ আজ বিপন্ন। উত্তরে বলা হবে যে, দোষটা রাজনীতির একার নয়, দোষটা সামগ্রিক সামাজিক পরিস্থিতির। তবু প্রশ্নটা থেকেই যায়। এই পরিস্থিতি থেকে রাজনীতি একা কি সমাজকে রক্ষা করতে পারে? গান্ধী রাজনীতির সঙ্গে সুনীতি অথবা ন্যায়বোধের যোগসাধন করতে চেয়েছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় শেষ বয়সে রাজনীতির নৈতিক শোধনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। এই শোধন তখনই সম্ভব যখন রাজনীতিকে চারদিক থেকে ঘিরে থাকে একটা বৃহত্তর নৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন, মানুষের অনুভবকে এবং সেই সঙ্গে জনমতকে যে-আন্দোলন সক্রিয়ভাবে গঠন করে। সেই শক্তি থাকে সাহিত্যিকের, শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের, প্রকৃতি চিন্তানায়কের, সকল মহৎ সাধকের। এঁরা রাজনীতির ভৃত্য হবেন না। সারা দেশের বিবেক এবং চিত্তকে এঁরা প্রভাবিত করবেন। সেই জাগ্রত বিবেকের প্রভাব পড়বে রাজনীতির ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ, একটা সদর্থক সাংস্কৃতিক আন্দোলন রাজনীতির শোধনের পূর্বশর্ত, যদিও বলা প্রয়োজন যে, রাজনীতির শোধনই তার লক্ষ্য নয়। মনুষ্যত্বের গঠনই তার মূল লক্ষ্য।

মূল্যবোধের দুটি আধার : এক, ব্যক্তি; দ্বিতীয়, প্রতিষ্ঠান। গান্ধী অথবা রবীন্দ্রনাথের জীবনই ছিল এক একটি শিল্পকর্ম, যার ভিতর দিয়ে কিছু মূল্যবোধকে আমরা চিনে নিতে পারি। কিন্তু এই সব মূল্যকে এঁরা শুধু এঁদের ব্যক্তিগত জীবনে ও বাণীতে নয়, কিছু প্রতিষ্ঠানের ও গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়েও সাকার করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীর গঠন-মূলক কাজের কথা সবাই জানেন। রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতিতে তাঁর গঠনমূলক প্রচেষ্টা কিছু ঢাকা পড়ে গেছে। অথচ তিনি নিজে বলেছিলেন : "শিক্ষাসংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ।" (অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত চিঠি, ১৫ নভেম্বর ১৯৩৪।) অন্তত একথা স্বীকার্য যে, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনের সাধনাকে বুঝবার চেষ্টা মর্মান্তিক ভ্রম। যে সব মূল্যে এঁরা বিশ্বাসী ছিলেন, গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে তাদের রূপায়িত করতে চেয়েছেন গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। সেই প্রচেষ্টা আজ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করা প্রয়োজন। গান্ধীর সাংগঠনিক কাজের ক্ষেত্র ছিল আরো বৃহৎ। কিন্তু রবীনাথের প্রচেষ্টাতেও কোন অস্পষ্টতা ছিল না। শিক্ষা, সমবায় এবং পল্লী-সংগঠনের ক্ষেত্রে কর্মের সঙ্গে যুক্ত করে নিজস্ব চিন্তা তিনি আশ্চর্য যত্নের সঙ্গে আগ্রহী দেশবাসীর জন্য লিখে রেখে গেছেন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে যে গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা আবশ্যক, তাঁর এই বিশ্বাসকে রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনের ভিতর দিয়ে প্রচার করে গেছেন।

গঠনমূলক কাজের ক্ষেত্রে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ভিতর অনেকটা মিল ছিল। পল্লীকে সমাজসংগঠনের ভিত্তি বলে মেনে নিয়েছিলেন দুজনেই। এর মূল কারণ শুধু এই নয় যে, ভারতের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। এর অতিরিক্ত একটা আদর্শগত কারণও দুজনের চিন্তাতেই খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষের মনের একটা দিক আছে যেটা আত্মীয় ও প্রতিবেশীকে আশ্রয় করেই বাঁচতে চায়। পল্লী হল এই আত্মীয়ধর্মী গোষ্ঠী-জীবনের প্রতীক। বাস্তব পল্লীতে ভালো মন্দ অনেক কিছুই আছে; কিন্তু গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শ চিন্তায় পল্লীর এই প্রতীকী তাৎপর্যটি বুঝে নিতে হবে। 'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৪) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল।" তিনি জানতেন যে, মনের কোনো এক স্তরে মানুষকে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, তা যদি হতে না পারে তবে সে অচরিতার্থ। কিন্তু একই সঙ্গে সেই বিশ্বকে আবার মানুষ পেতে চায় ধরাছোঁওয়ার পরিধির ভিতর ছোটো এক পল্লীতে। শান্তিনিকেতনে এই আদর্শটি রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাই বিশ্বভারতীর মূলভাবটি প্রকাশ পেয়েছে সেই বিখ্যাত বাক্যে, 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেক-নীড়ম্'। বিশ্বকে চাই, কিন্তু তাকে একটি নীড়ের ভিতরও চাই। পল্লী সেই নীড়।

মানুষের অন্তর্গত আত্মীয়চেতনা যে ছোট বৃত্তের ভিতর প্রত্যক্ষ আকার ধারণ করে তারই নাম পল্লী। এইখানে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার আরম্ভ। এখানেই সমবায়ের ভিত্তি। এই সহযোগিতায় তিনটি স্তর একই সঙ্গে বর্তমান। এর কেন্দ্রে আছে ব্যক্তিমানুষ। জীবনধারণের ব্যবহারিক প্রয়োজনে ব্যক্তিমানুষ অপরের সঙ্গে সহযোগিতায় আবদ্ধ হয়, অর্থাৎ দেহের পোষণ এই সহযোগিতার প্রাথমিক লক্ষ্য। কিন্তু একই সঙ্গে ব্যক্তি নিজে যেমন কিছু লাভ করে তেমনি প্রতিবেশী সহযোগীকে কিছু দান করে। এরই ভিতর দিয়ে ঘটে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ। যাদের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সহযোগ তাদের ভিতর দিয়ে উপরন্তু বিশ্বের উদ্দেশ্যেও আমরা কিছু তর্পণ করি। সহযোগের প্রতিটি বৃত্তই বৃহত্তর কোনো বৃত্তের সঙ্গে যোগাযোগের সেতু বিশেষ। সমাজ গঠনের এটাই স্বাভাবিক নীতি। অসংখ্য পল্লী নিয়ে ক্রম-সম্প্রসারিত বৃত্তে গঠিত এক যুক্তরাজ্যে মানুষের এই বৃহৎ সমাজ। অন্তত সমাজের একটি আদর্শ রূপের সন্ধান পাই এখানে। গান্ধী এর বর্ণনা দিতে গিয়ে 'oceanic circle' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'মহামানবের সাগরতীর' কথাটি রবীন্দ্রনাথের। পল্লীর নীড় থেকে মহামানবের সাগরতীর পর্যন্ত সমাজগঠনের একটি ছবি মনে মনে রচনা করে দেওয়া যায়। গান্ধীর ভাষায় চিত্রটি এই রকম। গান্ধী লিখেছেন: "In this structure composed of innumerable villages, there will be ever-widening, never ascending circles···It will be an oceanic circle whose centre will be the individual." এখানে "never ascending" কথাটির ব্যবহার লক্ষণীয়। বৃহত্তর সংগঠন পল্লীর কাঁধে চেপে বসবে না। আবারও গান্ধীর ভাষায় ফিরে আসা যাক। গান্ধী বলেছেন: "The outermost circumference will not wield power to crush the inner circle but will give strength to all within aud derive its own strength from it." মানুষের এই যুক্তরাজ্যে প্রতিটি পল্লী এবং আত্মীয়গোষ্ঠী যেমন বৃহত্তর রাজ্যকে শক্তিদান করবে তেমনি তা থেকে শক্তি আহরণ করবে।

এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গান্ধী তাঁর প্রতিরোধ আন্দোলনের চরিত্র ও সংগঠন উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করেছেন। মানুষের সমাজকে যখন আমরা মূলত শ্রেণীবিভক্ত রূপে

দেখি তখন বলা যায় যে, শত্রুশ্রেণীর ধ্বংসই আমাদের কাম্য। কিন্তু সমাজকে যখন আমরা অসংখ্য আত্মীয়গোষ্ঠীর যুক্তরাজ্য বলে অনুভব করি তখন বৈরী গোষ্ঠীর উৎখাতের চিন্তাকে প্রাধান্য দেওয়া শুভবুদ্ধির পরিচয় বলে মেনে নেওয়া যায় না। অথচ সমাজে অন্যায় আছে, অবিচার আছে, তার প্রতিরোধের প্রয়োজনও আছে। গান্ধী প্রতিরোধের সেই পদ্ধতিই খুঁজেছেন যাতে মানুষের মৌল আত্মীয়বোধকে অক্ষুন্ন রেখেই অন্যায়ের অটল বিরোধিতা করা যায় এবং সাম্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতিরও পরিবর্তন অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু যে মূল সমস্যাটির সমাধান গান্ধী খুঁজেছেন সেটি ক্ষুদ্র স্থানে কালে আবদ্ধ নয়। নতুন সমাজ সংগঠনের পথে এটি এমন একটি মৌল প্রশ্ন যার উত্তর ভবিষ্যতের মানুষকেও নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে ক্রমাগত অন্বেষণ করতে হবে।

ব্যবহারিক প্রয়োজনে চিহ্নিত ন্যায় অন্যায় বিচারকে অতিক্রম করেও মানুষের ভিতর একটা সংবেদনশীল ঐক্যবোধ আছে। দূরের দেশে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের প্রাণনাশ হলে আমরা স্বাভাবিক বেদনা অনুভব করি, মৃতদের ভিতর কে সাধু কে চোর এই চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত হই না। পরিবারে কারো আচরণে আমরা ক্ষুন্ন অথবা বিরক্ত হলেও সেই বিরক্তিকে অতিক্রম করে একটা আত্মীয়তাবোধ এবং সদ্ভাব অব্যাহত থাকে; তাতেই আমরা মনের স্বাস্থ্যেরও পরিচয় পাই। সাংসারিক কারণে দূরে সরে গেলেও মন থেকে সেই সদ্ভাবকে আমরা সহসা বিতাড়িত করতে চাই না। বস্তুত এই সদ্ভাব অথবা শুভবুদ্ধিই নৈতিক মূল্যবোধের আশ্রয়। গান্ধী এমন একটি সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন যেখানে সমাজের মূল প্রতিষ্ঠানগুলি এই শুভবুদ্ধিকে আশ্রয় দেবে, শক্তিশালী করবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনকেও তিনি এমন পদ্ধতির ওপর স্থাপন করতে চেয়েছিলেন যাতে পদে পদে যুদ্ধের প্রয়োজনে মানবিক শুভবুদ্ধি ও মূল্যবোধকে স্থগিত রেখে চলতে হয় না। আমাদের যুগের ইতিহাস অন্তত আপাতদৃষ্টিতে এই সব ধারণার বিরুদ্ধ ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। সমাজে ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতা এমনভাবে সংগঠিত ও কেন্দ্রীভূত হয়েছে যাতে মানুষের স্বাভাবিক সংবেদনশীলতার অবক্ষয় ও বিকৃতি ঘটে। প্রতিরোধ আন্দোলনও এমন রূপ গ্রহণ করেছে যাতে সংঘবদ্ধ হিংসার শক্তি কপট নৈতিকতার সমর্থনে ভয়াবহ হয়ে ওঠে। যুগের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে গান্ধীকে তাঁর কর্মের পথ বেছে নিতে হয়েছিল। সভ্যতার সমকালীন সংকটের পরিপ্রেক্ষিতেই গান্ধী চিন্তার বিচার প্রয়োজন।

সমাজসংগঠনের পথে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সার্থকতা নিয়ে এই আলোচনা শুরু হয়েছিল। সেই আন্দোলন যখন গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় দুয়ের ভিতরই একটা বেগ সঞ্চারিত হয়। যখন এরা বিচ্ছিন্নভাবে চলে তখন দুয়ের ভিতরই একটা দুর্বলতা এবং পরিণামে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয়। তেমনি আবার রাজনীতি যখন গঠনমূলক কাজ এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তখন তার বিকার রোধ করা যায় না। গত দুই শতকের অভিজ্ঞতা থেকে একটা সমন্বয়ের পথের সন্ধান বোধ করি পাওয়া যায়। এদেশে উনিশ শতকে সংস্কৃতির রূপান্তরের চিন্তা এক রকমের প্রাধান্য পেয়েছিল। শুধু সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আশ্রয়ে কি সমাজের সুষ্ঠু পুনর্গঠন সম্ভব, প্রশ্নটা যখন এইভাবে আসে তখন তার আশাব্যঞ্জক উত্তর পাওয়া কঠিন হয়। গঠনমূলক কাজে অনেকে আত্মনিয়োগ করেছেন। শুধু গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে কি সমাজের কোনো স্থায়ী এবং বড় পরিবর্তন আনা যাবে, এ প্রশ্নেরও কোনো উৎসাহব্যঞ্জক উত্তর আশা করা যায় না। শুধু রাজনীতির

ওপর নির্ভর করে যে পথ, তার পরিণতি ঘটেছে রাজনীতিপ্রমত্ততায়। আসলে রাজনীতি, সংস্কৃতি ও গঠনমূলক কাজের ভিতর একটা সংযোগ প্রয়োজন। তার মানে এই নয় যে, সংস্কৃতি রাজনীতির প্রতিধ্বনি হবে, অথবা এ দুয়ের কোনোটি গঠনমূলক কাজের মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ হবে। এদের প্রত্যেকেরই একটা আত্মস্বাতন্ত্র্য চাই, এমন কি এদের ভিতর কিছু বিরোধ থাকাটাও আশ্চর্য নয়। তারই ভিতর দিয়ে প্রস্তুত হবে সমন্বয়ের প্রশস্ত পথ। বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যেকটিই যেখানে দুর্বল এবং অসম্পূর্ণ সংযোগের ভিতর দিয়ে সেখানে তারা সদর্থে বলশালী এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে আশাব্যঞ্জক।

জয়প্রকাশ নারায়ণ রাজনীতি ও সর্বোদয়ের কর্মপন্থা অতিক্রম করে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে 'total revolution' অথবা 'সম্পূর্ণ ক্রান্তি'র কথা বলেছিলেন। এ নিয়ে বহু বাদবিসংবাদ হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। ক্রান্তি অথবা বিপ্লব শব্দটার ভিতর বিরাট ভাঙনের পথে হঠাৎ অন্ধকার পেরিয়ে সূর্যোদয়ে পৌঁছবার একটা প্রতিশ্রুতি আছে, যেটা কারো কাছে যেমন আকর্ষক আবার কারো কাছে তেমনি প্রবঞ্চক মনে হতে পারে। কিন্তু জয়প্রকাশের প্রধান কথাটা ছিল ভিন্ন। তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, শুধু রাজনীতির দ্বারা বিপ্লব সম্পূর্ণ হবে না, সমাজের সার্থক রূপান্তর সম্ভব হবে না ; শুধু অর্থনৈতিক অথবা গঠনমূলক কাজের সাহায্যেও সেটা সম্ভব নয় ; আ'র শুধু সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক আন্দোলনের পথেও নয়। এ সবই বিচ্ছিন্নভাবে অপূর্ণ ; এদের যুক্ত করতে পারলে তবেই সম্পূর্ণতা। তাঁর বিচিত্র ও ঘটনাবহুল জীবন ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে জয়প্রকাশ এই যে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন সেটা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনার যোগ্য। মার্কসবাদ অতিক্রম করে তিনি এসেছিলেন গান্ধীবাদে গান্ধীবাদীদের ভিতরও তিনি গতানুগতিক ছিলেন না, বরং তাঁকে ব্যতিক্রমী বললেই উপযুক্ত হবে। বস্তুত তিনি এই বিশ্বাসেই উপনীত হয়েছিলেন যে, বিশেষ কোনো দল অথবা মতবাদের কাছেই বিবেকবান মানুষের শেষ আনুগত্য অর্পিত নয়। তাঁর আনুগত্য সেই মূল্যবোধের কাছে, বিশেষ দল অথবা সম্প্রদায়, অথবা আনুষ্ঠানিক মতবাদের ঊর্ধ্বে যার স্থান। আধুনিক মন এই রকম একটা কথা ধর্মের ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছে। একথা যদি ধর্মপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সত্য হয় তবে প্রতিষ্ঠিত রাজনীতির ক্ষেত্রেও সত্য না হবার কারণ নেই।

সমাজসংগঠনের একটি মূল নীতি আগে আলোচিত হয়েছে। বৃহত্তর সমাজের ভিত্তিতে থাকবে আত্মীয়সমাজ, প্রতিবেশীসমাজ, বান্ধবসমিতি। এই প্রতিবেশী সমাজের উদ্দেশ্য একদিকে যেমন পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর দিয়ে সংসারের প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদন, অন্যদিকে তেমনি মনের সঙ্গে মনের যোগের সাহায্যে আনন্দের ক্ষেত্র রচনা। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সমবায়ের সাহায্যে এইসব মৌল সমিতিকে শক্তিশালী করা গঠনমূলক কাজের প্রধান লক্ষ্য। আমাদের ঐতিহ্যের ভিতর এই সব কাজের যেমন সহায়ক শক্তি আছে, তেমনি প্রতিবন্ধক শক্তিও আছে। এদেশের পল্লী জাতিতে জাতিতে বিভক্ত। জাতিপাঁতিকে অতিক্রম করে আমাদের কল্যাণমূলক চিন্তা ও প্রচেষ্টা বেশীদূর অগ্রসর হয় না। একে ভাঙবার জন্য প্রয়োজন নতুন সংস্কৃতি, সামাজিক সমালোচনায় দিগ্‌দর্শী আন্দোলন। এটা অবশ্য উদাহরণমাত্র। গঠনমূলক কাজ আর সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ভিতর যোগের কথাটাই আসল। এদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে প্রধানত শহরে। আজ দেশময় গ্রামে গ্রামে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের ভিতর নির্দয় সংঘর্ষ। জাতিকে অতিক্রম করে পল্লীতে এক অখণ্ড প্রতিবেশীসমাজ সৃষ্টি করা যাবে না গঠনমূলক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নবদিগন্ত উন্মোচনকারী প্রচেষ্টা ছাড়া। এরই সঙ্গে রাজনীতিও এসে যায়। সমাজে ক্ষমতার একটা বিভাগ ও বিন্যাস আছে। সমাজসংগঠনের পরিবর্তন

ঘটাতে গেলে ক্ষমতার এই বিন্যাসেরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আজ যারা ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত, কাল তারাই যখন সমাজের পরিচালনায় অংশ নিতে চায় তখন প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার পক্ষ থেকে বাধা আসে। সত্যাগ্রহ ছাড়া সর্বোদয় সম্পূর্ণ হয় না। এমনি করে রাজনীতি, সংস্কৃতি ও গঠনমূলক কাজ পরস্পর যুক্ত হয়ে পড়ে। এখানেই একটা সমগ্রতা ও সামঞ্জস্য প্রয়োজন, যার অভাবে আমাদের প্রতিটি খণ্ডপ্রচেষ্টা দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ে।

আমরা সবাই সব কাজে থাকব এমন নয়। কিন্তু সমাজের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সব এসে যুক্ত হয়। আমরা যে যেখানে আছি সেখানেই নিজ নিজ সীমাবদ্ধ ভূমিকা রচনা করে নিতে পারি। তবু মননের ধর্ম এই যে, সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত করে খণ্ড খণ্ড প্রয়াসেরও সে অর্থ খুঁজে নেয়, অসম্পূর্ণতা আবিষ্কার করে, সংশোধক নবচিন্তার জন্ম দেয়। শুধু রাজনীতি দিয়ে দেশকে হঠাৎ উদ্ধার করা যাবে, এটা একরকম যাদুতে বিশ্বাস, এতে মননের শক্তি নেই। সাংস্কৃতিক ও গঠনমূলক কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোনো বৈজ্ঞানিক অথবা নৈতিক রাজনীতি সম্ভব নয়। সমাজসংগঠনের কার্যক্রম পদে পদে বদলে চলে; কোনো পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা আগে থেকে রচনা করা যায় না। কিন্তু একটা দিশাবোধ ও সামঞ্জস্যচেতনা সব সময়েই প্রয়োজন।*

* বিগত ২৫ ভাদ্র, ১৩৮৯ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত ১৩৮৮ বঙ্গাব্দের 'নির্মলকুমার বসু স্মারক-বক্তৃতা'।

আচার্য আনন্দবর্ধন ও কাব্যনয়

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

'ধ্বন্যালোক' নিবন্ধের অন্তিম শ্লোকে আচায আনন্দবর্ধন বলেছেন—

'সৎকাব্যতত্ত্বনয়বর্ত্ম চিরপ্রসুপ্ত-
কল্পং মনঃসু পরিপক্বধিয়াং যদাসীৎ।
তদ্ব্যাকরোৎ সহৃদয়োদয়লাভহেতো-
রানন্দবর্ধন ইতি প্রথিতাভিধানঃ ॥'১

১

এই শ্লোকটি থেকে জানতে পারা যায় যে আনন্দবর্ধন যে অভিনব কাব্যনয় বা Theory of Poetry প্রবর্তন ক'রেছেন, তা তাঁর মতে পরিণত প্রজ্ঞা সহৃদয়সমাজে কাব্যবিচারের সাধুসেবিত পন্থা ব'লে সমাদৃত হ'য়ে আসছিল, শুধু সাধারণ কাব্যরসিকগণের মধ্যে তার ব্যাপক প্রচার ঘটেনি, তা ছিল 'প্রসুপ্তকল্প'। আনন্দবর্ধনের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি সেই প্রসুপ্তকল্প কাব্যনয়কে নানা যুক্তি, উদাহরণ ও বিশ্লেষণের সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। ধ্বন্যালোকের প্রারম্ভিক কারিকাতেও আনন্দবর্ধন সেই একই ইঙ্গিত ক'রেছেন—'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃ সমাম্নাতপূর্বঃ' এই উক্তির মধ্যে। 'সমাম্নাতপূর্বঃ' এই পদটির ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার বলেছেন—'পরম্পরায়া যঃ সমাম্নাতপূর্বঃ সম্যক্ আ সমন্তাৎ ম্নাতঃ প্রকটিতঃ' এবং আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁর 'লোচন' টীকায় কারিকাকারের অভিপ্রায় আরও স্পষ্ট করে বিবৃত করেছেন—"অবিচ্ছিন্নেন প্রবাহেণ তৈরেতদুক্তং বিনাঽপি বিশিষ্টপুস্তকেষু বিনিবেশনাদ্ ইত্যভিপ্রায়ঃ।" (ঐ, পৃ. ১১)। অভিনবগুপ্তের এই মন্তব্য থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, আনন্দবর্ধন যে অভিনব কাব্যতত্ত্ব গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করেন, তা সুদীর্ঘ কাল ধরে অবিচ্ছিন্ন পরম্পরাক্রমে বিদগ্ধ রসিকসমাজে সুপরিজ্ঞাত ছিল, যদিও স্বতন্ত্র বিশিষ্ট গ্রন্থাকারে তা প্রচারিত হয় নি।

২

কী সেই তত্ত্ব যাকে প্রতিপাদন করার জন্য আনন্দবর্ধন এই স্বতন্ত্র গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হ'লেন ? এই তত্ত্বটি হল 'ধ্বনি'। ধ্বনি শব্দটি যদিও লোকব্যবহারে সুপরিচিত, তবু এর একটি পরিভাষিক অর্থ আছে। দার্শনিক সম্প্রদায়ে 'শব্দ'কে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—'ধ্বনি' এবং 'বর্ণ'। মৃদঙ্গ, মেঘ প্রভৃতির যে 'শব্দ' তাকে বলা হয় 'ধ্বনি', 'মৃদঙ্গধ্বনি' 'মেঘধ্বনি'। কিন্তু তালু প্রভৃতি উচ্চারণ স্থান থেকে যে শব্দের উদ্ভব, তাকে বলা হয় 'বর্ণ'। বর্ণাত্মক শব্দ 'ব্যক্তবাক্' প্রাণীদের ক্ষেত্রেই সম্ভব। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের পরিকল্পিত শব্দের এই দ্বৈতরূপের সঙ্গে পাণিনীয় সম্প্রদায়ের বৈয়াকরণ আচার্যগণের পরিকল্পিত শব্দরূপের প্রভেদ আছে। তাঁরা 'শব্দ' বলতে বুঝে থাকেন এমন কোনও বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি, যা' থেকে কোনও অর্থের বোধ হ'য়ে থাকে। মহাভাষ্যকার আচার্য পতঞ্জলি শব্দের লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন—"অথবা প্রতীতপদার্থকো লোকে ধ্বনিঃ শব্দ ইত্যুচ্যতে।" লোকব্যবহারে সেই ধ্বনিকেই 'শব্দ' বলা হয়ে থাকে, যার থেকে কোনো

---

১ ধ্বন্যালোক ৪, পৃ. ৫৫২-৩ (কাশী সংস্করণ)

পদার্থের প্রতীতি ঘটে থাকে। কিন্তু কণ্ঠ তালু প্রভৃতি উচ্চারণস্থানের অভিঘাতের ফলে যে সব ধ্বনির উদ্ভব হয়, তারা সাক্ষাৎভাবে কোনও অর্থ বোঝাতে পারে না। কেননা, তারা ক্ষণিক, ক্রমভাবী। সুতরাং তাদের সমাহার কিভাবে সম্ভব হবে? তাই মহর্ষি পতঞ্জলি এবং তাঁর অনুবর্তী ভর্তৃহরি প্রমুখ বৈয়াকরণ সম্প্রদায় ধ্বনি এবং শব্দ—এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করে থাকেন। শব্দ বলতে তাঁরা 'স্ফোট'-কে বুঝিয়ে থাকেন—কেননা 'স্ফোট' অখণ্ড নিত্য, অক্রম এবং সেই কারণেই অর্থের বোধক। আর 'ধ্বনি' সেই স্ফোটের অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক। তাই মহাভাষ্যকার বলেছেন—'স্ফোটঃ শব্দঃ। ধ্বনিঃ শব্দগুণঃ।' স্ফোট ব্যঙ্গ্য, ধ্বনি ব্যঞ্জক। এবং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব। আচার্য আনন্দবর্ধন বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের পারিভাষিক ধ্বনিতত্ত্বটিকে সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে আশ্রয় ক'রে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে এক নতুন যুগের প্রবর্তন করেছেন। কীভাবে তা করেছেন, তা আমরা বোঝবার চেষ্টা করব।

৩

আচার্য আনন্দবর্ধন ধ্বনির লক্ষণ করতে গিয়ে বৈয়াকরণদের ধ্বনিতত্ত্ব ও স্ফোটবাদের অতি স্পষ্টভাবেই উল্লেখ ক'রেছেন—"সূরিভিঃ কথিত ইতি বিদ্বদুপজ্ঞেয়মুক্তিঃ, ন তু যথা-কথঞ্চিৎ প্রবৃত্তেতি প্রতিপাদ্যতে। প্রথমে হি বিদ্বাংসো বৈয়াকরণা ব্যাকরণমূলত্বাৎ সর্ব-বিদ্যানাম্। তে চ শ্রূয়মাণেষু বর্ণেষু ধ্বনিরিতি ব্যবহরন্তি। তথৈবান্যৈস্তন্মতানুসারিভিঃ সূরিভিঃ কাব্যতত্ত্বার্থদর্শিভিঃ বাচ্যবাচকসম্মিশ্রঃ শব্দাত্মা কাব্যমিতি ব্যপদেশ্যো ব্যঞ্জকত্ব-সাম্যাদ্ধ্বনিরিত্যুক্তঃ।"[ধ্বন্যালোক, ১.১৩ কারিকায় বৃত্তি পৃ. ১৩২-৩৫]। এখানে আনন্দবর্ধন দ্বিধাহীনভাবে বৈয়াকরণদের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। বৈয়াকরণদের মতে যেমন শ্রূয়মাণ ক্ষণিক বর্ণরাজির দ্বারা অর্থবোধক, নিত্য, অখণ্ড স্ফোটরূপ শব্দের অভিব্যক্তি হয়ে থাকে, ধ্বনিবাদীদের মতেও ঠিক অনুরূপভাবেই শব্দার্থময় কাব্যের দ্বারা নিগূঢ় প্রতীয়মান অর্থের অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। ক্ষণিক ক্রমভাবী বর্ণের যেমন স্ফোটের অভিব্যক্তি-সাধনেই সার্থকতা ও বিশ্রান্তি, কাব্যের ক্ষেত্রেও বাচ্য অর্থ ও বাচক শব্দ - যা পাঠক মাত্রেরই বোধগম্য, তার দ্বারা কবির পরম অভীষ্ট অন্তর্নিগূঢ় প্রতীয়মান অর্থের অভি-ব্যক্তিতেই পরম তাৎপর্য ও আত্যন্তিক চরিতার্থতা। এইভাবেই ধ্বনিকার বৈয়াকরণ স্ফোটবাদের সঙ্গে সাহিত্যিক ধ্বনিবাদের সাদৃশ্য স্থাপন করেছেন। ধ্বন্যালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতের বৃত্তিগ্রন্থেও আনন্দবর্ধন যেভাবে বৈয়াকরণ আচার্যগণের নিকট তাঁর ঋণ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, তার দ্বারা তাঁর চিত্তের ঔদার্য ও মহিমা অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—"পরিনিশ্চিতনিরপভ্রংশশব্দব্রহ্মণাং বিপশ্চিতাং মতমাশ্রিত্যৈব প্রবৃত্তোঽয়ং ধ্বনি-ব্যবহার ইতি তৈঃ সহ কিং বিরোধাবিরোধৌ চিন্ত্যেতে।" [ধ্বন্যালোক, ৩.৩৩ বৃত্তি, পৃ. ৪৪৩-৪৪]।

আচার্য আনন্দবর্ধন তাঁর 'ধ্বন্যালোক' নামক নিবন্ধে যে অভিনব কাব্যনয় ব্যবস্থাপন করলেন তার মূল ভিত্তি এই ধ্বনিবাদ। তবে 'ধ্বনি' শব্দটির অর্থ (connotation) কিছুটা বিস্তৃতি লাভ করেছে—আনন্দবর্ধনের প্রয়োগে। আনন্দবর্ধন 'ধ্বনি' শব্দটিকে শুধু বৈয়া-করণদের মত 'ব্যঞ্জক' শব্দ বা অর্থ বোঝাবার জন্যেই ব্যবহার করেন নি। তিনি প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঙ্গ্য অর্থ (suggestd mening) যা' শব্দের বাচ্য অর্থ বা primary meaning থেকে অত্যন্ত বিলক্ষণ, তাকে বোঝাবার জন্যেও শব্দটি প্রয়োগ করেছেন তাছাড়া শব্দ ও অর্থের যে ব্যাপার বা function-এর সাহায্যে সেই প্রতীয়মান অর্থের বোধ সম্ভব হয়ে থাকে, সেই ব্যাপারকেও 'ধ্বনি' এই সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত করেছেন। আবার

শব্দ, বাচ্য অর্থ, প্রতীয়মানার্থ, ব্যাপার—এই সকলের সমাবেশ যে কবিকর্মে সংঘটিত হ'য়ে থাকে সেই কাব্যকেও 'ধ্বনি' এই সংজ্ঞার দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং বাচক শব্দ, বাচ্য অর্থ, ব্যঞ্জনা ব্যাপার, প্রতীয়মান অর্থ এবং সমুদায়াত্মক কাব্য—এ সবই একক ভাবেই হোক বা সম্মিলিত ভাবেই হোক 'ধ্বনি' এই পরিভাষিক সংজ্ঞার দ্বারা বোধিত হয়ে থাকে। আনন্দবর্ধনই তাঁর লোকাতিশায়িনী মনীষার সাহায্যে বৈয়াকরণ আচার্যগণের দ্বারা ব্যবহৃত পরিভাষিক 'ধ্বনি' শব্দটির অর্থকে এইভাবে ব্যাপক ও গভীর করে তুলে তার মধ্যে নূতন মর্যাদা যোজনা করেছেন। [দ্র°ধ্বন্যালোক, ১ম উদ্দ্যোত, পৃ. ১৩৩-৩৫ ও তদুপরি লোচন টীকা।]

৪

আচার্য আনন্দবর্ধন তাঁর এই নূতন কাব্যতত্ত্ব প্রতিপাদন প্রসঙ্গে শব্দের দ্বিবিধ অর্থ স্বীকার করেছেন—যাকে তিনি 'বাচ্য' এবং 'প্রতীয়মান' এই দুই নামে অভিহিত করেছেন। বাচ্য অর্থ শব্দের মুখ্য অর্থ, শব্দ শোনামাত্রই সেই অর্থের বোধ হয়ে থাকে, শুধু শব্দ ও অর্থের সংকেতজ্ঞান থাকলেই সেই বাচ্যার্থের প্রতীতি ঘটতে পারে। ব্যাকরণ ও অভিধান—এই দুয়ের সঙ্গে পরিচয় থাকলেই প্রতিপত্তার পক্ষে কোনও বাক্য শ্রবণমাত্রই তার বাচ্যার্থবোধের পক্ষে কোনও বাধা থাকে না। কিন্তু দ্বিতীয় যে অর্থ, যাকে 'প্রতীয়মান' বলা হয়, তার বোধ হতে গেলে শুধুই শব্দার্থশাসনজ্ঞানই পর্যাপ্ত নয়। তার জন্য প্রয়োজন সহৃদয়ত্ব, রসজ্ঞতা, যা প্রতিভাসাপেক্ষ। কবিং কাব্যরচনার জন্য যেমন প্রয়োজন প্রতিভার, কাব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, তার নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধির জন্যও দরকার প্রতিভার। কবির কাব্যসৃষ্টির অনুকূল প্রতিভাকে যদি বলা যায় 'কারয়িত্রী প্রতিভা', তবে সহৃদয়ের কাব্যরসাস্বাদের অনুকূল প্রতিভাকে বলতে হয় 'ভাবয়িত্রী প্রতিভা'। কবি ও সহৃদয় দুজনেই প্রতিভাবান্, তবে প্রতিভার স্বরূপ উভয়ের ক্ষেত্রে বিলক্ষণ। বাচ্য অর্থ বোধের জন্য কোনও প্রতিভার অপেক্ষা থাকে না, কিন্তু প্রতীয়মানার্থবোধ প্রতিভাসাপেক্ষ। তাই আনন্দবর্ধন সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন—

"শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেণৈব ন বেদ্যতে।
বেদ্যতে সতু কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম্॥"

বাচ্যার্থ ও বাচক শব্দ কাব্যের শরীরস্থানীয়। কিন্তু প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গ্য অর্থ কাব্যসৌন্দর্যের আকরস্বরূপ, যেমন নারীদেহের লাবণ্য। নারীর দেহ যতই নির্দোষ, যতই অলঙ্কারমণ্ডিত হোক না কেন, যদি তা লাবণ্যহীন হয়, তবে যেমন তা কখনও দর্শকের মনোরঞ্জন করতে পারে না, তেমনি কাব্যশরীর যতই দোষহীন, যতই উপমা অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিত হোক না কেন, তা কখনই সহৃদয় কাব্যতত্ত্বজ্ঞ বোদ্ধার হৃদয়ের তৃপ্তিবিধান করতে পারে না। আনন্দবর্ধনের কথায়—

"প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু॥"

এমনকি কাব্যদেহ দোষদুষ্ট হলেও, সম্পূর্ণ অলংকারবিরহিত হলেও প্রতীয়মানার্থের স্পর্শ যদি তাতে থাকে, তবে তা যথার্থ সহৃদয়ের চিত্তে অলৌকিক আনন্দবিধানে সমর্থ হতে পারে। সুতরাং প্রতীয়মানার্থই কাব্যের প্রাণস্বরূপ। ধ্বনিকার সেই কারণেই ধ্বন্যালোকের প্রারম্ভিক শ্লোকে ঘোষণা করেছেন—'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃ সমাম্নাতপূর্বঃ।' সুতরাং প্রকৃত কাব্যে এই দু'রকম অর্থই ওতপ্রোতভাবে মিলিত হয়ে থাকে। আনন্দবর্ধন সেই কারণেই সহৃদয় শ্লাঘ্য অর্থের বাচ্য ও প্রতীয়মানরূপে ভেদদ্বয় স্বীকার ক'রে ব'লেছেন—

'যোঽর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যঃ কাব্যাত্মেতি ব্যবস্থিতঃ।
বাচ্য-প্রতীয়মানাখ্যৌ তস্য ভেদাবুভৌ স্মৃতৌ॥"

বাচ্য অর্থ ভিত্তিস্থানীয়, তারই ওপর প্রতীয়মান অর্থ প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে। বাচ্যার্থকে বাদ দিয়ে কখন কোনও কবির পক্ষে প্রতীয়মান ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতির উদ্রেক করা একেবারেই সম্ভব নয়। কিন্তু বাচ্য অর্থ তাই বলে কখনও প্রধান বলে স্বীকৃত হতে পারে না। বাচ্যার্থবোধ যদিও প্রথমে ঘটে থাকে, এবং তার পরেই প্রতীয়মান অর্থের বোধ জন্মে থাকে, তবুও এই প্রতীতির প্রাথম্য বাচ্যার্থের প্রাধান্যের সূচক হতে পারে না। কেননা কবি যেমন বাচ্যার্থপ্রতীতিকে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রতীতির উপায়রূপেই স্বীকার করে থাকেন, ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতিসাধনই যেমন কবির কাব্যরচনার চরম লক্ষ্য, ঠিক একই ভাবে সহৃদয় বোদ্ধার দৃষ্টিতেও বাচ্যার্থপ্রতীতি ব্যঙ্গ্যার্থপ্রতীতির সহায়ক মাত্র, ব্যঙ্গ্যার্থের উপলব্ধিতেই সহৃদয়ের প্রতীতিপর্যবসান ঘটে থাকে, প্রতীয়মান অর্থের বোধেই সহৃদয়ের কাব্যচর্বণার পরম বিশ্রান্তি। অতএব কবি ও সহৃদয় উভয়ের দিক থেকেই প্রতীয়মান অর্থের প্রাধান্য যুক্তি ও অনুভবসিদ্ধ। আলোকার্থী পুরুষ যেমন আলোক লাভের উপায়রূপে দীপশিখার প্রতি অভিনিবিষ্ট হ'য়ে থাকে, ঠিক্ সেইমতই প্রতীয়মান অর্থ বিষয়ে উৎসুক কবি ও সহৃদয় বাচ্যার্থ বিষয়ে আগ্রহ প্রদর্শন ক'রে থাকে—

"আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবান্ জনঃ।
তদুপায়তয়া তদ্বদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ ॥"

—এই ধ্বনিকারিকাটিতে আচার্য আনন্দবর্ধন দীপশিখা ও আলোকের দৃষ্টান্তের সাহায্যে বাচ্যার্থ ও প্রতীয়মান অর্থের মধ্যে পরস্পর উপায়-উপেয়ভাব সম্বন্ধ খ্যাপন করেছেন।

বাচ্য ও প্রতীয়মানের মধ্যে পরস্পর বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন প্রসঙ্গে আচার্য আনন্দবর্ধন অন্যান্য বহু যুক্তিও উপস্থাপন করেছেন। যেমন, বাচ্য যেখানে বিধিরূপ প্রতীয়মান সেখানে নিষেধরূপ, বাচ্য যেখানে এক ও অভিন্ন প্রতীয়মান সেখানে দেশভেদে, কালভেদে, প্রতিপত্তৃপুরুষভেদে নানাপ্রকার, বাচ্যার্থের প্রতীতির আশ্রয় এবং প্রতীয়মানার্থ প্রতীতির আশ্রয়ও ভিন্ন ভিন্ন। এইভাবে উভয় অর্থের নানা বিরুদ্ধ ধর্ম যেখানে সহৃদয়-মাত্রেরই অনুভবগোচর, সেখানে বাচ্যার্থ ও প্রতীয়মানার্থের অভেদকল্পনার পক্ষে কোনও যুক্তিই থাকতে পারে না। কেননা বিরুদ্ধধর্মাধ্যাসই পদার্থের ভেদ বা ভেদহেতু বলে দার্শনিক আচার্যগণ স্বীকার করে থাকেন—"অয়মেব হি ভেদো ভেদহেতুর্বা যদ্ বিরুদ্ধধর্মাধ্যাসঃ কারণভেদশ্চ"। 'সাহিত্যদর্পণ'-প্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজ ধ্বনিকারকে অনুসরণ ক'রেই বাচ্যার্থ ও প্রতীয়মানার্থের ভেদক ধর্মগুলিকে একটি কারিকায় সংগৃহীত করে বলেছেন—

"বোদ্ধৃ-স্বরূপ-সংখ্যা-নিমিত্ত-কার্য-প্রতীতিকালানাম্।
আশ্রয়-বিষয়াদীনাং ভেদাদ্ ভিন্নোঽভিধেয়তো ব্যঙ্গ্যঃ ॥"

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে: অতি প্রাচীন কাল থেকেই ত সাহিত্য-মীমাংসক সম্প্রদায় নানাভাবে কাব্যের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে এসেছেন। তাঁরা কাব্যের সৌন্দর্য কিভাবে সাধিত হয়ে থাকে, তার কারণ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করেছেন। কেউ গুণকে, কেউ অলংকারকে, কেউ লক্ষণকে, কেউ বা শয্যা বা পাককে, আবার কেউ রীতি বা বৃত্তিকে কাব্যসৌন্দর্যের নিদান বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু আনন্দবর্ধনের পূর্বে আর কোনও আলংকারিকই 'ধ্বনি' বলে কোনও তত্ত্ব স্বীকার করেন নি, বা তাকে কাব্যের আত্মা বলেও নির্দেশ করেন নি। অতএব আনন্দবর্ধনের ধ্বনিতত্ত্বের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই নানা দিক্ দিয়ে আক্রমণ হতে লাগলো। কেউ বলতে লাগলেন 'ধ্বনি' বলে

কোনও তত্ত্বই স্বীকার করা সম্ভব নয়, বা তার প্রয়োজনও নেই। এঁদের বলা হয় 'ধ্বন্যভাববাদী'। আর এক দল বললেন : ধ্বনি ব'লে যদি কোনও তত্ত্ব স্বীকার করাও হয়, তবে তাকে ভক্তি বা গুণবৃত্তিরূপ শব্দের যে ঔপচারিক প্রয়োগ বা secondary usage, তার মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব। কেননা শব্দের দুরকম অর্থ সকল সম্প্রদায়ের দার্শনিক ও কাব্যবিচারক একবাক্যে স্বীকার করে থাকেন। (১) তা হ'লো মুখ্য বা অভিধেয় অর্থ, ইংরাজীতে যাকে primary meaning বলা যেতে পারে। (২) তাছাড়া বাচ্যব্যতিরিক্ত যাবতীয় অর্থের কাব্যের থেকে বোধ হ'য়ে থাকে, তা যেহেতু মুখ্য নয়, সেহেতু তাকে গৌণ বা অমুখ্য অর্থ বলা যায়। মুখ্য অর্থ বোধের জন্য শব্দের অভিধা শক্তি স্বীকার করা হয়, আর মুখ্যাতিরিক্ত গৌণ অর্থ বোধের জন্য যে শক্তি বা ব্যাপার স্বীকার করা হয়ে থাকে, তাকে বলা হয় গৌণী, বা লক্ষণা বা ভক্তি বা গুণবৃত্তি সুতরাং ধ্বনিকার যাকে 'প্রতীয়মান' বা 'ব্যঙ্গ্য' অর্থ বলে নির্দেশ করেছেন, তা যখন বাচ্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সেইহেতু লক্ষণা বা ভক্তির দ্বারাই তার বোধ হওয়া সম্ভব অতএব প্রতীয়মান অর্থ প্রকৃত পক্ষে অমুখ্য বা ভাক্ত বা লাক্ষণিক বা গৌণ অর্থই। তার স্বতন্ত্র কোন মর্যাদা থাকতে পারে না। এবং সেই প্রতীয়মান অর্থকে বোঝাবার জন্য ধ্বনিকার যে তৃতীয় এক ব্যাপার স্বীকার ক'রেছেন, তারও কোনও যুক্তি নেই। এই মতকে 'ভাক্তবাদ' বলে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। আর এক সম্প্রদায়ের বিরোধী আলংকারিক আছেন, তাঁরা বলেন: ধ্বনি বা প্রতীয়মান অর্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, একথা মেনে নিলেও তার লক্ষণ নিরূপণ করা বা তার স্বরূপ নিঃশেষে ব্যাখ্যা করে সহৃদয়সমাজে বুঝিয়ে দেওয়া অসম্ভব। তা শুধুই যথার্থ কাব্যজ্ঞ সহৃদয়ের অনুভববেদ্য, ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য। এই তৃতীয় বিরোধী সম্প্রদায়ের মতবাদ 'অনির্বচনীয়বাদ' বলে পরিচিত। আনন্দবর্ধন ধ্বনিবিরোধী এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ের উল্লেখ ক'রেছেন 'ধ্বন্যালোকে'র প্রথম কারিকটিতেই -

> "কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃ সমাম্নাতপূর্ব-
> স্তস্যাভাবং জগদুরপরে ভাক্তমাহুস্তমন্যে।
> কেচিদ্ বাচাং স্থিতমবিষয়ে তত্ত্বমূচুস্তদীয়ং
> তেন ব্রূমঃ সহৃদয়মনঃপ্রীতয়ে তৎস্বরূপম্ ॥"

আনন্দবর্ধনের সমকালীন মনোরথ নামে এক কবিও ধ্বনিবাদের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ করে যে শ্লোক রচনা করেছিলেন, আনন্দবর্ধন তাও তাঁর বৃত্তিগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। শ্লোকটি বিশেষভাবে স্মরণীয়—

> "যস্মিন্নস্তি ন বস্তু কিঞ্চন মনঃপ্রহ্লাদি সালংকৃতি
> ব্যুৎপন্নৈরচিতং চ যন্ন বচনৈর্বক্রোক্তিশূন্যং চ যৎ।
> কাব্যং তদ্ধ্বনিনা সমন্বিতমিতি প্রীত্যা প্রশংসঞ্জড়ো
> নো বিদ্মোঽভিদধাতি কি সুমতিনা পৃষ্টঃ স্বরূপং ধ্বনেঃ ॥"

"যে রচনাতে কোনো মনোহারী অর্থ নেই, নেই কোনও অলংকার, যার মধ্যে এমন কোনও উক্তিবৈচিত্র্য নেই যাতে রচয়িতার ব্যুৎপত্তি সূচিত হ'তে পারে, যা সর্ববিধ বক্রোক্তি-বিরহিত—এমন রচনাকে 'ধ্বনি' ব'লে যাঁরা আনন্দবিহ্বল হয়ে প্রশংসা করে থাকেন, সেইসব জড়বুদ্ধি লোককে 'ধ্বনির স্বরূপ কী' এই বিষয়ে যদি প্রশ্ন করা হয়, তবে তাঁরা যে কী উত্তর দেবেন তা জানিনা।"

৬

আনন্দবর্ধন যেহেতু প্রতীয়মান অর্থকেই কাব্যের সারভূততত্ত্ব বলে মনে করতেন, সেই কারণে তিনি প্রতীয়মান অর্থের বিচিত্র ভেদ, তাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক, বাচ্যের সঙ্গে প্রতীয়মান অর্থের গুণপ্রধানভাবরূপে সম্বন্ধ—এই সব মৌলিক প্রশ্ন নিয়েই ধ্বন্যালোকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ক'রেছেন। বাচ্যার্থের স্বরূপ, বাচ্যার্থের শোভাহেতু অলংকার, প্রাচীন-সম্মত গুণ, বৃত্তি, রীতি প্রভৃতির বিচার, কিংবা বাচক শব্দ বা বর্ণপদাদির বিচিত্র সন্নিবেশ-জনিত উপনাগরিকা, গ্রাম্যা, পরুষা প্রভৃতি বৃত্তি সম্পর্কে আলোচনা তাঁর দৃষ্টিকে কিছুতেই প্রলুব্ধ বা বিভ্রান্ত করতে পারে নি। আনন্দবর্ধন স্পষ্ট করেই বাচ্য-বাচকনিষ্ঠ এই সব বহিরঙ্গ ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অনীহা ও ঔদাসীন্যের কথা জানিয়ে দিয়েছেন—

"তত্র বাচ্যঃ প্রসিদ্ধো যঃ প্রকারৈরুপমাদিভিঃ।
বহুধা ব্যাকৃতঃ সোঽন্যৈস্ততো নেহ প্রতন্যতে॥"

তবে তিনি যে গুণ, বৃত্তি, রীতি, অলংকার, সংঘটনা প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যসম্মত বিভিন্ন তত্ত্বকে তাঁর কাব্যবিচারে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করেছেন, তাও বলা যায় না। কেননা যখন যে বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে তাঁর মনে হ'য়েছে, তখনই প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি চিরন্তন কাব্যমীমাংসকদের দ্বারা স্বীকৃত বৃত্তি, রীতি, অলংকার প্রভৃতি কাব্যের সম্প্রদায়ক্রমাগত তত্ত্বগুলিকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্বের সঙ্গে সমীক্ষা করেছেন। তবে সর্বত্রই তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিতে তিনি বিন্দুমাত্র বিস্মৃত হন নি। বাচ্য-বাচকনিষ্ঠ বৃত্তি, অলংকার প্রভৃতি কাব্যশোভাহেতু ধর্মের উপযোগিতা ও মূল্য বিচার করতে গিয়ে প্রতীয়মান অর্থের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককেই তিনি চরম নিকষোপল বলে গ্রহণ করতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নি। এইভাবে আনন্দবর্ধন প্রাচীন আলংকারিকদের চিরাচরিত কাব্যবিচারপদ্ধতিকে একটি সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত করলেন, যা ছিল বাচ্য-বাচক-কেন্দ্রিক তা তাঁর হাতে হয়ে উঠল প্রতীয়মান কেন্দ্রিক, যা ছিল লোকায়তিক দৃষ্টিভঙ্গীর মত শরীরমাত্রনিবদ্ধ তাকে তিনি ভাববাদী দার্শনিকদের মত অধ্যাত্মদৃষ্টির সাহায্যে উদ্ভাসিত করে তুললেন। দৃষ্টিভঙ্গীর এই আমূল পরিবর্তন ভারতীয় কাব্যমীমাংসার ইতিহাসে Copernican Revolution-এর সঙ্গে তুলনীয়।

কিন্তু একটা কথা ভুললে চলবে না। যদিও আনন্দবর্ধন প্রতীয়মান অর্থের প্রাধান্য দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, তা হলেও শব্দার্থময় কাব্যশরীরের প্রতি তিনি একেবারেই উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নি। যেমন, আত্মা যদিও সর্বত্র বিরাজমান, নিত্য, বিভু, কিন্তু তা হলেও সকল পদার্থেই 'জীব' ব্যবহার হয় না, বিভিন্ন অবয়বের সামঞ্জস্যপূর্ণ সুশৃঙ্খল সন্নিবেশ যে পদার্থের মধ্যে লক্ষিত হয়ে থাকে, তাতেই যদি আত্মার অধিষ্ঠান হয়, তবে যেমন তাকে 'জীব' শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হয়, অন্যথা নয় ঠিক্ সেইরকমভাবেই লোক-ব্যবহারে, শাস্ত্রে, ইতিহাসে, পুরাণে সর্বত্রই যদিও শব্দ ও অর্থের অবস্থান অবিচ্ছেদ্য, তা' সত্ত্বেও সেই সব বাক্যকে 'কাব্য' বলে নির্দেশ করা সম্ভব নয়। কেননা, যদি কোনও না কোনও প্রতীয়মান অর্থের সদ্ভাব সেখানে কল্পনা করাও হয়, তা হলেও শব্দ ও অর্থের বিশিষ্ট সন্নিবেশজনিত চারুতা সেই প্রতীয়মান অর্থকে বিশেষিত করে নি। এই প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধনের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'লোচন'-কার অভিনবগুপ্ত যে মন্তব্য করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য—

"নন্বেবং 'সিংহো বটুঃ' ইত্যত্রাপি কাব্যরূপতা স্যাৎ; ধ্বননলক্ষণস্যাত্মনোঽত্রাপি

সমনন্তরং বক্ষ্যমাণতয়া ভাবাৎ। ননু ঘটেঽপি জীবব্যবহারঃ স্যাৎ, আত্মনো বিভুত্বেন তত্রাপি ভাবাৎ। শরীরস্য খলু বিশিষ্টাধিষ্ঠানযুক্তস্য সত্যাত্মনি জীবব্যবহারঃ, ন যস্য কস্যচিদিতি চেৎ—গুণালঙ্কারৌচিত্যসুন্দরশব্দার্থ-শরীরস্য সতি ধ্বননাখ্যাত্মনি কাব্যরূপতাব্যবহারঃ। ন চাত্মনোঽসারতা কাচিদিতি চ সমানম্." [ধ্বন্যালোক, ১ম উদ্দ্যোত: 'লোচন', পৃ. ৫৯]।

'ধ্বন্যালোকে'র ১.৫ কারিকার বৃত্তিগ্রন্থ—"বিবিধবাচ্য-বাচক-রচনাপ্রপঞ্চচারুণঃ কাব্যস্য স এবার্থঃ সারভূতঃ।"—এর ব্যাখ্যাতেও অভিনবগুপ্ত সেই একই মন্তব্য করেছেন : "বিবিধং তত্তদভিব্যঞ্জনীয়রসানুগুণ্যেন বিচিত্রং কৃত্বা বাচ্যে বাচকে রচনায়াং চ প্রপঞ্চেন যচ্চারু শব্দার্থালঙ্কারগুণযুক্তম্ ইত্যর্থঃ। তেন সর্বত্রাপি ধ্বনন-সদ্ভাবেঽপি ন তথা ব্যবহারঃ। আত্মসদ্ভাবেঽপি ক্বচিদেব জীবব্যবহারঃ ইত্যুক্তং। তেনৈতন্নিরবকাশম্ যদুক্তং হৃদয়দর্পণে—'সর্বত্র তর্হি কাব্যব্যবহারঃ স্যাদ্' ইতি।" [দ্র° ধ্বন্যালোক, 'লোচন', পৃ. ৮৭-৮৮]

৭

আনন্দবর্ধন যাকে প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গ্য অর্থ ব'লেছেন, তা তিন রকম হতে পারে—বস্তুরূপ, অলংকাররূপ এবং রসাদিরূপ। তবে এই ত্রিবিধ প্রতীয়মান অর্থের মধ্যে প্রথম দুইটি বাচ্যও হতে পারে, কিন্তু প্রতীয়মান অর্থের তৃতীয় যে ভেদ 'রসাদি' তা' কখনও বাচ্য হতে পারে না, তা সর্বদাই প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গ্য। অভিধা বা লক্ষণা প্রভৃতি শব্দের অন্যান্য ব্যাপারের সাহায্যে রসাদিরূপ অর্থের প্রতীতি একেবারেই সম্ভব হ'তে পারে না। তার জন্য দরকার আর এক অভিনব ব্যাপার—যাকে 'ব্যঞ্জনা' বা 'ধ্বনন' শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হয়ে থাকে। তবে ব্যঙ্গ্য বস্তু বা ব্যঙ্গ্য অলংকার যে সর্বদাই বাচ্য বস্তু বা বাচ্য অলংকারের তুলনায় চমৎকারজনক, একথা প্রত্যেক সহৃদয়কেই অকপটে স্বীকার করতে হবে। কেননা বিদগ্ধগোষ্ঠীতে পরস্পর আলাপের সময় প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে অভিমত বস্তু, যাকে বোঝানো সামাজিকদের প্রধান লক্ষ্য, তা প্রায়ই সাক্ষাৎ সোজাসুজিভাবে শব্দের অভিধাবৃত্তির সাহায্যে প্রকাশ করা হয় না, আভাসে ইঙ্গিতে বক্রোক্তির মধ্য দিয়ে তাকে প্রকাশ করাতেই তাঁদের অভিনিবেশ বেশী। আর এইভাবে ব্যঞ্জনার সাহায্যে অভিমত বস্তুকে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে অর্থের মধ্যে যে রমণীয়তা সঞ্চারিত হয়, তা কখনও বাচ্যরূপে প্রকাশিত যে অর্থ—তা শুদ্ধ বস্তুমাত্রই হোক, বা অলংকৃত বস্তু (অর্থাৎ অংলকার) স্বরূপই হোক,—তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। তৃতীয় উদ্দ্যোতের বৃত্তিগ্রন্থে ধ্বনিকার অতি স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে শব্দ ও অর্থের এই ব্যঞ্জকত্ব সহৃদয়মাত্রেরই অনুভববেদ্য, তা যেমন গীতধ্বনির ক্ষেত্রে লক্ষিত হয়ে থাকে, তেমনি চেষ্টা, অভিনয়, বিদগ্ধালাপ প্রভৃতি লোকব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও তার উল্লাস অপহ্নব করা কোনও সহৃদয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়। যদি তিনি তা অপহ্নব করতে চান তা'হলে সকলের কাছেই উপহাসের পাত্র হয়ে উঠবেন। আনন্দবর্ধনের উক্তি আমরা এস্থলে উদ্ধার করছি—

"ন হি বাধারহিতং নীলং নীলমিতি ব্রুবন্নপরেণ প্রতিষিধ্যতে নৈতন্নীলং পীতমেতদিতি। তথৈব ব্যঞ্জকত্বং বাচকানাং শব্দানাম্ অবাচকানাং চ গীতধ্বনীনাম্ অশব্দরূপাণাং চ যৎ চেষ্টাদীনাং সর্বেষামনুভবসিদ্ধমেব তৎ কেনাপহ্নূয়তে। অশব্দমর্থং রমণীয়ং হি সূচয়ন্তো ব্যাহারাস্তথা ব্যাপারা নিবদ্ধাশ্চ অনিবদ্ধাশ্চ-বিদগ্ধপরিষৎসু বিবিধা বিভাব্যন্তে। তানুপহাস্যতামাত্মনঃ পরিহরন্ কোঽতিসন্দধীত সচেতাঃ ব্রূয়াৎ ....।' [ধ্বন্যালোক, ৩য় উদ্দ্যোত, বৃত্তি, পৃ. ৪৪৬-৪৭।] চতুর্থ উদ্দ্যোতের ৫ম কারিকার বৃত্তিগ্রন্থেও ধ্বনিকার এই কথারই পুনরুক্তি করেছেন দেখা যায়—"সারভূতো হ্যর্থঃ স্বশব্দানভিধেয়ত্বেন

প্রকাশিতঃ সুতরামেব শোভামাবহতি। প্রসিদ্ধিশ্চেয়মস্ত্যেব বিদগ্ধ-বিদ্বৎ-পরিষৎসু যদভিমততরং বস্তু ব্যঙ্গ্যত্বেন প্রকাশ্যতে ন সাক্ষাচ্ছব্দবাচ্যত্বেন।" [ঐ. পৃ. ৫৩৩]। এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'রঘুবংশে প্রেম' শীর্ষক তাঁর এক প্রবন্ধে যা' বলেছেন, তা উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি : "একখানি প্রকাণ্ড মহাকাব্য, যাহাতে সব কয়টা রসই পুরা বর্তমান তাহাতে এই সবই বেশী বিস্তার হইতে পারে না, তাই সবই সংক্ষেপে আছে। সে সংক্ষেপও পাকা হাতের সংক্ষেপ। আসল কথাটি— সকলের চেয়ে ভাল কথাটি—দু'কথায় বলিয়া দেওয়া আছে। বাকীটি তোমরা ভাবিয়া লও। সবিস্তার বর্ণনা না থাকিলেও এমন দুইটি আসল কথা বলা আছে, যাহাতে তোমার মনে অনেক কথা উঠিবে, আর তোমায় আনন্দে ভরপুর করিয়া তুলিবে।"

অতএব আনন্দবর্ধনের মতে প্রতীয়মান অর্থ ত্রিবিধ হলেও 'রসদিরূপ' প্রতীয়মান অর্থই তাঁর মতে 'পরম ব্যঙ্গ্য', 'বস্তু' ও 'অলংকার'রূপ অপর দুরকম প্রতীয়মান অর্থ বাচ্যও হতে পারে ব্যঙ্গ্যও হতে পারে, রসাদির মত সর্বদাই ব্যঙ্গ্য নয়। আনন্দবর্ধনের এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ ক'রেই টীকাকার অভিনবগুপ্ত প্রতীয়মান অর্থের দুটি প্রধান বিভাগ দেখিয়েছেন— একটি 'লৌকিক', অপরটি 'অলৌকিক' বা 'কাব্যব্যাপারৈকগোচর'। বস্তু ও অলঙ্কার যখন প্রতীয়মানরূপে প্রকাশিত হয়, তখন বাচ্য বস্তু ও বাচ্য অলংকার থেকে তার সমধিক চারুত্ব থাকলেও তা লৌকিক ভেদেরই অন্তর্গত। অপরপক্ষে রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস প্রভৃতি আস্বাদনাত্মক প্রতীয়মান অর্থ সব সময় কাব্যে বর্ণিত বা অভিনয়ের সাহায্যে উপস্থাপিত বিভাবাদিরূপ অর্থ, যা শব্দের অভিধাশক্তির সাহায্যেই উপস্থাপিত হ'য়ে থাকে, তার দ্বারাই ব্যঞ্জনাব্যাপারের সাহায্যে প্রকাশিত হয়ে থাকে যেহেতু লোকব্যবহারে যে সব ভাবের অনুভূতি আমাদের ঘটে থাকে, তার মধ্যে কাব্যসমুদ্ভূত লোকোত্তর আস্বাদমাত্র-সার সংবেদনের উদ্রেক হতে পারে না, সেই কারণে রসাদি প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতিকে 'লোকোত্তর' ব'লে চিহ্নিত করা হয়। সুতরাং আনন্দবর্ধন যে ধ্বনিবাদের প্রবর্তনে উৎসাহিত হয়েছিলেন, তা প্রধানতঃ আনন্দমাত্রসার আস্বাদপ্রাণ অনুভূতি, যা' প্রধানতঃ কাব্য ও নাট্যের ক্ষেত্রেই লক্ষিত হয়ে থাকে, তার সম্ভাব্যতার কারণ অনুসন্ধানের প্রেরণাই সেই প্রবৃত্তির উৎস। তাই আমরা দেখতে পাই 'সাহিত্য-দর্পণ'-কার বিশ্বনাথ ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা নামক একটি অভিনব তুরীয় (বা চতুর্থ) বৃত্তি স্বীকার করার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে প্রথমেই ব'লেছেন :

"বৃত্তীনাং বিশ্রান্তেরভিধাতাৎপর্যলক্ষণাখ্যানাম্।
অঙ্গীকার্যা তুর্যা বৃত্তির্বোধে রসাদীনাম্॥"

সুতরাং রসাদির আস্বাদন কিভাবে হয়ে থাকে, তার ব্যাখ্যার জন্যই ধ্বনিকারকে অভিধা, লক্ষণা এবং তাৎপর্য নামক প্রসিদ্ধ তিনটি ব্যাপারের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা বা ধ্বনন নামক ব্যাপার কবিকর্মের ক্ষেত্রে স্বীকার করতে হয়েছিল। এবং এই কাব্যমাত্রগোচর ব্যঞ্জনা-ব্যাপারের অস্তিত্ব তিনি যেভাবে নানাবিধ যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, বাণভট্ট, অমরু, হাল প্রমুখ প্রখ্যাত প্রাচীন কবিগণের রচনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতিপাদন করেছেন, তা তাঁর অনন্য সাধারণ মনীষা বৈদগ্ধ্য ও রসজ্ঞতার পরিচয়বাহী।

কাব্য ও নাট্যের ক্ষেত্রে সর্বত্রই যে রসের প্রাধান্য, একথা, নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি যেমন ঘোষণা ক'রে গেছেন, অলংকারশাস্ত্রপ্রণেতা চিরন্তন ভামহ প্রভৃতি আচার্য্যও যে সে

সম্বন্ধে সম্যগ্‌ভাবে অবহিত ছিলেন, তাও তাঁদের উক্তি থেকে নিঃসংশয়ভাবে জানতে পারা যায়। তৃতীয় উদ্দ্যোতের ৩৩ কারিকার বৃত্তিগ্রন্থে আনন্দবর্ধন আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন—

"এতচ্চ রসাদিতাৎপর্যেণ কাব্যনিবন্ধনং ভরতাদাবপি সুপ্রসিদ্ধমেব।" [ধ্বন্যালোক, পৃ. ৪০১] 'লোচন'-কার অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্র থেকে "বৃত্তয়ঃ কাব্যমাতৃকাঃ"— ভরতমুনির এই বচনটি যেমন উদ্ধার করেছেন, তেমনি কাব্যমীমাংসক আলংকারিকদের সমর্থনেও ভামহের 'কাব্যালংকার' নিবন্ধ থেকে—

স্বাদুকাব্যরসোন্মিশ্রং বাক্যার্থমুপভুঞ্জতে।
প্রথমালীঢ়মধবঃ পিবন্তি কটু ভেষজম্।"

—এই কারিকাটিও অনুকূল সাক্ষ্যরূপে উদ্ধার করেছেন। সুতরাং আনন্দবর্ধনের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই ভরতমুনির কাল থেকে দৃশ্য ও শ্রব্য—উভয়বিধ কাব্যেই রসের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়ে আসছিল। যদি তাই হয়, তবে আনন্দবর্ধনের কৃতিত্ব কিসে? নাট্যশাস্ত্রেও যদিও 'বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ', 'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে', 'যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষঃ বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা। তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ।'—প্রভৃতি উক্তির ভিতর দিয়ে সংশয়াতীতভাবে দৃশ্যকাব্যে রসের প্রাধান্য খ্যাপন করা হ'য়েছে তবুও দৃশ্যকাব্যে রসনিষ্পত্তি কি পদ্ধতিতে ঘটে থাকে, শব্দ ও অর্থের কোন ব্যাপারের সাহায্যে রসানুভূতি সম্ভবপর হতে পারে, সে সম্বন্ধে কিন্তু নাট্যশাস্ত্রকার খোলা-খুলিভাবে কিছু বলেন নি। এমন কি নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভরতমুনি এমন কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যাতে করে মনে হতে পারে কখনও তিনি রসের উৎপত্তিবাদের সমর্থন করেছেন, কখনও বা অনুমিতিবাদের, কখনও বা ভুক্তিবাদের, আবার কখনও বা অভিব্যক্তিবাদের। এইভাবে তাঁর উক্তির মধ্যেই মতবিরোধের বহু বীজ প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে—যার ফলে 'রসনিষ্পত্তির' স্বরূপ সম্পর্কে ভট্টলোল্লট, ভট্টশঙ্কুক, ভট্টনায়ক, ভট্টাভিনবগুপ্ত প্রমুখ আচার্যদের বিচিত্র সিদ্ধান্তের উদ্ভব পরবর্তী যুগে সম্ভব হতে পেরেছিল। অপরদিকে ভামহ, দণ্ডী, বামন, উদ্ভট প্রমুখ যেসব চিরন্তন আলংকারিক তাঁদের নিবন্ধে রসের আলোচনা করেছিলেন, তাঁরাও রসকে কখনও গুণ বা কখনও অলংকারের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত ক'রেছিলেন, রস যে গুণ বা অলংকার থেকে অতিরিক্ত, কাব্যের আত্মভূত ধর্ম হতে পারে, সে সম্বন্ধে তাঁরা ততখানি অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। এমন কি উদ্ভটাচার্য রসের পঞ্চরূপত্ব ("পঞ্চরূপা রসাঃ") দেখাতে গিয়ে স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করেছেন যে স্থায়ী ভাব, সঞ্চারিভাব, বিভাব ও অনুভাব বা অভিনয়—এই চাররকম উপায়ের সাহায্যে যেমন রসের উন্মেষ হতে পারে, ঠিক সেইভাবেই 'স্বশব্দ' অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে সামান্যতঃ রস বা বিশেষ বিশেষ শৃঙ্গারাদি রসের বোধক 'রস' শব্দ বা 'শৃঙ্গার', 'বীর', 'করুণ' প্রভৃতি শব্দও অভিধা-বৃত্তির সাহায্যেই দর্শক বা শ্রোতার চিত্তে রসের সঞ্চার করতে সমর্থ—'স্বশব্দ-স্থায়ি-সঞ্চারি-বিভাবাভিনয়াস্পদম্'। অতএব আনন্দবর্ধনের পূর্বাচার্যেরা রসকে নাট্য ও কাব্যের ক্ষেত্রে সর্ব-সম্মতভাবে অঙ্গীকার ক'রে নিলেও তার প্রকৃত স্বরূপটিকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি, যার ফলে কাব্যজিজ্ঞাসুদের মনে নানা রকম ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। আনন্দবর্ধনের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব এই যে তিনি রসের স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্বাচার্য প্রকল্পিত এই জাতীয় বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তকে নিরসন করে তার একান্ত নিজস্ব স্ব-লক্ষণ স্বরূপটি অসাধারণ মনীষার সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। একদিকে যেমন তিনি দেখিয়েছেন যে রসকে গুণ বা অলংকারের মধ্যে পরিগণন করা অসম্ভব, অপরদিকে রস যে 'স্বশব্দবাচ্য' কখনই হতে পারে না, বিভাব অনুভাব সঞ্চারিভাবের বর্ণনা এবং প্রয়োগ-প্রধান দৃশ্যকাব্যে

চতুর্বিধ অভিনয়ের সাহায্যেই যে রসের আস্বাদন সামাজিকের পক্ষে সম্ভব হতে পারে তাও তিনি অখণ্ডনীয় যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আনন্দবর্ধনের পরবর্তী যুগে আর কোনও আলংকারিকের পক্ষেই 'রস' কে গুণ বা অলংকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় নি। যদিও তাঁরা 'রসবৎ', 'প্রেয়ঃ', 'উর্জ্জস্বি' 'সমাহিত' প্রভৃতি কয়েকটি অলংকার স্বীকার করেছেন, তবুও 'রসধ্বনি' বা 'ভাবধ্বনি' থেকে তাদের মৌলিক পার্থক্য, যা আনন্দবর্ধন অভ্রান্ত যুক্তির দ্বারা সর্বপ্রথম ব্যবস্থাপন করেন, তাকে অস্বীকার করা তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি। 'রসবৎ' প্রভৃতি অলংকার এবং 'রসধ্বনি'—যা' কাব্যের আত্মভূত তত্ত্ব, যা' অলংকার্য, এই দু'য়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। আনন্দবর্ধনই সেদিকে কাব্যরসিক সহৃদয় সমাজের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকর্ষণ করেন—

"রসভাবতদাভাসভাবশান্ত্যাদিরক্রমঃ।
ভিন্নো রসাদ্যলংকারাদলংকার্যতয়া স্থিতঃ॥
প্রধানেঽন্যত্র বাক্যার্থে যত্রাঙ্গং তু রসাদয়ঃ।
কাব্যে তস্মিন্নলংকারো রসদিরিতি মে মতিঃ॥" ['রস' কিভাবে 'অলংকার' ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে সে সম্বন্ধে অভিনবগুপ্ত সূক্ষ্ম যুক্তিপূর্ণ আলোচনা ক'রেছেন। দ্র° 'লোচন', পৃ. ১৯৪।]

এইভাবে আনন্দবর্ধন ভরতমুনির রসবাদ, চিরন্তন কাব্যমীমাংসক ভামহ দণ্ডী উদ্ভট প্রমুখ আচার্যদের রসবিষয়ক সিদ্ধান্তরাজি—পূর্বাচার্যদের কাছ থেকে উত্তরাধিকাররূপে তিনি যেগুলি পেয়েছিলেন, সেগুলিকে ধ্বনিবাদের উদার পরিধির মধ্যে সমন্বিত ক'রে তা'দের যোগ্য মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রলেন এবং তাদের মধ্যে আপাতবিরোধ দূর ক'রে রসতত্ত্বকে একটি ব্যাপক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করলেন। যে সব মতবাদ ছিল বিক্ষিপ্ত তাঁর অসাধারণ মনীষার আলোকে তারা হ'য়ে উঠ্‌ল সংহত, বিশ্লিষ্ট তত্ত্বরাজিকে তিনি তাঁর অন্তর্ভেদী ধীশক্তির সাহায্যে পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও পরস্পরের উপকারক ক'রে বিন্যস্ত ক'রলেন।

আনন্দবর্ধনের মতে যে রচনায় ব্যঙ্গ্য বা প্রতীয়মান অর্থ নেই, তা' কোনক্রমেই 'কাব্য' এই সংজ্ঞার যোগ্য হ'তে পারে না। শুধুই বাচ্য-বাচকভাবের উপর যে রচনার ভিত্তি, তা' কখনও প্রতিভাশালী মহাকবির সৃষ্টিপ্রেরণার লক্ষ্য হতে পারে না। তাই ধ্বনিকার উদাত্ত-কণ্ঠে ঘোষণা ক'রেছেন: "ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকাভ্যামেব সুপ্রযুক্তাভ্যাং মহাকবিত্বলাভো মহাকবীনাম্, ন বাচ্য-বাচকরচনামাত্রেণ।" [দ্র°'ধ্বন্যালোক', ১ম উদ্দ্যোত, পৃ. ১৮৩ তত্রস্থ 'লোচন'—টীকা]। সুতরাং আনন্দবর্ধন যখন কবিকর্মের প্রভেদ নিরূপণে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন তিনি সেই 'ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব'—যা 'ব্যঞ্জনা' ব্যাপারের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত, তাকেই তাঁর কাব্যবিভাগের ভিত্তিভূমি ব'লে গ্রহণ ক'রেছেন। এইভাবে কাব্যকে তিনি দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ক'রেছেন—একটিকে তিনি ব'লেছেন 'ধ্বনি' কাব্য অপরটিকে তিনি 'গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য' এই সংজ্ঞার দ্বারা চিহ্নিত ক'রেছেন –

"প্রধান-গুণভাবাভ্যাং ব্যঙ্গ্যস্যৈবং ব্যবস্থিতে।
কাব্যে উভে ততোঽন্যদ্ যৎতচ্চিত্রমভিধীয়তে॥" [ধ্বন্যালোক, ৩.৪১-৪২]।

'ধ্বনি' ও 'গুণীভূতব্যঙ্গ্য'—এই উভয়বিধ কাব্যেই ব্যঞ্জনা ব্যাপার আছে, ব্যঞ্জক শব্দ ও ব্যঙ্গ্য অর্থ—তা বস্তু, অলংকার বা রস যে কোনও রকমেরই হোক্ না কেন, তাও আছে। তবে দু'এর মধ্যে প্রভেদ শুধু এই কারণে যে ধ্বনি কাব্যে বাচ্য অর্থ থেকে প্রতীয়মান অর্থের

প্রাধান্য ; অপরপক্ষে 'গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য' কাব্যে বাচ্যার্থের তুলনায় প্রতীয়মান অর্থটি গুণীভূত বা অপ্রধান। কোথায় প্রতীয়মান অর্থের প্রাধান্য, কোথাই বা বাচ্য অর্থের প্রাধান্য তা' নিরূপণ করবার পদ্ধতিও ধ্বনিকার স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করে গেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে —"চারুত্বোৎ-কর্ষ-নিবন্ধনা হি বাচ্য-ব্যঙ্গ্যয়োঃ প্রাধান্য-বিবক্ষা।" যে অর্থে সহৃদয় চিত্তের 'প্রতীতিবিশ্রান্তি' ঘটে থাকে, এবং যে অর্থের প্রতীতি সহৃদয় বোদ্ধার হৃদয়ে অধিকতর চমৎকারের জনক হ'য়ে থাকে, আনন্দবর্ধনের মতে তারই প্রাধান্য স্বীকার্য। তবে সহৃদয়ের চারুত্বোৎ-কর্ষপ্রতীতি যে সব ক্ষেত্রেই অভিন্ন হ'বে, তার কোন নিয়ম নেই। ব্যক্তিভেদে চারুত্বোৎ-কর্ষপ্রতীতিও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে. অবস্থাভেদ বা কালভেদও এই প্রতীতিভেদের কারণ হতে পারে। কিন্তু চারুত্বপ্রতীতির এই আপেক্ষিকতা স্বীকার ক'রে নিলেও একথা কিছুতেই বিস্মৃত হলে চলবে না যে কোনও বাঙ্ময়সৃষ্টির সৌন্দর্য্য, তার 'কাব্যত্ব' নির্ভর করে ব্যঙ্গ্য বা প্রতীয়মান অর্থের সদ্ভাবের উপর। তা' সে প্রতীয়মান অর্থ প্রধান ভাবেই থাকুক, বা অপ্রধানভাবেই থাকুক। তাই 'গুণীভূতব্যঙ্গ্যে' প্রতীয়মান অর্থ বাচ্যার্থ অপেক্ষায় গুণীভূত হ'লেও, তার সত্তাই কাব্যের সামগ্রিক সৌন্দর্য্যের নিদান ব'লে গণ্য হয়ে থাকে। প্রতীয়মান অর্থ কত বিভিন্নভাবে বাচ্যার্থের অপেক্ষায় গুণীভূত বা অপ্রধান হ'তে পারে, তা' আনন্দবর্ধন এবং তাঁর অনুসারী আলংকারিক সম্প্রদায় অতি বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন, এবং মোট আট রকম গুণীভূতব্যঙ্গ্যের উদাহরণ ও লক্ষণ তাঁরা পরিগণন ক'রে গেছেন। কিন্তু অপ্রাধান্য সত্ত্বেও যে প্রতীয়মান অর্থের স্পর্শ নানা অলংকার-বিভূষিত মহাকবিবাণীর মধ্যে এক অপরূপ রমণীয়তা সঞ্চার ক'রতে সমর্থ, তা' আনন্দবর্ধন একটি কারিকায় মনোজ্ঞভাবে নির্দেশ ক'রেছেন। তিনি ব'লেছেন—

"মুখ্যা মহাকবিগিরামলংকৃতিভৃতামপি।
প্রতীয়মানচ্ছায়ৈষা ভূষা লজ্জেব যোষিতাম্।" [ধ্বন্যালোক, ৩.৩৭]

এমন কি কোনও অলঙ্কার যদি নাও থাকে, শুধু প্রতীয়মান অর্থই যদি অপ্রধানভাবে হ'লেও মহাকবিবাণীতে বিরাজ করে, তা হ'লেও অনলঙ্কৃত রমণী দেহকে লজ্জা যেমন বিভূষিত করে, তেমনি কাব্যদেহও তার দ্বারা শোভমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে। এই কারিকাটির ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্তপাদ ব'লেছেন—"অলঙ্কৃতিভৃতাম্ অপিশব্দাদ্ অলঙ্কারশূন্যানামপীত্যর্থঃ। প্রতীয়মানকৃতা ছায়া শোভা সা চ লজ্জাসদৃশী গোপনাসার-সৌন্দর্য্যপ্রাণত্বাৎ। 'অলঙ্কার-ধারিণীনামপি নায়িকানাং লজ্জা মুখ্যং ভূষণম্।'· শৃঙ্গাররসতরঙ্গিণী হি লজ্জাবকন্ধা নির্ভরতয়া তাংস্তান্ বিলাসান্ নেত্রগাত্রবিকারপরম্পরারূপান্ প্রসূত ইতি গোপনাসারসৌন্দর্যালজ্জা-বিজ স্তিতমেতদিতি।" [ঐ 'লোচন', পৃ. ৪৭৬-৭৭]।

এ ছাড়া আনন্দবর্ধন তৃতীয় কাব্য-ভেদও উল্লেখ ক'রেছেন—যার নাম তিনি দিয়েছেন 'চিত্র'। 'চিত্র' শব্দের অর্থ অলঙ্কার। সুতরাং যে কাব্যে অলঙ্কারের প্রাধান্য, যাতে প্রতীয়মান অর্থের স্পর্শজনিত কোন প্রকার চমৎকারের অনুভূতি সহৃদয়ের চিত্তে উদ্রিক্ত হয় না, তাকেই ধ্বনিকার 'চিত্র' এই সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত ক'রেছেন। এবং অলঙ্কার যেমন বাচক বা শব্দনিষ্ঠ হ'তে পারে—যেমন অনুপ্রাস, যমক, পুনরুক্তবদাভাস প্রভৃতি, সেইরকম বাচ্য বা মুখ্যার্থনিষ্ঠও হ'তে পারে, যেমন—উপমা, রূপক, দীপক, পর্য্যায়োক্ত, সমাসোক্তি প্রভৃতি অগণিত অলঙ্কার। অতএব রসভাবাদি প্রতীয়মান অর্থ-বিরহিত শব্দালঙ্কার বা অর্থালঙ্কারপ্রধান রচনাকেই আনন্দবর্ধন 'চিত্রকাব্য' বলে নির্দেশ ক'রেছেন। তাঁর মতে 'চিত্র'কে যথার্থ কাব্য ব'লেই স্বীকার করা যায় না, তা প্রকৃতপক্ষে 'কাব্যানুকার' বা imitation of poetry। দূর থেকে শুক্তিতে যেমন চাকচিক্যাদি-দোষবশতঃ 'রজতাভাস' হ'য়ে থাকে, কিন্তু রজতাভাস যেমন সত্য রজত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, ঠিক সেইরকম কখনও কখনও কোনও কোনও রচনাতে প্রতীয়মান অর্থের প্রতি

কবির কোনও প্রকার অভিনিবেশ না থাকলেও শুধু বাচ্য ও বাচকের শোভাহেতু কতকগুলি ধর্মের সন্নিবেশের ফলে শ্রোতার চিত্ত তাৎক্ষণিক সম্মোহনের বশীভূত হ'য়ে পড়ে, এবং সেই সব রচনাকে কাব্য ব'লে স্বীকার করতেও তাদের বাধে না। মহাকবিরাও কখনও কখনও দুর্বল মুহূর্তে বা বৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা নিজেদের শব্দার্থ প্রয়োগ কৌশলের দ্বারা পাঠকচিত্তে বিস্ময় সৃষ্টির প্রেরণায় ঐ জাতীয় শব্দচিত্র ও অর্থচিত্র কাব্য নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন। তাই ব'লে একথা মনে করলে ভুল হ'বে যে আনন্দবর্ধন 'ধ্বনি' কাব্য বা 'গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য' কাব্যে শব্দালঙ্কার বা অর্থালঙ্কারকে একেবারে বর্জন করবার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। বরং ধ্বনিকাব্যে অলঙ্কার যোজনা কিভাবে করতে হ'বে, সে সম্বন্ধে আনন্দবর্ধন অতি গভীরভাবে সমীক্ষা ক'রেছেন, এবং সে বিষয়ে কতকগুলি নির্দিষ্ট বিধানও কবিযশঃপ্রার্থীদের অবহিত করবার জন্য কারিকাকারে গ্রথিত ক'রে গেছেন। এই সকল বিধানের মুখ্য তাৎপর্য হ'ল ধ্বনিকাব্যে এমনভাবে অলঙ্কার সন্নিবেশ করা কর্তব্য, যাতে প্রতীয়মান রসভাবাদিরূপ অর্থের অস্তিত্ব বা প্রাধান্য কখনও ক্ষুণ্ণ না হয়, অলঙ্কার যেন সর্বদাই রসের উপকারক বা সহায়ক হ'তে পারে। সুতরাং যেখানে কবির চিত্ত রসাবেশবিবশ, এবং কবির সেই রসসমাহিত অবস্থা থেকে যেখানে বাচ্য ও বাচক বিচিত্র অলঙ্কারের রূপ ধরে যেন পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে কবির লেখনীতে এসে ভিড় করে, সেখানে অলঙ্কার নির্মাণ সার্থক। কেননা কবি বা সহৃদয়ের রসসৃষ্টির সঙ্গে তার কোনো বিরোধ বা অসংগতি সেখানে থাকে না। কিন্তু আনন্দবর্ধন একটি বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে সাবধান ক'রে দিয়েছেন। তা' হ'ল এই যে, অনুপ্রাস বা যমক প্রভৃতি শব্দালঙ্কার রসপ্রধান কাব্যে সর্বদাই পরিহার করা উচিত। যেহেতু এই সব অলঙ্কার রসসমাহিত কবিচিত্ত থেকে কখনও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হ'তে পারে না। কবির প্রতিভা যতই উচ্চস্তরের হোক না কেন, যমক অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কার যদি ধারাবাহিকভাবে নিবদ্ধ করতে হয় তবে অবশ্যই তাঁকে বিশেষ বিশেষ শব্দ বা বর্ণের অন্বেষণে মনোনিবেশ করতেই হ'বে এবং তার ফলে তাঁর চিত্তের রসৈকমুখীনতা ব্যাহত হ'বে, চিত্ত হ'বে দ্বিধা বিভক্ত, বিক্ষিপ্ত। আনন্দবর্ধনের এই সকল সমীক্ষা যে কত গভীর ও মৌলিক চিন্তাসম্ভূত তা যে কোনও সমৃদ্ধ সাহিত্যের নিদর্শন বিশ্লেষণ করলেই আমাদের বোধগম্য হবে। আনন্দবর্ধনের মতে ধ্বনিকাব্যে অলঙ্কার যোজনা তখনই সার্থক ও অনবদ্য হ'য়ে উঠতে পারে যখন তা' হ'বে 'রসাক্ষিপ্ত' এবং 'অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য'—

"রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্যঃ সোঽলংকারো ধ্বনৌ মতঃ॥
যমকাদিনিবন্ধে তু পৃথগ্‌যত্নোঽস্য জায়তে।
শক্তস্যাপি রসেঽঙ্গত্বং তস্মাদেষাং ন বিদ্যতে॥"

অবশ্য দণ্ডী প্রভৃতি চিরন্তন আলঙ্কারিক আচার্যেরাও কাব্যে অলঙ্কার যে রসোপকারক, রসের উন্মেষেই যে অলঙ্কারের সার্থকতা তা' তাঁদের নিবন্ধে স্থানে স্থানে উল্লেখ করেছেন। যেমন—

"কামং সর্বোঽপ্যলঙ্কারো রসমর্থে নিষিঞ্চতি।
তথাঽপ্যগ্রাম্যতৈবৈনং ভারং বহতি ভূয়সা।"

প্রভৃতি শ্লোকে স্পষ্টভাবেই রসের সঙ্গে অলঙ্কারের সম্পর্ক বলা হ'য়েছে। কিন্তু তা' হ'লেও চিরন্তন আলঙ্কারিকরা যেখানে নিতান্তই প্রাসঙ্গিকভাবে রস ও অলঙ্কারের সম্পর্কের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন, আনন্দবর্ধন সেখানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই দুই তত্ত্বের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গিভাব সম্বন্ধটি কার্য-কারণভাব বিশ্লেষণপূর্বক

প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এবং রসসম্পর্কশূন্য নিছক্ অলংকারপ্রধান কাব্যরচনা যে কখনও মহাকবিগণের সৃষ্টিপ্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না তা দ্বিধাহীনভাবে সহৃদয়সমাজে প্রচার করতে কুণ্ঠিত হন নি। নীরস প্রবন্ধনির্মাণ কবির পক্ষে 'অপশব্দ' বা দুর্যশঃ স্বরূপ। হয়ত কখনও কখনও বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস প্রমুখ প্রখ্যাত মহাকবিগণও তাঁদের কাব্যে নীরস, অলংকারপ্রধান 'চিত্রকাব্য' রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁরা লোকোত্তর প্রতিভাশালী বলে তাঁদের সেই সব স্খলন আধুনিক কবিসম্প্রদায়ের অনুকরণযোগ্য হতে পারে না—কেননা, "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা"। সুতরাং যাঁরা প্রাথমিক অভ্যাসার্থী কবিযশঃপ্রার্থী—তাঁরা হয়ত কাব্যনির্মাণ কৌশল আয়ত্ত করবার জন্যে কবি-জীবনের প্রারম্ভদশায় চিত্রকাব্য রচনায় অভিনিবিষ্ট হতে পারেন, কিন্তু যখন তাঁদের কবিপ্রতিভা পরিণতি লাভ করে, তখন আর বাচ্যচিত্র বা বাচকচিত্রের অবাধ সন্নিবেশ তাঁদের কবিদৃষ্টিকে প্রলুব্ধ করতে পারে না। তাই আনন্দবর্ধন নিসংশয়ভাবে চিত্রকাব্য সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে গেছেন—

"তদেবমিদানীন্তনকবিকাব্যনয়োপদেশে ক্রিয়মাণে প্রাথমিকানামভ্যাসার্থিনাং যদি পরং চিত্রেণ ব্যবহারঃ, প্রাপ্তপরিণতীনাং তু ধ্বনিরেব কাব্যমিতি স্থিতম্।" [ধ্বন্যালোক ৪.৪২ বৃত্তি: পৃ. ৪৯৯-৫০০। ধ্বন্যালোকের ৩.১৯ কারিকার বৃত্তিগ্রন্থের উপসংহারেও আনন্দবর্ধন কর্তৃক উদ্ধৃত 'পরিকরশ্লোক'-গুলিও বিশেষভাবে আলোচ্য। ঐ স্থলে অভিনব-গুপ্তপাদ মন্তব্য করেছেন: "ন হি বসিষ্ঠাদিভিঃ কথঞ্চিদ্ যদি স্মৃতিমার্গস্ত্যক্তস্তদ্ বয়মপি তথা ত্যজামঃ। অচিন্ত্যহেতুকত্বাদুপরিচরিতানামিতি ভাবঃ।"—লোচন, পৃ. ৩৬৫]।

অতএব একদিকে ধ্বনিকার যেমন শব্দালংকার এবং অর্থালংকারের ঐকান্তিক মোহ থেকে মুক্ত হবার জন্য উদীয়মান কবিগণকে পরামর্শ দিয়েছেন, অপরদিকে সেইরকম অলংকারকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করে ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যে মুখ্য কাব্যার্থের অঙ্গরূপে তাদের সন্নিবেশসাধন বিষয়ে অবহিত হতেও বলেছেন। কাব্যে অলংকারের স্থান সম্বন্ধে আনন্দবর্ধনের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ, মহাকবিগণের কালোত্তীর্ণ রচনারাজির নির্মাণপদ্ধতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ, এবং সর্ববিধ গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

১০

বস্তু, অলংকার ও রসরূপে আনন্দবর্ধন যে ত্রিবিধ 'ধ্বনি' ব্যবস্থাপন করেছেন, সেগুলিকে তিনি আর এক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—একটিকে তিনি বলেছেন 'অবিবক্ষিতবাচ্য' ধ্বনি, অপরটিকে তিনি 'বিবক্ষিতান্যপর-বাচ্য' এই নামে অভিহিত করেছেন। আমরা দেখেছি, যদিও বাচ্য ও প্রতীয়মানরূপে অর্থ দ্বিধা বিভক্ত, তা হলেও বাচ্যার্থের প্রতীতি যে প্রথমেই ঘটে থাকে, তা সর্ববাদিসম্মত। কবিও যেমন প্রথমে বাচ্যার্থবোধনের জন্যেই অভিনিবিষ্ট হয়ে থাকেন, সহৃদয়েরও তেমনি কাব্যপাঠের দ্বারা সর্বাগ্রে কবিবাক্যের মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থেরই প্রতীতি জন্মে থাকে। ধ্বনিকার বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতির এই পৌর্বাপর্য বা ক্রমভাব বোঝাবার জন্য প্রধানতঃ দুটি দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়েছেন—একটি ঘট-প্রদীপ দৃষ্টান্ত বা দীপশিখা ও আলোকের দৃষ্টান্ত, অপরটি পদার্থ-বাক্যার্থ দৃষ্টান্ত। প্রদীপের শিখার প্রতি যে আমরা সমাদর দেখিয়ে থাকি, তার কারণ পদার্থের প্রকাশ সেই দীপশিখার প্রজ্বলন ছাড়া সম্ভব নয়। অতএব বাহ্য ঘটাদি পদার্থের প্রকাশ আমাদের মুখ্য অভিপ্রেত হলেও দীপশিখার সাহায্য আমাদের নিতেই হয়। পদার্থ-বাক্যার্থ দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে আমরা দেখি কোনও একটি বাক্যের সামগ্রিক অর্থ, যাকে বাক্যার্থ বলা হয়ে থাকে, তা ঠিকমত বুঝতে গেলে সেই বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির

প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র অর্থ বা পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা দরকার। যার পদার্থজ্ঞান জন্মায় নি, তার পক্ষে বাক্যার্থবোধও অসম্ভব। ঠিক সেই ভাবেই প্রতীয়মানার্থবোধের জন্যে বাচ্যার্থবোধ অপরিহার্য। এ সম্বন্ধে ধ্বনিকার বলেছেন—"যথা পদার্থদ্বারেণ বাক্যার্থঃ সম্প্রতীয়তে। বাচ্যার্থপূর্বিকা তদ্বৎ প্রতিপৎ তস্য বস্তুনঃ॥" কিন্তু বাচ্যার্থপ্রতীতি ও ব্যঙ্গ্যার্থপ্রতীতি—এই দু'এর মধ্যে কার্যকারণভাব থাকলেও, কোনও কোনও স্থলে যথাশ্রুত বাক্যার্থে কবির বিবক্ষা বা তাৎপর্য না থাকতেও পারে—বাচ্যার্থবোধ হলেও সেই বাচ্যার্থ অন্বয়ের অনুপপত্তির ফলেই হোক্, বা তাৎপর্যের অনুপপত্তির ফলেই হোক্, অবিকল সেইভাবে বোঝা বা বোঝান, কোনওটিই কবি বা সহৃদয় কারও সম্ভবও নয়, অভিপ্রেতও নয়। সেখানে বাচ্যার্থটি 'অবিবক্ষিত' বলা হয়ে থাকে। এই অবিবক্ষার মধ্যেও তারতম্য থাকতে পারে। যদি বাচ্যার্থকে একেবারে পরিত্যাগ না করে তাকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে রূপান্তর-পরিণতভাবে গ্রহণ করতে হয়, এবং এই পদ্ধতির দ্বারাই কবির চরম বিবক্ষিত অর্থটি সহৃদয়ের উপলব্ধিগোচর হতে পারে, তবে সেই ক্ষেত্রে যে ধ্বনিকাব্যের উদ্ভব হয়, তাকে বলা হয় 'অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য ধ্বনি'। আর যদি বাচ্যার্থটি প্রথমে বোধ হলেও তার মধ্যে এমনই আভ্যন্তর অসঙ্গতি থাকে, যে তাকে সম্পূর্ণ-ভাবে বর্জন করে, তার সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে সম্বদ্ধ অন্য কোন অর্থের বোধ হলেই অর্থটি সুসংগত হয়ে দাঁড়ায়, এবং তারই পরিণামে কবির চরম অভীষ্ট অর্থটি সহৃদয়চিত্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌তে পারে. সেরকম স্থলে যে ধ্বনিকাব্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাকে বলা হয় 'অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য ধ্বনি'। মনে রাখতে হবে যে এই দুই স্থলে কবি ইচ্ছাপূর্বক 'বাচক' শব্দ প্রয়োগ না করে 'লাক্ষণিক' শব্দের সাহায্য নিয়ে থাকেন, শুধু শব্দের প্রাথমিক মুখ্যার্থ, যাকে ইংরেজীতে primary meaning বলা হয়ে থাকে, তাকে বুঝিয়েই তিনি তৃপ্ত হতে পারেন না। তিনি শব্দের গৌণী শক্তি বা secondary function-এর সাহায্য নিয়ে থাকেন, যাতে করে শেষ পর্যন্ত তাঁর চরম অভিমত অর্থটি, যাকে 'প্রতীয়মান' অর্থ বলা হয়ে থাকে, সহৃদয়ের বোধগম্য হ'তে পারে। অতএব 'অবিবক্ষিত-বাচ্য' ধ্বনির এই দু'রকম প্রভেদ শব্দের 'লক্ষণাব্যাপার'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত—একটির মূলে আছে 'উপাদান-লক্ষণা' বা 'অজহৎস্বার্থা লক্ষণা', অপরটির মূলে আছে 'লক্ষণ-লক্ষণা' বা 'জহৎস্বার্থা লক্ষণা'। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই ভুললে চলবে না। তা হচ্ছে এই যে 'অবিবক্ষিত-বাচ্য ধ্বনি', তা সে যে ধরণেরই হোক্ না কেন, সেখানে বাচ্যার্থের বোধ থাকতেই হবে, বাচ্যার্থ হয়ত শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অসঙ্গত হতে পারে, বা অর্থান্তর-পরিণত হতে পারে; কিন্তু বাচ্যার্থবোধকে একেবারে এড়িয়ে লক্ষ্যার্থবোধ এবং শেষ পর্যন্ত অভীষ্ট প্রতীয়মানার্থ-বোধ আদৌ সম্ভব হতে পারে না। এইভাবে 'লক্ষণামূলক ধ্বনি'ও শেষপর্যন্ত বাচ্যার্থবোধ ও বাচ্যার্থের সঙ্গে কোনো না কোনো সম্বন্ধকে উপায়রূপে অবলম্বন করেই আত্মলাভ করতে সমর্থ হয়ে থাকে। অতএব এখানেও বাচ্যার্থপ্রতীতি প্রতীয়মান অর্থপ্রতীতির উপায়মাত্র, একথা স্বীকার করতেই হবে। শুধু এটুকুই যথেষ্ট নয়। শব্দের এই উপচরিত বৃত্তি বা লক্ষণা আশ্রয় করে যে প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি হয়ে থাকে, তার মধ্যে চমৎকারিতা বা চারুত্বোৎকর্ষ থাকা দরকার। প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতির ফলে যদি সহৃদয়চিত্তে কোনো চমৎকারের উদ্রেক না হয়, তবে সেখানে ধ্বনিকাব্য বলে স্বীকার করা সমীচীন হবে না। যে সকল কবির প্রতিভা উন্নতস্তরের নয়, তাঁরা প্রায়ই শব্দের ঔপচারিক প্রয়োগকেই কবিত্বের চরম সার্থকতা বলে মনে করে থাকেন, প্রতীয়মান অর্থের অস্তিত্ব আদৌ সেখানে আছে কি না, কিংবা থাকলেও তার কোনও স্বতন্ত্র চারুত্ব সহৃদয়ের উপলব্ধিগোচর হয় কি না, সে দিকে তাঁদের দৃষ্টি থাকে না। আনন্দবর্ধন গতানুগতিকভাবে এই জাতীয়

শব্দের ঔপচারিক প্রয়োগকে (secondary usage) সমর্থন করেন নি, যদিও কবিসম্প্রদায়ে এই বিষয়ে যথেষ্ট প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন—যত্র হি ব্যঙ্গ্যকৃতং-['পাঠান্তরঃ ব্যঞ্জকত্বকৃতং'] মহৎ সৌষ্ঠবং নাস্তি তত্রাপ্যুপচরিতশব্দবৃত্ত্যা প্রসিদ্ধ্যনুরোধপ্রবর্তিত ব্যবহারাঃ কবয়ো দৃশ্যন্তে।" [ধ্বন্যালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতের বৃত্তিগ্রন্থেও (৩.৩২-৩৩) আনন্দবর্ধন অতি বিস্তৃতভাবে গুণবৃত্তি ও লক্ষণা—শব্দের এই দু'রকম ঔপচারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে সর্বত্রই প্রতীয়মান অর্থ থাকতেই হবে, বা থাকলেও তার রমণীয়তা থাকতে হবে—এরকম কোনও নিয়ম যে সম্ভব নয়, তা নানা যুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। দ্র° বস্তুচারুত্বপ্রতীতয়ে…… প্রয়োগদর্শনাৎ।…যাপি লক্ষণারূপ…ইত্যাদৌ বিষয়ে।" এই প্রসঙ্গে ধ্বন্যালোক ২.৩২ কারিকা আলোচ্য।]

ধ্বনির যে দ্বিতীয় প্রভেদ 'বিবক্ষিতান্যপর-বাচ্য', সেখানে বাচ্যার্থের প্রতীতির মধ্যে অসঙ্গতি থাকে না, বাচ্যার্থপ্রতীতি কবির দৃষ্টিতেও যেমন অভিপ্রেত, সহৃদয়ের দৃষ্টিতেও তুল্যভাবেই অভীষ্ট। সুতরাং এখানে উপচরিত শব্দবৃত্তির অবকাশই নেই। এখানে শব্দের অভিধা শক্তির দ্বারা মুখ্যার্থটির বোধ হবার পর, তার দ্বারা ব্যঞ্জনা ব্যাপারের সাহায্যে প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি ঘটে থাকে। বাচ্যার্থও যেমন সঙ্গতিপূর্ণ, ব্যঙ্গ্যার্থও সেই রকমই সামঞ্জস্যপূর্ণ—অতএব বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ দুইই সমানভাবে কবি ও সহৃদয় উভয়ের পক্ষেই বিবক্ষিত। তবে বাচ্যার্থের চমৎকারিতার থেকে ব্যঙ্গ্যার্থের চমৎকারিতা অধিক—সেই কারণে তা ধ্বনিকাব্যের উদাহরণ বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। বস্তু, অলংকার ও রস—এই ত্রিবিধ প্রতীয়মানের মধ্যে রস-ভাবাদি প্রতীয়মান অর্থই 'বিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনি'-র উদাহরণরূপে গণিত হয়ে থাকে। কেননা, কোনও কাব্যে যখন সহৃদয়ের রসাস্বাদন ঘটে থাকে তখন অবশ্যই সেই রসের উপযোগী বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাবাদির প্রতীতি স্বীকার করতেই হবে। আর বিভাবাদি অর্থ কবি-বাক্যের অভিধা শক্তির সাহায্যেই উপস্থাপিত হয়ে থাকে। সুতরাং অভিধেয় বা বাচ্যবিভাবাদি অর্থের যদি বিবক্ষা না হয় তবে প্রতীয়মান রসাদি অর্থের উপলব্ধি কোনও মতেই সম্ভব হতে পারে না।

১১

ধ্বনিকার আর একরকম ভাবে প্রতীয়মান ও বাচ্য অর্থের সম্পর্কটি দেখাবার চেষ্টা করেছেন। আমরা দেখেছি কাব্যপাঠের পর প্রথমেই বাচ্যার্থের বোধ হয়, তার পর প্রতীয়মানার্থের বোধ। কিন্তু এই দু'এর মধ্যে কার্য-কারণ ভাববশতঃ ক্রমভাব বা পৌর্বাপর্য স্বীকার করে নিলেও সেই ক্রমের সূক্ষ্মতার তারতম্যের ওপর প্রতীয়মান অর্থেরও স্বরূপতঃ ভেদ ঘটে থাকে। প্রতীয়মান অর্থ যদি 'বস্তু' বা 'অলঙ্কার' জাতীয় হয়, তবে বাচ্যার্থবোধ ও প্রতীয়মানার্থবোধের মধ্যে যে ক্রম থাকে, সেটা সহৃদয়ের কাছে সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধিগোচর হয়ে থাকে, এই দুই প্রতীতির মধ্যে ক্রম থাকার জন্যে 'বস্তু' ও 'অলঙ্কার' রূপ ব্যঙ্গ্যকে ধ্বনিকার 'সক্রম' ব্যঙ্গ্য বা 'সংলক্ষ্যক্রম' ব্যঙ্গ্য বলে অভিহিত করেছেন। ঘণ্টার প্রথম আঘাতের পরে যে মূল ধ্বনি শোনা যায়, তার পরও তার 'অনুরণন' বা 'অনুস্বান', যাকে শব্দজ শব্দ বলতে পারা যায়, তা ক্রমশঃ শোনা যায় এবং কিছুকাল পরে সেই অনুরণন মিলিয়ে যায়। সেইরকম বাচ্যার্থবোধ হবার পর যখন 'বস্তু' বা 'অলঙ্কার' ব্যঞ্জনা শক্তির সাহায্যে বোধিত হয়ে থাকে, তখন তাদের মধ্যে যে একটা সুস্পষ্ট কালিক পৌর্বাপর্যের উপলব্ধি হয়, তা সেই ঘণ্টাধ্বনির অনুরণনের সঙ্গে তুলনীয়। তাই ধ্বনিকার

এবং তাঁর অনুসরণ করে অপরাপর আলঙ্কারিকরা এই জাতীয় ব্যঙ্গ্যকে 'অনুরণনপ্রখ্য' বা 'অনুস্বানোপম' ব্যঙ্গ্য বলে নির্দেশ করে থাকেন।*

কিন্তু 'রস', 'ভাব' প্রভৃতি অর্থ যখন ব্যঞ্জনা শক্তির সাহায্যে প্রকাশিত হয়, তখন 'বাচ্যার্থ' ও 'প্রতীয়মানার্থে'র মধ্যে এই জাতীয় ক্রমের অস্তিত্ব সহৃদয়ের উপলব্ধিগোচর হয় না। বাচ্যার্থবোধের সঙ্গে সঙ্গেই যেন একই কালে রসাদি প্রতীয়মান অর্থের আস্বাদন ঘটে থাকে বলে মনে হয়--যদিও সেই 'ক্রম' অতি সূক্ষ্মভাবে, অলক্ষণীয়ভাবে বর্তমান আছেই, একথা না মেনে উপায় নেই। কেননা, বাচ্যার্থ ও প্রতীয়মানার্থের প্রতীতির মধ্যে কার্য-কারণভাব অবশ্যই স্বীকার করতে হয়—একথা আমরা আগেই বলেছি, এবং কারণ ও কার্যের মধ্যে যে সমকালীনতা সম্ভব হতে পারে না, একথা কেনা স্বীকার করবেন ? এই কারণে ধ্বনিকার রসভাবাদি প্রতীয়মান অর্থকে 'অক্রম' ব্যঙ্গ্য ব'লে নির্দেশ করেছেন—রসভাবতদাভাস-ভাবশান্ত্যাদিরক্রমঃ"। আনন্দবর্ধন যে এ দু'এর মধ্যে পৌর্বাপর্য, অতি সূক্ষ্ম হলেও, স্বীকার করতেন, তা তাঁর বৃত্তিগ্রন্থ থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়, যেখানে তিনি 'অক্রম' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন—"রসাদিরর্থো হি সহেব বাচ্যেনাবভাসতে"। অভিনব-গুপ্ত তাঁর লোচন টীকায় এর তাৎপর্য্য আরও স্পষ্ট করে ফুটিয়েছেন—"ইবশব্দেনাসংলক্ষ্যতা বিদ্যমানত্বেঽপি ক্রমস্য ব্যাখ্যাতা।" [দ্র° লোচন, পৃ ১৮০। তুলনীয়ঃ "ন খলু বিভাবানুভাবব্যভিচারিণ এব রসঃ। অপি তু রসস্তৈরিত্যস্তি ক্রমঃ। স তু লাঘবান্ন লক্ষ্যতে।"] রসভাবাদিকে 'অক্রম' এই বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করার ফলে ধ্বনিকার একথা আভাসে বোঝাতে চেয়েছেন যে 'লক্ষণা' ব্যাপারের সাহায্যে কখনও রসাদি অর্থের বোধ হতেই পারে না, কেন না লক্ষণার স্থলে বাচ্য ও লক্ষ্য— এই দুই অর্থের প্রতীতির মধ্যে 'ক্রম' বা 'পৌর্বাপর্য' কিছুতেই অপহ্নব করা সম্ভব নয়। তু° "অলক্ষ্যক্রমত্বপ্রতি-পাদনাচ্চ লক্ষণাগন্ধোঽপ্যত্র নাস্তি।"—মাণিক্যচন্দ্র : 'কাব্যপ্রকাশ-সংকেত', পৃ. ৬২ (Mysore Univ. Edn. I)]

১২

আনন্দবর্ধন এইভাবে ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও চিত্র কাব্যের ত্রিবিধ প্রভেদের যথার্থ স্বরূপ ও পরস্পর বৈলক্ষণ্য নানা উদাহরণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, যাতে এদের মধ্যে মিশ্রণের ফলে কাব্যের যে বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়, তার নিগূঢ় রহস্য আমরা যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারি। বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও রসধ্বনির সঙ্গে একদিকে যেমন অষ্টধা ভিন্ন গুণীভূতব্যঙ্গ্যের সঙ্কর বা মিশ্রণ ঘটতে পারে, ঠিক সেইরকম বাগ্‌বিকল্পের অসংখ্য প্রভেদ—যারা শব্দচিত্র বা অর্থচিত্রের অন্তর্ভূক্ত, তারাও তার সঙ্গে সঙ্কীর্ণ হয়ে সেই বৈচিত্র্যকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে। আনন্দবর্ধন এসম্বন্ধে বলেছেন—

"সগুণীভূতব্যঙ্গ্যৈঃ সালঙ্কারৈঃ সহ প্রভেদৈঃ স্বৈঃ।
সঙ্কর-সংসৃষ্টিভ্যাং পুনরপ্যুদ্দ্যোততে বহুধা ॥"—ধ্বন্যালোক, ৩.৪৩

---

* তু° "The second sub-division, where the suggested meaning intended by the poet is not grasped simultaneously with the literal one (likened to the resonance of a bell) falls, in its turn into two types .. The very name of *dhvani* has originated in this way, for it is like the resonance of a bell after it is struck ; the word *dhvonana* or *dhvani* means "resonance"—The Stcheratsky : *Theory of Poetry in India* (in *Papers of Th. Stcherbatsky*/Soviet Indology Series No. 2/Indian Studies/Past and Present, pp. 42-4)

এ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে অলঙ্কার সম্বন্ধে ধ্বনিকারের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত উদার ও নির্মোহ—শুধু ব্যঙ্গ্যসংস্পর্শহীন অলঙ্কার সংযোজনের দিকে কবির অত্যধিক অভিনিবেশকেই তিনি অনুমোদন করেন নি। কেননা, ব্যঞ্জনা ব্যাপারই কাব্যকে শাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি বাঙ্ময়ের অন্যান্য যত বিভাগ আছে, তার থেকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করে তোলে। এমন কি বহু অলঙ্কার আছে—যেমন, পর্যায়োক্ত, সমাসোক্তি, অপ্রস্তুতপ্রশংসা প্রভৃতি, যেগুলির সৌন্দর্য নির্ভর করে বাচ্য থেকে অতিরিক্ত আর একটি অর্থান্তরের প্রতীতির ওপর। ভামহ দণ্ডী উদ্ভট প্রমুখ চিরন্তন আচার্যগণ তাদের এই প্রতীয়মানতত্ত্ব সম্বন্ধে যে একেবারে অচেতন ছিলেন, তা নয় কিন্তু তাঁরা ধ্বনিকারের ন্যায় রসদৃষ্টি এবং বৈদগ্ধ্যি দৃষ্টি—একাধারে এই উভয়বিধ দৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, যার ফলে তাঁদের কাব্য-বিচার পদ্ধতি হয়েছে একদেশদর্শী, খণ্ডিত, অসংশ্লিষ্ট। আনন্দবর্ধনই তাঁর লোকোত্তর মনীষা ও সহৃদয়ত্বের বলে কাব্যসৌন্দর্যের চরম উৎসের সন্ধান লাভ করতে পেরেছিলেন, এবং প্রাচীন সাহিত্য-মীমাংসকদের দ্বারা স্বীকৃত সমস্ত তত্ত্বকে অখণ্ড কবিকর্মের মধ্যে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। কেননা ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও চিত্রের পরস্পর-বিবিক্ত শুদ্ধ রূপ ও সঙ্কীর্ণ মিশ্র রূপের সম্বন্ধে ধারণা যতক্ষণ না পরিচ্ছন্ন হতে পারছে, ততক্ষণ কোনো কবির পক্ষেই যেমন সমুন্নত কাব্যসৃষ্টি সম্ভব নয়, ঠিক সেইভাবেই কোনো সহৃদয়ের পক্ষেও কোনো কাব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ বিশ্লেষণ করে দেখাবার মত স্বচ্ছ বিচারশক্তির অধিকারী হওয়া সমান অসম্ভব। আনন্দবর্ধন ঐ সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত অকপটভাবে প্রকাশ করতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নি—

"ইত্যুক্তলক্ষণো যো ধ্বনির্বিবেচ্যঃ প্রযত্নতঃ সদ্ভিঃ।

সৎকাব্যং কর্তুং বা জ্ঞাতুং বা সম্যগভিযুক্তৈঃ॥"—ধ্বন্যালোক, ৩.৪৫। এর বৃত্তিতে ধ্বনিকার স্পষ্টভাবেই বলেছেন—"উক্তস্বরূপধ্বনিনিরূপণনিপুণা হি সৎকবয়ঃ সহৃদয়াশ্চ নিয়তমেবং কাব্যবিষয়ে পরাং প্রকর্ষপদবীমাসাদয়ন্তি।" তবে ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও চিত্রের এই বিচিত্র লীলা, যার ফলে কবির কাব্যসৃষ্টি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত, লাবণ্য ও সৌন্দর্যের আকর, অনন্ত রসের উৎস ও অন্তহীন দ্যোতনার দ্বারা চিরনবীন, তা নির্ভর করে কবির দৈবী প্রেরণার ওপর, যার অপর নাম 'শক্তি' বা 'প্রতিভা'। তাই আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকের চতুর্থ উদ্দ্যোতে এই কবি-প্রতিভারই জয়গান করে বলেছেন—

"ধ্বনেরিত্থং গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্য চ সমাশ্রয়াৎ।
ন কাব্যার্থবিরামোঽস্তি যদি স্যাৎ প্রতিভাগুণঃ॥"

এই 'প্রতিভা' সম্বন্ধে আনন্দবর্ধনের ধারণা কিরকম ছিল, তা আমরা এর পরে বিচার করে দেখবার চেষ্টা করব।

১৩

ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে কাব্যের হেতু সম্বন্ধে আচার্যগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ বর্তমান ছিল। কেউ প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস—এই তিনটিকে কাব্যের কারণ বলেছেন, কেউ প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তি—এই দুইটিকেই সমবেতভাবে কাব্যের হেতু বলে নির্দেশ করেছেন, আবার কারও কারও মতে প্রতিভাই কাব্যের একমাত্র কারণ বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। এই 'প্রতিভা'-রই অপর নাম 'শক্তি'। যদিও আনন্দবর্ধনের বহু পূর্বেই ভামহ তাঁর 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থে প্রতিভাকেই কাব্যের অনন্য হেতু বলে নির্দেশ করেছেন—"কাব্যং তু জায়তে জাতু কস্যচিৎ প্রতিভাবতঃ",

তথাপি প্রতিভার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে তিনি কোনও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেন নি। আচার্য বামনও প্রতিভাকে কবিত্বের বীজ বলে অভিহিত করেছেন, এবং প্রতিভার অভাবে কাব্যনির্মাণ যে অসম্ভব এবং দীর্ঘ অনুশীলনের ফলে কোনও প্রকারে তথাকথিত কাব্য রচনা সম্ভব হলেও তা যে সহৃদয় সমাজের উপহাসের সামগ্রী বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, একথা যদিও তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন বটে, তবুও প্রতিভার সঙ্গে কাব্যসৃষ্টির কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, এবং কাব্যের বৈচিত্র্য যে কী পরিমাণে কবির প্রতিভার ওপর নির্ভরশীল, সে বিষয়ে তিনি গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নি। ধ্বনিকারই কাব্য-নির্মাণের সঙ্গে প্রতিভার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং তার তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন এবং শব্দ ও অর্থের ব্যঞ্জকত্ব শক্তির উল্লাস ও তার অন্তহীন নবীনতা কতদূর পর্যন্ত প্রতিভার উন্মেষের দ্বারা অনুপ্রাণিত—এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যগুলি শুধুই কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু নন্দনত্বের বিস্তীর্ণ পরিধির ক্ষেত্রেও সাতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। ধ্বন্যালোকের প্রথম উদ্দ্যোতেই প্রতীয়মান অর্থের সঙ্গে কবির প্রাতিভ শক্তির নিগূঢ় সম্বন্ধের কথা তিনি এক স্মরণীয় শ্লোকে বিবৃত করেছেন—

> "সরস্বতী স্বাদু তদর্থবস্তু
> নিঃষ্যন্দমানা মহতাং কবীনাম্।
> আলোকসামান্যমভিব্যনক্তি
> পরিস্ফুরন্তং প্রতিভাবিশেষম্॥"

এই শ্লোকটিতে মহাকবিবাণীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে ধ্বনিকার অতি সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করেছেন। প্রথমতঃ, মহাকবিবাণীর সারভূত অর্থ যে 'রস'—'তৎ অর্থবস্তু' বলে আনন্দবর্ধন যাকে নির্দেশ করেছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, সেই রস যে নিঃষ্যন্দিত হয়ে থাকে, অর্থাৎ স্বতই কবিবাণী থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকে, রসসৃষ্টির জন্যে কবির যে স্বতন্ত্র কোনও প্রযত্নের অপেক্ষা থাকে না, তাও 'নিঃষ্যন্দমানা' এই ক্রিয়াপদটির প্রয়োগের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এবং সর্বশেষে কবিবাণীর এই রসনিঃষ্যন্দ যে 'প্রতিভাবিশেষের' স্ফুরণ বা উল্লাসের দ্বারাই সম্ভব হয়ে থাকে, তা উদ্ধৃত শ্লোকটির দ্বিতীয়ার্ধে উপসংহাররূপে সূচিত হয়েছে। এইভাবে প্রতিভার সঙ্গে রসদৃষ্টির ও কাব্যরচনার উপযোগী শব্দার্থ-উদ্ভাবনকৌশলের অযত্ননিষ্পাদ্য, স্বতঃসিদ্ধ সম্পর্কের কথা ধ্বনিকার অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছেন। তাই অভিনবগুপ্তাচার্য উদ্ধৃত ধ্বনি-কারিকাটির ব্যাখ্যায় প্রতিভার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন :

"প্রতিভা অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা। তস্যা 'বিশেষো' রসাবেশবৈশদ্যসৌন্দর্য(ং) কাব্যনির্মাণক্ষমত্বম্।"—লোচন, পৃ. ৯২। এখানে অভিনবগুপ্ত প্রতিভার অপূর্ববস্তুনির্মাণ-ক্ষমতার কথা যেমন বলেছেন, সেইরকম 'রসাবেশ'ও যে তার স্বাভাবিক অবিচ্ছেদ্য ধর্ম তাও স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ উদ্দ্যোতের অন্তিম কারিকাতেও ধ্বনিকার সুকবিবাণীর সেই সহজ উল্লাস ও চিরনবীনতার প্রশস্তি কীর্তন করেই তাঁর গ্রন্থের উপসংহার করেছেন : "প্রতায়ন্তাং বাচো নিমিতবিবধার্থামৃতরসা

> ন সাদঃ কর্তব্যঃ কবিভিরনবদ্যে স্ববিষয়ে।
> পরস্বাদানেচ্ছাবিরতমনসো বস্তু সুকবেঃ
> সরস্বত্যেবৈষা ঘটয়তি যথেষ্টং ভগবতী॥"

এখানেও 'ভগবতী সরস্বতী' বা সুকবিবাণীর রসামৃতক্ষরণের স্বাভাবিক শক্তি ও অভিনব-বস্তুনির্মাণসামর্থ্য অনুরূপভাবেই ঘোষিত হয়েছে। এইভাবে আনন্দবর্ধন গ্রন্থের আদিতে

ও অন্তে প্রায় একই সুরে 'সারস্বত তত্ত্ব' বা কবির প্রাতিভশক্তির জয়গাথা উচ্চারণ করে 'প্রতিভা'র আবেশ ভিন্ন যে কাব্যরচনা অকল্পনীয় তা দ্বিধাহীনভাবে খ্যাপন করেছেন। আনন্দবর্ধনের এই প্রতিভা-প্রশস্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই অভিনবগুপ্ত তাঁর লোচটীকার মঙ্গলপদ-শ্লোকেই সেই লোকোত্তর সারস্বত-তত্ত্বের বন্দনা গান করে বলেছেন—

"অপূর্বং যদ্বস্তু প্রথয়তি বিনা কারণকলাং
জগদ্গ্রাবপ্রখ্যং নিজরসভরাৎ সারয়তি চ।
ক্রমাৎ প্রখ্যোপাখ্যাপ্রসরসুভগং ভাসয়তি তং
সরস্বত্যাস্তত্ত্বং কবিসহৃদয়াখ্যং বিজয়তে॥"

কবিচিত্তের এই রসাবেশবিবশতা, নীরস দুঃখশোকময় পাষাণপ্রায় বিশ্বপ্রপঞ্চের তুচ্ছাতিতুচ্ছ পদার্থরাজিকেও লোকোত্তর আনন্দ, সৌন্দর্য ও গভীর তাৎপর্যে অভিষিক্ত করবার কৃতিত্ব, প্রখ্যা (গভীর তত্ত্বদর্শন) ও উপাখ্যা (সেই দর্শনের প্রকাশক শব্দসম্ভারের) সাবলীল প্রসর বা উৎসার, এবং পরিণামে কবি ও সহৃদয়ের যুগলচিত্তের পরস্পরসংবাদিনী উপলব্ধি যে সেই সারস্বত তত্ত্ব বা দৈবী প্রতিভারই উল্লাসমাত্র, অভিনবগুপ্তের উদ্ধৃত শ্লোকটিতে তাই অপরূপ দার্শনিকতা ও কবিসুলভ অপরোক্ষ অনুভূতির সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ 'পুরস্কার' কবিতাটিতেও কি একই সত্যের ঘোষণা আমরা শুনতে পাই না? এখানেও কবি 'জননী ভারতী'কে উদ্দেশ করে তাঁর অন্তরের ব্যাকুলতা নিবেদন করেছেন—"অন্তর হতে আহরি বচন/আনন্দলোক করি বিরচন,/গীতরসধারা করি সিঞ্চন/সংসারধূলি-জালে"—অন্তরবাসিনী ভগবতী বাগ্‌দেবী, যা প্রতিভারই নামান্তর মাত্র, তাঁর উদ্দেশে কবির এই একমাত্র প্রার্থনা। এবং শেষে—

"পুলকিত রাজা, আঁখি ছলছল্,
আসন ছাড়িয়া নামিলা ভূতল—
দুবাহু বাড়ায়ে, পরান উতল,
কবিরে লইলা বুকে।
কহিলা 'ধন্য, কবি গো, ধন্য
আনন্দে মন সমাচ্ছন্ন,
তোমারে কী আমি কহিব অন্য—
চিরদিন থাকো সুখে।"

এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি ও সহৃদয়ের যে হৃদয়-সংবাদ খ্যাপিত হয়েছে, তা যেন অভিনবগুপ্তপাদের উদ্ধৃত সারস্বত-প্রশস্তিরই মহাকবি-রচিত ভাষ্য। কবি ও রাজা—দু'জনেই "কল্পধেনুর অমৃতদুগ্ধ/দোহন করিছে মনে।" "হৃদয়দর্পণ"-কার ভট্টনায়ক যে বলেছেন—

"বাগ্‌ধেনুর্দুগ্ধ এতং হি রসং যদ্‌বালতৃষ্ণয়া।তেন নাস্য সমঃ স স্যাৎ দুহ্যতে যোগিভির্হি যঃ॥"—তা যে মিথ্যা নয় কবির কারয়িত্রী প্রতিভা ও সহৃদয়ের ভাবয়িত্রী প্রতিভা যে একই সারস্বত তত্ত্বের দ্বৈত স্ফুরণমাত্র তা যেন রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতায় রাজা ও কবির এই প্রেমালিঙ্গনের চিত্রে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।*

---

* তু° "There is no doubt some difference between the reader and the poet the since former's Imagination is less active and less original than the latter's. While the poet's imagination has to seek,

১৪

কিন্তু আনন্দবর্ধন শুধুই কাব্যসৃষ্টির মূল কারণরূপে প্রতিভার এই গুরুত্বের কথা ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হন নি। কাব্যহেতু রূপে কবির প্রতিভা যে অপরিহার্য মৌলিক তত্ত্ব, সে বিষয়ে আনন্দবর্ধনের পূর্বে ও পরে অনেক আচার্যই তাঁদের ঐকমত্য ঘোষণা করে গেছেন। কিন্তু আনন্দবর্ধনের প্রধান কৃতিত্ব বিশেষভাবে এইখানে যে, তিনি কাব্যের প্রত্যেকটি উপাদানের সঙ্গে কবির প্রাতিভদর্শনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। কাব্যের 'ব্যঞ্জনা' ব্যাপারের সঙ্গে প্রতিভার সম্বন্ধ, অলঙ্কারের সঙ্গে প্রতিভার যোগ ধ্বনি গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও চিত্রকাব্যের বিভিন্ন বিভাগের অঙ্গাঙ্গিভাব সাধনে কবিপ্রতিভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আনন্দবর্ধনের সমীক্ষা সম্পূর্ণ অভিনব।*

ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্গ্যের সমাবেশের সাহায্যে কাব্যসৃষ্টির যে অপূর্ব পন্থা আনন্দবর্ধন উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তার দ্বারা কবিপ্রতিভাও যে চিরনবীনতা ও সীমাহীন বৈচিত্র্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে, তা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"ধ্বনের্যঃ সগুণীভূতব্যঙ্গ্যস্যাধ্বাপ্রদর্শিতঃ।
অনেনানন্ত্যমায়াতি কবীনাং প্রতিভাগুণঃ॥"

ধ্বনিকারের এই উক্তির নিগূঢ় তাৎপর্য গভীরভাবে অনুধাবনের যোগ্য। প্রাচীনেরা অনেকেই প্রতিভাকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করতেন। সুতরাং আদিকবি বাল্মীকি প্রমুখ মহাকবিগণ তাঁদের প্রাতিভদর্শনের সাহায্যে বিশ্বের বিচিত্র পদার্থের স্বরূপ যেভাবে উপলব্ধি করে গেছেন, এবং শব্দের সাহায্যে সেই উপলব্ধ পদার্থরাজির যে বর্ণনা কাব্যাকারে নিবদ্ধ করে গেছেন, তার পর অর্বাচীন কবিকুলের প্রতিভার অভিনব কোনও ভূমিকা থাকার কথা নয়। রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা'-য় এই প্রাচীন মতেরই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন—

"পুরাণকবিক্ষুণ্ণে বর্ত্মনি দুরাপমস্পৃষ্টং বস্তু।
তস্মাত্তদেব পরিসংস্কর্তুং প্রযতেত—ইত্যাচার্যাঃ॥"

কিন্তু প্রাতিভদৃষ্টির এই অভিন্নতা ও স্থিরস্বভাবতা যদি মেনে নেওয়া যায়, তবে তা বর্তমান ও ভাবী কবিসম্প্রদায়ের পক্ষে কোনো মতেই আশাব্যঞ্জক হতে পারে না। ব্যাস-বাল্মীকি-

---

select and build and so create poetry, the reader's has simply to re-experience what is given to it But the latter is none the less a creative act. Unless the reader, by imaginative response, feels the very glow that thrilled the poet's heart, he cannot hope to relive the experience that the poet once lived through and expressed in words. The appreciation of Poetry is not a cold intellectual apprehension. The reader has to feel the original inspiration in every fibre of his being."—Prof. T. N. Sreekantaiya : '*Imagination in Indian Poetics*' : *An Introduction to Indian Poetics*, pp. 73-74

* দ্র° "What harmonises the attitude of the poet and the attitude of the critic is Vyanjana or suggestion ; in the absence of this suggestion either art will groan under the weight of the doctrines of literary appreciation or it will run riot. In this way, the principle of suggestion may be understood to establish a synthesis between law and liberty."—Prof. Kuppuswami Sastri : *The Highways and Byways of Literary Critigism in Sanskrit.*

কালিদাস প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট মহাকবির অনুকরণ, তাঁদের বাঙ্ময়ী সৃষ্টির স্থানে স্থানে পরিবর্তন ও সামান্য পরিসংস্কারেই কখনও কোনও কবির সৃষ্টিপ্রেরণা সার্থকতা বা পরিপূর্ণ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠ্‌তে পারে না। 'প্রতিভা' কখনও অনুকরণাত্মক হতে পারে না। এক কবির প্রতিভার সঙ্গে অপর কবির প্রতিভার সাদৃশ্য থাকতে পারে, কিন্তু সে সাদৃশ্য অনুকরণসঞ্জাত হতে পারে না। কেননা প্রতিভার উল্লাস সীমাহীন, অপরিচ্ছেদ্য, ঈদৃক্তা বা ইয়ত্তার দ্বারা তার পরিমাপ করা অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ জার্মাণ দার্শনিক Immanuel Kant-এর প্রতিভা সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য বলে মনে করি—

"From this it may seem that genius (i) is a *talent* for producing that for which no definite rule can be given ; and not an aptitude in the way of cleverness for what can be learned according to some rule ; and that consequently *originality* must be its primary property. (ii) Since there may also be original nonsense, its products must at the same time be models, i e. be *exemplary* ; and, consequently, though not themselves derived from imitation, they must serve that purpose for others, i. e. as a standard or rule of estimating (iii) It cannot indicate scientifically how it brings about its product, but gives the rule as *nature*. Hence, where an author owes a product to his genius, he does not himself know how the *ideas* for it have entered his head, nor has he it in his power to invent the like at pleasure, or methodically, and communicat the same to others in such precepts as would put them in a position to produce similar products."*

উদ্ধৃত সন্দর্ভে কাণ্ট কবিপ্রতিভার—যাকে তিনি genius ব'লেছেন, তিনটি প্রধান লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। প্রথমতঃ, তা' original বা মৌলিক শক্তি, প্রতি কবির প্রতিভাই স্ব-লক্ষণ, অন্য-বিলক্ষণ, স্বতন্ত্র, তা' কোনও নিয়মের বন্ধনে শৃঙ্খলিত নয়। দ্বিতীয়তঃ, তা হ'বে অন্যের আদর্শস্থানীয়। যদিও প্রতিভাবান্ কবির সাহিত্যকৃতি মোটেই অনুকরণাত্মক (imitation) নয়, তা' হ'লেও পরবর্তী কবিযশঃপ্রার্থীদের তা' হ'য়ে দাঁড়ায় অনুকরণীয়। সকলেই ব্যাস, বাল্মীকি বা কালিদাসের অনুকরণ ক'রে ক'ব ব'লে পরিচিত হতে চায়। তৃতীয়তঃ, প্রতিভা প্রকৃতির মতই স্বতঃস্ফূর্ত, তার সৃষ্টিক্ষমতা, শব্দার্থরূপে নিজেকে প্রকাশের সামর্থ্য সহজ, অযত্নলব্ধ। কোনও প্রতিভাবান্ কবির পক্ষেই কি প্রণালী অবলম্বন করে তিনি তাঁর লোকোত্তর বাঙ্ময়ী প্রতিমা সৃষ্টি ক'রতে সমর্থ হ'লেন, তা অন্যের বোধগম্য করে ভাষায় প্রকাশ একপ্রকার অসম্ভব যেমন অসম্ভব বসন্তের আবির্ভাবে কোকিল কিভাবে পঞ্চমস্বরে কূজনে প্রবৃত্ত হয়, বা শীতের পত্রহীন তরুলতা অকস্মাৎ কিভাবে নবপল্লবে শোভিত হয়ে ওঠে, তা' ব্যাখ্যা ক'রে বোঝানো।

ধ্বনিকার প্রতিভা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব যে সব আলোচনা ক'রেছেন, তার সঙ্গে দার্শনিক কাণ্টের মতবাদের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার মত। তবে তিনি ছিলেন একাধারে কবি,

* *Critiue of Judgement* (*1790*) Trans. Meredith. Sec. 16.

মনীষী দার্শনিক ও সহৃদয়-চক্রবর্তী সমালোচক। তাই তিনি কবিপ্রতিভার আনন্ত্য, বৈচিত্র্য ও নবীনতা কিভাবে সম্ভব হয়, তা তাঁর নিজস্ব কাব্যনয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা ক'রেছেন। আদিকবি বাল্মীকি তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার দ্বারা বর্ণনীয় বস্তুর স্বরূপ নিঃশেষে উপলব্ধি ক'রে গেছেন, একথা মেনে নিলেও প্রতিভা যে অনন্ত—তা স্বীকার ক'রতেই হবে। ধ্বনিকার এ' সম্বন্ধে সংক্ষেপে মন্তব্য ক'রেছেন—

"বাল্মীকি-ব্যতিরিক্তস্য যদ্যেকস্যাপি কস্যচিৎ।
ইষ্যতে প্রতিভার্থেষু তত্তদানন্ত্যমক্ষতম্॥"

মহাকবি বাল্মীকি ছাড়া আর একজন কবিরও যদি প্রাতিভ-দর্শনের সম্ভাবনা স্বীকার করা হয়, তবে প্রতিভার আনন্ত্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাই যথেষ্ট। কিন্তু শুধু একজনই কবি নন, এই জগতে দেশভেদে, ভাষাভেদে কত বিচিত্র কবির উদ্ভব হ'য়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে। মহাভারতকার স্পষ্টই বলেছেন—

"আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতেঽপরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি॥"

একই কুরুপাণ্ডবের ইতিহাস নিয়ে, একই ইক্ষ্বাকুবংশের রাজন্যবর্গের চরিতকথা নিয়ে কালে কালে, দেশে দেশে, কত কবিই না কত কাব্য রচনা ক'রেছেন। কিন্তু কোনোটিই নিছক পুনরুক্তি বা অনুকরণ নয়,প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র সৃষ্টি। এর ব্যাখ্যা কি? আনন্দবর্ধন তাঁর 'কাব্যনয়' অবলম্বনে এই আনন্ত্যের মূল অনুসন্ধান ক'রতে চেয়েছেন। আমরা দেখেছি—প্রতিভার দু'টি দিক্ আছে। একটি objective ও অপরটি subjective অব্‌জেকটিভ বা বস্তুনিষ্ঠ দিকটি বলতে শব্দ ও অর্থকে নির্দেশ করা যেতে পারে। আর subjective বা আত্মগত রূপটি কবির রসদৃষ্টি, যা প্রতি কবির প্রাতিস্বিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। প্রতিভার এই দ্বৈতরূপের দ্বন্দ্ব ও সংশ্লেষের ফলেই কাব্যবৈচিত্র্যের উদ্ভব হ'য়ে থাকে, এবং তার দ্বারা প্রতিভার আনন্ত্যও সিদ্ধ হ'য়ে থাকে।

প্রথমতঃ, শব্দ ও অর্থের বৈচিত্র্য কিভাবে সাধিত হয়, আনন্দবর্ধনের এ' বিষয়ে অভিমত কি,তাই আলোচনা করা যাক্। আমরা পূর্বেই দেখেছি শব্দ ও অর্থের মধ্যে সংকেতরূপ সম্বন্ধ নির্দিষ্ট, নিয়ত। সুতরাং শব্দের মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ সর্বদাই একরূপ। কিন্তু যাঁরা মহাকবি তাঁরা কেবলমাত্র শব্দের সেই বাচকত্ব শক্তিকে আশ্রয় করেন না, ব্যঞ্জকত্ব শক্তির সাহায্যে শব্দের নির্দিষ্ট অর্থের সীমা তাঁরা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ক'রে দিতে পারেন, এবং যেহেতু প্রকরণ, বক্তা, বোদ্ধব্য প্রভৃতি অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হ'য়ে থাকে, তাই একই শব্দ ও অর্থের বিচিত্র অর্থের প্রতীতি জন্মাবার সামর্থ্যকে কোনও নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখা সম্ভব নয়। অতএব অক্ষর, বর্ণ, পদ প্রভৃতি অভিন্ন হ'লেও যেমন তাদের সমাবেশভেদে বাক্যের রূপভেদ ঘটে, ঠিক্ সেইভাবেই একই পদ বিভিন্ন কবির কাব্যে প্রকরণাদি ভেদে বিচিত্র অর্থের দ্যোতনা ক'রতে পারে। কবিপ্রতিভার স্বাতন্ত্র্যবশতঃ বিশ্বের পদার্থরাজির মধ্যে যে নিয়তিকৃত নিয়ম অপরিবর্তনীয়ভাবে বিরাজ করে, যে নিয়মের ভিত্তিতে বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিচিত্র বিদ্যার উদ্ভব ও বিকাশ, সেই নিয়মও উল্লঙ্ঘিত হ'য়ে থাকে। তা' ছাড়া কোনও একজন কবি তাঁর প্রতিভার সাহায্যে বস্তুর যে রূপটি প্রত্যক্ষ করেন, সেই বস্তুটি যে সকল কবির দৃষ্টিতে সেই একই রূপে প্রতিভাত হ'বে, এমন কোনও নিয়ম নেই। এ'সম্বন্ধে আনন্দবর্ধনের উক্তি স্মরণীয়—

"অবস্থা-দেশ-কালাদিবিশেষৈরপি জায়তে।
আনন্ত্যমেব বাচ্যস্য শুদ্ধস্যাপি স্বভাবতঃ॥"

অর্থাৎ বস্তু বা পদার্থের শুদ্ধ স্বরূপও, ব্যঞ্জনাবৃত্তির সহিত কোনও সংস্পর্শব্যতিরেকেই অবস্থাভেদে, দেশভেদে, কালভেদে অনন্ত, অব্যবস্থিত রূপ ধারণ ক'রতে পারে—যার ফলে বিভিন্ন কবি যদি একই বস্তুর শুধু স্বভাবোক্তির সাহায্যে বর্ণনা করেন, তা হ'লেও তা নব রূপে প্রতিভাত হ'য়ে থাকে, যদিও স্বভাবোক্তির ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনার কোনও অবকাশ থাকে না। সুতরাং বাচ্য আকারেই যে-বস্তুর রূপের ইয়ত্তা অবধারণ করা দুঃসাধ্য, তাই যখন সুকবির লেখনীতে ব্যঞ্জকত্বশক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়, তবে তা যে কত বিচিত্র অর্থের দ্যোতক হ'য়ে উঠবে, তা' কে নিঃশেষে বর্ণনা ক'রতে পারবে ?

এই ত' গেল প্রতিভার বস্তুনিষ্ঠ রূপ—শব্দ ও অর্থ যার বিষয়। এ' ছাড়া আছে subjective বা আত্মনিষ্ঠ রূপ। কবি যখন কোনো কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি কোনো না কোনো রসের আবেশে সমাহিত হ'য়ে পড়েন। তখন সেই মূল রসের দ্বারা তাঁর প্রাতিভ দর্শনও অভিষিক্ত হ'য়ে ওঠে এবং বর্ণনীয় পদার্থরাজিও—তা' চেতনই হোক্ বা অচেতনই হোক্, সবই সেই রসের অনুকূল হ'য়ে বিভাব বা অনুভাবরূপে তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। ফলে বর্ণনীয় চরিত্র, পরিবেশ প্রভৃতি অভিন্ন হ'লেও কবির প্রতিভাভেদে, রসদৃষ্টি ভেদে, তারা ভিন্ন ভিন্ন রসের উদ্রেকে সাহায্য ক'রে থাকে। যে রামচরিত্র অবলম্বন ক'রে মহাকবি ভবভূতি বীররসপ্রধান 'মহাবীর-চরিত' রচনা ক'রেছেন, সেই রামচরিত্রই আবার তাঁরই রচিত করুণরসপ্রধান 'উত্তররামচরিত' নাটকের উপকরণ হ'য়েছে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন কবির রসদৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন ব'লে বিষয়বস্তুর অভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের রচনা কখনও পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হয় না। এ' সম্বন্ধে ধ্বনিকার যা' ব'লেছেন, তার মধ্যে একটি শাশ্বত কাব্যসত্য নিহিত আছে—

"দৃষ্টপূর্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ।
সর্বে নবা ইবাভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ॥"

কবির আন্তর রসানুভূতির দ্বারা অভিষিক্ত হ'য়ে দৃষ্টপূর্ব, অন্য কবির দ্বারা পূর্ববর্ণিত পদার্থ-রাজিও নবরূপে প্রতিভাত হ'য়ে থাকে, যেমন অতি প্রাচীন বৃক্ষরাজিও, যা' আমরা বহুবার দেখেছি, তারাও বসন্তসমাগমে নবরসে সঞ্জীবিত হয়ে, নবপল্লবসমৃদ্ধ হ'য়ে যেন সম্পূর্ণ নূতন, অদৃষ্টপূর্ব ব'লে মনে হয়। কালিদাসের 'মেঘদূত' অবলম্বন ক'রেই যদিও রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'র 'মেঘদূত' কবিতাটি রচনা ক'রেছেন, কিন্তু দুই কবির রসদৃষ্টি ভিন্ন হওয়াতে, বাচ্য অর্থরাজিও নবীন প্রভায় সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। এইভাবে বস্তু, অলংকার ও রসরূপ প্রতীয়মান অর্থের নব নব রূপান্তর ঘটতে থাকে মহাকবিদের রচনায়, আপাতদৃষ্টিতে বাচ্য ও বাচক, শব্দ ও অর্থ বহু ব্যবহারে যতই পুরাতন ও জীর্ণ ব'লে মনে হোক্ না কেন।

১৫

এই প্রসঙ্গে ধ্বনিকার অন্য এক সম্প্রদায়ের মত উল্লেখ ক'রেছেন, যাঁরা বলেন কাব্যের নবীনতা, তা' নির্ভর করে 'উক্তিবৈচিত্র্য' বা 'ভণিতিবৈচিত্র্যে'র ওপর। শব্দ ও অর্থের বিচিত্র সন্নিবেশ ও পরস্পর সম্বন্ধ কবিরা নিজ নিজ ব্যুৎপত্তি ও রুচি অনুসারে উদ্ভাবন ক'রে থাকেন। এই বাগ্‌বিকল্প বা অলংকারই কাব্যের নবীনতা, বৈচিত্র্য ও অন্তহীন উল্লাসের মূল কারণ—এই তাঁদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু এর বিরুদ্ধে আনন্দবর্ধনের বক্তব্য হ'ল—এই উক্তিবৈচিত্র্যের প্রকৃত স্বরূপ যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তবে দেখব যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা কবি যেসব বস্তু উপলব্ধি করেন, যা দার্শনিক পরিভাষায় 'গ্রাহ্য' (objects of cognition) ব'লে অভিহিত হ'য়ে থাকে, তাদেরই কবি যখন শব্দের সাহায্যে বর্ণনা ক'রে থাকেন, তখন তারা

হ'য়ে ওঠে 'বাচ্য'। কাব্যে এই 'বাচ্য' অর্থ এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-গ্রাহ্য বাচ্য বিষয়কে আমরা অভিন্ন ব'লে মনে ক'রে থাকি। সুতরাং গ্রাহ্যবৈচিত্র্য বাচ্যবৈচিত্র্যের মূল, এবং বাচক শব্দের বৈচিত্র্যের সাহায্যেই, যাকে 'ভণিতিবৈচিত্র্য' বলা হ'য়ে থাকে, সেই বাচ্যবৈচিত্র্যকে কবি কাব্যে ফুটিয়ে তুলে থাকেন। অতএব শেষ পর্যন্ত 'ভণিতিবৈচিত্র্য' ও গ্রাহ্য-বিষয়ের বৈচিত্র্যও স্বলক্ষণ বৈশিষ্ট্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ব'লে স্বীকার করা ছাড়া উপায় নাই। এবং বস্তুর এই স্বলক্ষণ বিশিষ্ট রূপ, যা কবি কাব্যে বর্ণনা করতে চান তা যে সাধারণ লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হ'তে পারে না, তা যে কবির লোকোত্তর প্রাতিভ দর্শনের সাহায্যেই উপলব্ধ হ'তে পারে', তা' কেই বা অস্বীকার করবেন। অতএব শেষ পর্যন্ত 'প্রতিভা' কেই ভণিতি-বৈচিত্র্যেরও মূল বলে স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাই প্রতিভাই যে শব্দ ও অর্থের ব্যঞ্জনা শক্তির সাহায্যে লোকদৃষ্ট সামান্যরূপ পদার্থরাজিকেও রসভাবাদি প্রতীয়মান অর্থের সঙ্গে সম্মিলিত করে তাদের মধ্যে চিরনবীনতা আধান ক'রে থাকে, এ'কথা উক্তিবৈচিত্র্য পক্ষ যাঁরা সমর্থন করেন, তাঁদেরও অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হ'বে। এ সম্বন্ধে ধ্বনিকারের সিদ্ধান্ত তাঁর নিজের ভাষাতেই আমরা উদ্ধার করছি—

"কিমিদমুক্তিবৈচিত্র্যম্? উক্তির্হিবাচ্যবিশেষপ্রতিপাদি বচনম্। তদ্বৈচিত্র্যে কথং ন বাচ্যবৈচিত্র্যম্? বাচ্যবাচকয়োরবিনাভাবেন প্রবৃত্তেঃ। বাচ্যানাং চ কাব্যে প্রতিভাসমানানাং যদ্রূপং তত্তু গ্রাহ্যবিশেষাভেদেনৈব প্রতীয়তে। তেনোক্তিবৈচিত্র্যবাদিনা বাচ্য-বৈচিত্র্যমনিচ্ছতা-ঽপ্যবশ্যমভ্যুপগন্তব্যম্।"—ধ্বন্যালোক-বৃত্তি ৪. ৭. [পৃ ৫৪২—৪৩] বাচ্য অর্থ, যা কেবল সামান্যাকারেই শব্দের অভিধা শক্তির সাহায্যে উপস্থাপিত হয়ে থাকে, এবং বাচক শব্দ, যা কেবল সামান্যাকারেই অর্থকে উপস্থাপন করতে পারে, তাদের অর্থকে অনন্ত বিশেষাকারে রূপান্তরিত করবার যে শক্তি তাকেই আনন্দবর্ধন 'ব্যঞ্জনা' নামে অভিহিত ক'রেছেন এবং 'ব্যঞ্জনা' ব্যাপার যে কবির দৈবী প্রতিভার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ তা' আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। সুতরাং ব্যঞ্জনাব্যাপারগম্য রস ভাব, বস্তু, অলংকার প্রভৃতি প্রতীয়মান অর্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত হ'য়ে যখন বাহ্য বাস্তব পদার্থরাজি ও বিচিত্র লোকবৃত্ত উক্তিবৈচিত্র্যের সাহায্যে প্রতিভাবান্ কবির দ্বারা কাব্যে উপস্থাপিত হয়, তখন যে তা' কখনও পুনরুক্ত হ'তে পারে না, তাতে বিস্মিত হ'বার কি আছে। জগতের মূল যদিও এক, তবুও তার বিবর্তনের যেমন সীমা নেই, ক্ষয় নেই, ঠিক সেই রকমই এই কাব্যসৃষ্টির প্রবাহ অনন্ত কবিসম্প্রদায় কর্তৃক উপভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এর অন্তহীন উল্লাসের কোনও বিরাম ঘটে না। ধ্বনিকারের ভাষায়—

> "রসভাবাদিসম্বদ্ধা যদ্যৌচিত্যানুসারিণী।
> অন্বীয়তে বস্তুগতির্দেশকালাদিভেদিনী॥
> বাচস্পতিসহস্রাণাং সহস্রৈরপি যত্নতঃ।
> নিবদ্ধা সা ক্ষয়ং নৈতি প্রকৃতির্জগতামিব॥"

কাণ্ট যে geniusকে Nature-এর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, তা' যেন আনন্দবর্ধনের দূরশ্রুত বাণীরই ভাষান্তর বা প্রতিধ্বনিমাত্র।

১৬

কিন্তু এইখানে ধ্বনিকার একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন: যদি কবি-প্রতিভা অনন্ত, প্রাতিস্বিক, এবং সর্বথা স্বতন্ত্রই হয়, তবে যে সকল শব্দার্থময় কবি কর্মের ভেতর দিয়ে তার প্রকাশ ঘটবে, তাও ত' একেবারেই বিলক্ষণ হওয়া উচিত। তাদের মধ্যে পরস্পর কোনো সংবাদ বা সাদৃশ্য—যাকে ইংরেজীতে correspondence বলা হয়, তার কোনো সম্ভাবনাই

থাকতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিভাসম্পন্ন মহাকবিদের কাব্য যদি তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা যায়, তবে ত' এর বিপরীতটাই আমরা প্রায়শ: লক্ষ্য করে থাকি। আমরা ত' জানি সমসাময়িক মনীষী দিঙ্‌নাগাচার্য্য নাকি কালিদাসের কাব্যে চৌর্য্যের সাক্ষ্য আবিষ্কার ক'রে স্থূলহস্তাভিনয়ের সাহায্যে তাঁর প্রতি দোষারোপ ক'রতেন "অন্যত্র উক্তোঽয়মর্থঃ।" এ'সব কথা ত' অন্যত্র রামায়ণ প্রভৃতি মহাকাব্যে বহু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। মহাকবি ভার্জিলকে হোমারেরই নিছক অনুকর্ত্তা ব'লে সমসাময়িক সমালোচকদের কাছ থেকে অনেক বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছিল, য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুশীলন যাঁরা করেন তাঁদের কাছে এ'কথা অজ্ঞাত নয়। তা' হ'লে এই জাতীয় কবিকর্মের স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্ব কিভাবে স্বীকার করতে পারা যায়? আনন্দবর্ধনের মনেও এরকম আশঙ্কার উদয় যে হয়নি, তা' নয়। তাই তিনি তার অবতরণিকা হিসেবে বলেছেন—

"সংবাদাস্তু ভবন্ত্যেব বাহুল্যেন সুমেধসাম্।
নৈকরূপতয়া সর্বে তে মন্তব্যা বিপশ্চিতা।" ধ্বন্যালোক, ৪. ১১

সুকবিদের রচনার মধ্যেও বহুল পরিমাণেই পরস্পর সংবাদ বা সাদৃশ্য থাকতেই পারে, কিন্তু সেই কারণেই তাঁদের প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য বা আনন্ত্য এবং তাঁদের বাঙ্‌নির্মিতির অভিনবত্ব ও কাব্যত্ব কখনও ব্যাহত হ'তে পারে না। কেননা, সংবাদমাত্রই দূষণীয় বা পরিহার্য্য নয়। সংবাদের মধ্যেও তারতম্য আছে, বৈলক্ষণ্য আছে। ধ্বনিকার সংবাদের তিনরকম শ্রেণীভেদ প্রদর্শন করেছেন- একটিকে তিনি ব'লেছেন 'প্রতিবিম্বকল্প', অপরটি 'আলেখ্যপ্রখ্য' এবং তৃতীয়টি 'তুল্যদেহিতুল্য' ব'লে অভিহিত হ'য়েছে—

"সংবাদো হ্যন্যসাদৃশ্যং তৎ পুনঃ প্রতিবিম্ববৎ।
আলেখ্যাকারবত্তুল্যদেহিবচ্চ শরীরিণাম্।"

বিম্ব ও প্রতিবিম্বের মধ্যে যে সাদৃশ্য, তাকে বলা হয় 'প্রতিবিম্বকল্প'; বাহ্য বস্তুর সঙ্গে চিত্রকররচিত তার প্রতিকৃতির যে সাদৃশ্য তার নাম 'আলেখ্যপ্রখ্য' সাদৃশ্য; আর দুই স্বতন্ত্র বস্তু—তা' চেতনই হোক্ বা অচেতনই হোক্, তাদের মধ্যে পরস্পর যে সাদৃশ্য, তাকে ধ্বনিকার 'তুল্যদেহিতুল্য' সাদৃশ্য ব'লে নির্দেশ ক'রেছেন। এর মধ্যে প্রথম প্রকার সাদৃশ্যটি সর্বথা পরিহার করা কর্ত্তব্য; দ্বিতীয় প্রকার সাদৃশ্যের মধ্যে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য আছে, কেননা যদিও চিত্রকর বস্তুর অনুকরণ ক'রেই চিত্র-রচনায় ব্যাপৃত হ'ন, তা' হ'লেও তিনি নিজের প্রতিভার সাহায্যে রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজন ও বর্ণিকাঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে আলেখ্যের মধ্যে প্রাণসঞ্চার ক'রে তাকে উজ্জীবিত ক'রে তুলতে পারেন। তখন তাঁর শিল্পকর্ম হ'য়ে ওঠে প্রাণবন্ত, স্বীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। কিন্তু তা' সত্বেও একটির ওপর যে অপরটি নির্ভরশীল, তা' মানতেই হয়। অপরপক্ষে, তৃতীয় প্রকারের যে সংবাদ ধ্বনিকার উল্লেখ ক'রেছেন, যাকে তিনি 'তুল্য-দেহিতুল্য' সংবাদ বলেছেন, তার উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় দুই স্বতন্ত্র বস্তুর মধ্যে, দুই প্রাণীর মধ্যে, যাদের নিজস্ব সত্তা আছে, প্রাণ আছে। এ'রকম সাদৃশ্য, যতই প্রকট হোক্ না কেন, তাকে অবহেলা করা সম্ভব নয়। মহাকবিদের রচনার মধ্যে যে অন্যোন্যসংবাদ তা' প্রধানতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারেই ঘটে থাকে—তা' 'প্রতিবিম্বকল্প' সংবাদ নয়। ধ্বনিকার এ'বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত অতি স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছেন দুটি কারিকার মধ্যে—

"তত্র পূর্বমনন্যাত্ম তুচ্ছাত্ম তদনন্তরম্।
তৃতীয়ং তু প্রসিদ্ধাত্ম নান্যসাম্যং ত্যজেৎ কবিঃ।
আত্মনোঽন্যস্য সদ্ভাবে পূর্বস্থিত্যনুযায্যপি।
বস্তু ভাতিতরাং তন্ব্যাঃ শশিচ্ছায়মিবাননম্।"—ধ্বন্যালোক, ৪. ১৩-৪

প্রতিবিম্বকল্প সাদৃশ্যে দুটি সদৃশ বস্তুর মধ্যে একটির স্বতন্ত্র কোনও সত্তাই থাকে না। তাই তারা 'অনন্যাত্ম' বা 'অভিন্নস্বরূপ'। 'আলেখ্যপ্রখ্য' সাদৃশ্যের স্থলে সদৃশ বস্তুটির যদিও স্বতন্ত্র সত্তা বা আত্মা থাকেও, তাহ'লেও তা নিতান্তই 'তুচ্ছ' বা নগণ্য। কিন্তু তৃতীয় প্রকারের যে সাদৃশ্য— তুল্যদেহিতুল্য', সেখানে দুটি বস্তুরই স্বতন্ত্র আত্মা বা সত্তা আপন মহিমায় ভাস্বর—সুতরাং এ'জাতীয় সাদৃশ্যকে নিছক অনুকরণসঞ্জাত কিছুতেই বলা চলে না, প্রত্যেক বস্তুই স্বতন্ত্র, অন্যনিরপেক্ষ সৃষ্টিরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। কেননা অর্বাচীন কবির কাব্যনির্মিতি যতই পূর্ব কবিগণের শব্দার্থ সন্নিবেশের ও কল্পনার অনুসারী হোক্ না কেন, যতই না লোকপ্রসিদ্ধ বাহ্য বস্তুস্থিতিকে তা' অনুকরণ করুক, যদি সেই সাদৃশ্যের পশ্চাতে স্বতন্ত্র আত্মার উল্লাস থাকে, তবে তার দ্বারা কখনও সৃষ্টির মর্যাদা ব্যাহত হতে পারে না, যেমন সুন্দরী রমণীর মুখচ্ছায়া যতই চন্দ্রমণ্ডলের সাদৃশ্য বহন করুক না কেন, তার দ্বারা তার লোকোত্তর সৌন্দর্যের কোনো হানি ঘটতে পারে না। এবং কবিবাঙ্‌নির্মিতির এই প্রাণভূত তত্ত্ব বা 'আত্মা' যে ধ্বনিকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতীয়মান অর্থ, এবং মুখ্যতঃ রস-ভাবাদি রূপ অর্থ, যা শব্দ ও অর্থের ব্যঞ্জনা শক্তির দ্বারাই কেবলমাত্র আস্বাদনের বিষয় হয়ে উঠতে পারে, তা' আমরা পূর্বেই উল্লেখ ক'রেছি। সেইজন্যই আনন্দবর্ধন বারংবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব যদিও অনন্ত প্রকারের সম্ভব, তা হলেও সুকবির পক্ষে প্রধানতঃ রসভাবানুকূল ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত, কেন না, রসস্পর্শে অনুকরণও সৃষ্টি হয়ে ওঠে—

"ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবেঽস্মিন্ বিবিধে সম্ভবত্যপি।
রসাদিময় একস্মিন্ কবিঃ স্যাদবধানবান্॥"

এই রস বা 'আস্বাদপ্রধান বুদ্ধি'—যাকে 'চমৎকৃতি' ব'লে ধ্বনিকার নির্দেশ ক'রেছেন, তার স্ফুরণ যদি কাব্যে সহৃদয়ের অনুভবগোচর হয়, তবে কবিবর্ণিত বস্তু যতই পূর্বসিদ্ধ বস্তুর ছায়ার দ্বারা অন্বিত হোক না, কবিবাণী কখনই অনুকরণ ব'লে নিন্দিত হতে পারে না। এইভাবে আনন্দবর্ধন প্রাচীন ঐতিহ্য ও লোকস্থিতির সঙ্গে কবির 'অপূর্বনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা', যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বলক্ষণ, স্বাধীন,—তার কিভাবে অবিরোধ ও সমন্বয় স্থাপন করতে পারা যায়, তার পথ কবি ও সহৃদয় সমাজের সমক্ষে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন, এবং কবিপ্রতিভাকে নিছক অনুকরণ-প্রবণতা ও উদ্ভট কল্পনাপ্রবণতা—যা উন্মার্গগামিতারই নামান্তর মাত্র—এই দুই বিপরীত শক্তির আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে কিভাবে স্বাধীন সৃষ্টিপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে পারা যায় তার উপায় নির্দেশ করেছেন। মহাকবি সম্প্রদায়ের এই অবিচ্ছিন্ন সৃষ্টিপ্রবাহ যে এইভাবেই পুরাতনের সঙ্গে নূতনের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলে, তা যে কখনও নিঃশেষিত হয় না— আনন্দবর্ধনের এই আশ্বাসবাণী কোন্ অনাগত কবির হৃদয়ে না আশার সঞ্চার করবে? রাজশেখর তাই ধ্বনিকারের উক্তিরই প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন—

"শব্দার্থোক্তিষু যঃ পশ্যেদিহ কিঞ্চন নূতনম্।
উল্লিখেৎ কিঞ্চন প্রাচ্যং মন্যতাং স মহাকবিঃ॥"

১৭

আচার্য আনন্দবর্ধন 'ব্যঞ্জনা' ব্যাপার ব'লে পৃথক্ এক ব্যাপারের অস্তিত্ব প্রতিপাদন ক'রে এবং তার সাহায্যে উন্মীলিত প্রতীয়মান অর্থের লোকোত্তর চমৎকারিতা স্থাপন ক'রে কাব্যসম্বন্ধে চিন্তাধারার যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করলেন, তার দূরপ্রসারী তাৎপর্য একটু গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত বলে মনে করি।

ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট, প্রমুখ আনন্দবর্ধনের পূর্বগামী চিরন্তন আলঙ্কারিক যাঁরা, তাঁরা কাব্যকে বিচার করেছেন তার বহিরঙ্গ রূপ দিয়ে। কাব্যের নানা ধরণের বিভাগ তাঁরা দেখিয়েছেন—নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ শ্রেণীতে প্রথমতঃ তাদের দ্বিধা বিভক্ত করেছেন। অনিবদ্ধ শ্রেণীকে মুক্তক, কুলক, কোষ প্রভৃতি অবান্তর শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ক'রেছেন। নিবদ্ধ শ্রেণীর সর্গবন্ধ, খণ্ডকাব্য, কথা, আখ্যায়িকা, পরিকথা প্রভৃতি ভেদে নানাপ্রকার রূপ তাঁরা উল্লেখ ক'রেছেন।* তাদের গঠনশৈলী, আঙ্গিক, শব্দপ্রয়োগ বৈচিত্র্য, সংঘটনা, অলংকার-বিন্যাস প্রভৃতি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে কাব্যের এই বিচিত্র রূপ প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র, একটির সঙ্গে আর একটির সম্পর্ক কি, কোথায় তাদের যোগসূত্র—সে সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ কোনো কৌতূহল ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু আনন্দবর্ধন ধ্বনি-তত্ত্বের ওপর ভিত্তি ক'রে কাব্যবিচারের যে অভিনব পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন, তাতে ক'রে কাব্যের এই রূপবৈচিত্র্য যে কবি-প্রতিভারই বিচিত্র উল্লাসের দ্বারা সংঘটিত হ'য়ে থাকে, তা' আমরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে শিখলাম। নিবদ্ধ কাব্যের তুলনায় অনিবদ্ধ কাব্য আকৃতিতে হ্রস্ব বলেই তার কাব্যসৌন্দর্য যে স্বল্প বা তুচ্ছ হবে, তা' নয়। কথা ও আখ্যায়িকার মধ্যে বিষয়বস্তুগত বা আঙ্গিকগত যতই প্রভেদ লক্ষিত হোক না কেন, তাদের কাব্যত্ব যে এই বাহ্য রূপবৈচিত্র্যের দ্বারা বিচার করা যায় না, অন্য মানদণ্ডের দ্বারা যে কাব্যসৃষ্টি হিসেবে তাদের সার্থকতা, বিচার করতে হ'বে, এই শিক্ষা আমরা আনন্দবর্ধনের কাছ থেকেই পেলাম। মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য আপাতদৃষ্টিতে যতই ভিন্ন ব'লে মনে হোক্ না কেন, সহৃদয়ের কাছে তাঁদের শাশ্বত আবেদনের মূল রহস্যের উৎস যে একই, তা বোঝবার ক্ষমতা ধ্বনিকারই আমাদের মধ্যে সঞ্চার করেছেন। ধ্বনিকার বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট—এঁদেরও যেমন মহাকবি বলেছেন, ঠিক্ একইভাবে 'গাহাসত্তসঈ' রচয়িতা প্রাকৃত কবি হাল, মুক্তককাব্যের প্রবীণ কবি অমরুক—তাঁদেরও মহাকবি বলে স্বীকার করতে তাঁর বাধে নি। আনন্দবর্ধন তাই দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে পেরেছেন—

"মুক্তকেষু প্রবন্ধেষ্বিব রসবন্ধাভিনিবেশিনঃ কবয়ো দৃশ্যন্তে। তথা হ্যমরুককবের্মুক্তকাঃ শৃঙ্গাররসস্যন্দিনঃ প্রবন্ধায়মানাঃ প্রসিদ্ধা এব।" [ধ্বন্যালোক, ৩.৭ বৃত্তি] আনন্দবর্ধন সাহিত্য-বিচারের এই নির্মোহ উদার দৃষ্টি পেলেন কোথা থেকে? এর একমাত্র কারণ হ'ল এই যে তিনি রসোল্লাসের অবাধিত স্ফূর্তি, রসোচিত ভঙ্গীতে বিভাবাদির বিন্যাস, রসানুকূল পদ্ধতিতে অলংকার, সংঘটনা বৃত্তি, রীতি প্রভৃতির সমাবেশের দ্বারাই কবিকর্মের সার্থকতা বিচার করেছেন; বিষয়ভেদ, ভাষাভেদ, গদ্য ও পদ্যের প্রভেদ প্রভৃতির দ্বারা কাব্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ধারণ করেন নি। এই রসবন্ধের ঔচিত্যকেই তিনি কাব্য-বিচারের সবশ্রেষ্ঠ মানদণ্ড ব'লে নির্দেশ ক'রেছেন—

"রসবন্ধোক্তমৌচিত্যং ভাতি সর্বত্র সংশ্রিতা।
রচনা বিষয়াপেক্ষং তত্তু কিঞ্চিদ্ বিভেদবৎ।"

---

* দ্র° ধ্বন্যালোক, ৩.৭ কারিকার বৃত্তি ও তত্রস্থ 'লোচন' টীকা। অপি চ : *An Introduction to Indian Poetics*. p. 83 : "The old works did not go farther than, defining Poetry as made up of Śabda and Artha, words and ideas. The old writers described Poetry as linguistic composition (Śabda and Artha), divided into Prose and Verse, Sanskrit and Prakrit, Read and Acted, and so on……"—V. Raghavan : 'Sahitya.'

প্রখ্যাত সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত ৺মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য, চিত্র, উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ধ্বনিকার কবিকর্মের যে অভিনব শ্রেণীবিভাগ উদ্ভাবন ক'রেছেন, সে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন –

"Prior to Ānandavardhana critics were carried away by the excesses of classification in Sanskrit literary criticism . It was he who inaugurated a certain way of classifying specimens of poetic art on the basis of this principle (namely, the principle of suggestion) ; in fact, it was he that was responsible for the re-classification of poetic expression under three heads . The names are Uttama, Madhyama and Adhama. Ānandavardhana himself suggetsed that this re-classification is only a tentative device which he has suggested as a challenge to the traditional classification of literature into various genera, to the traditional method of compartmental slicings and cuttings and he indicates how the unity of poetry could be preserved by fixing your attention upon the central principle of vyañjanā. You make it the leading principle of art criticism, adopt it as the source of literary charm and you can use it as a magic wand."*

১৮

ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার ভিত্তিতে কবিকর্মের উৎকর্ষ নির্ধারণের এই প্রণালী শুধুই বাঙ্ময় সৃষ্টির ক্ষেত্রেই যে প্রযোজ্য, তা' নয়। ধ্বনি শুধু শব্দের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। চারুকলা (Fine Arts)-র প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এর গতি অবাধ, এবং এর স্পর্শেই শিল্পীর আলেখ্য হ'য়ে ওঠে প্রাণবন্ত, নর্তকীর তাল-লয়াশ্রিত বিবিধ মুদ্রা, চারী প্রভৃতি অলংকরণ মণ্ডিত অঙ্গবিক্ষেপও অসাধারণ শিল্পসুষমায় সঞ্জীবিত হ'য়ে সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হয়; স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি কলাও কাব্যের সগোত্র হ'য়ে ওঠে। আনন্দবর্ধন যদিও তাঁর ধ্বনিতত্ত্ব-সমীক্ষাকে শব্দার্থময় সৃষ্টির তাৎপর্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ক'রে রেখেছেন, কিন্তু তিনিও যে অন্যান্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের সম্ভাবনা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, তা' ধ্বন্যালোকের নানা স্থলে তাঁর ইতস্ততঃ বিকীর্ণ একাধিক মন্তব্য থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে অনুমান করতে পারি। ব্যঞ্জকত্ব যে শব্দের বাচকত্ব-শক্তির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ নয়, তা বোঝাবার জন্যে ধ্বনিকার গীতের দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে ব লেছেন—

"নহি শব্দস্য বাচ্যপ্রতীতিপরামর্শ এব ব্যঞ্জকত্বে নিবন্ধনম্। তথাহি গীতাদিশব্দেভ্যোঽপি রসাভিব্যক্তিরস্তি।" [ধ্বন্যালোক, ৪র্থ উদ্দ্যোত, বৃত্তি পৃ. ৪০৫। অপি চ: "তথাহি গীতধ্বনীনামপি ব্যঞ্জকত্বমস্তি রসাদিবিষয়ম্। ন চ তেষাং বাচকত্বং লক্ষণা বা কথঞ্চিৎ লক্ষ্যতে " ঐ, পৃ. ৪২৮] লক্ষণা বা 'গৌণীবৃত্তি' যা' বাচ্যার্থ ছাড়া অন্য এক অর্থকেও প্রকাশ করতে পারে তা যে শব্দের বাচকত্ব শক্তি বা অভিধাকে আশ্রয় না ক'রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারে

---

* *An Introduction to Indian Poetics* : Edited by Prof. V. Raghavan and Professor Nagendra/Macmillan & Company Ltd. 1970, pp. 32-3.

না, সেকথা সকলেই স্বীকার ক'রে থাকেন। সেইজন্তেই অভিনবগুপ্ত লক্ষণাকে 'অভিধাপুচ্ছভূত' ব'লেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত দার্শনিক Wittgenstein-এর একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য : "Here one might speak of a Primary and a Secondary sense of a word. It is only if the word has the primary sense for you that you use it in the secondary one."*

সংগীতের ক্ষেত্রে যদিও গেয়পদের অর্থবাচকত্ব থাকে বটে, কিন্তু সেখানেও কোনও অর্থবোধের অপেক্ষা না রেখেই গ্রাম, রাগ, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি শ্রবণের দ্বারাই সহৃদয় শ্রোতার পক্ষে যে রসানুভূতি অনুভবসিদ্ধ, তা' অভিনবগুপ্ত তাঁর 'লোচন' টীকাতে অতি স্পষ্টভাবেই দেখিয়েছেন—

"যত্রাপি গীতশব্দানামর্থোঽস্তি তত্রাপি তৎপ্রতীতিরনুপযোগিনী গ্রাম-রাগানুসারেণাপহস্তিতবাচ্যানুসারিতয়া রসোদয়দর্শনাৎ।"†

শুধু গীতশব্দই যে অর্থনিরপেক্ষভাবে ব্যঞ্জক হ'তে পারে তাই নয়। অভিনয়ের স্থলে অশব্দাত্মক চেষ্টাবিশেষও যে রস, ভাব প্রভৃতির ব্যঞ্জক হয়ে উঠ্‌তে পারে, তাও ধ্বনিকার এবং অভিনবগুপ্ত নিঃসংশয়ভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন—"ন চ যৈবাভিধানশক্তিঃ সৈবাবগমনশক্তিঃ। অবাচকস্যাপি গীতশব্দাদে রসাদিলক্ষণার্থাবগমদর্শনাৎ। অশব্দস্যাপি চেষ্টাদেরর্থবিশেষপ্রকাশনপ্রসিদ্ধেঃ" [দ্রঃ ধ্বন্যালোক, ৩য় উদ্দ্যোত, বৃত্তি, পৃ. ৪১৭। এর টীকায় অভিনবগুপ্ত ব'লেছেন : "যদেব বাচকত্বং তদেব গমকত্বং যদি স্যাদবাচকস্য গমকত্বমপি ন স্যাৎ, গমকত্বেনৈব বাচকত্বমপি ন স্যাৎ। ন চৈতদুভয়মপি গীতশব্দে শব্দব্যতিরিক্তে চাধোবক্ত্র-কুচকম্পন-বাষ্পাবেশাদৌ তস্যাবাচকস্যাপি অবগমকারিত্ব-দর্শনাদবগমকারিণোঽবাচকত্বেন প্রসিদ্ধত্বাদিতি তাৎপর্যম্।"] চিত্রের ক্ষেত্রেও যে এই ব্যঞ্জনার সমান মহিমা, তা' ধ্বনিকারের 'আলেখ্যপ্রখ্য' এই নামকরণের দ্বারাই সূচিত হ'য়েছে।

এইভাবে চারুকলা বা Fine Arts-এর প্রত্যেক বিভাগেই ব্যঞ্জনা বা ধ্বনির সাম্রাজ্য অবিসংবাদিত ও সহৃদয়মাত্রেরই স্বানুভববেদ্য। আনন্দবর্ধন যেহেতু মুখ্যতঃ কাব্যতত্ত্ব নিয়েই আলোচনায় ব্যাপৃত হ'য়েছিলেন, তাই তাঁর পক্ষে অন্যান্য সুকুমার শিল্পে এর উপযোগিতা নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ব্যঞ্জনার এই 'মহাবিষয়ত্ব' সম্বন্ধে যে তিনি তীব্রভাবে সচেতন ছিলেন, তা' তাঁর নিবন্ধের নানাস্থলে ছড়িয়ে থাকা মন্তব্য থেকেই আমরা নিঃসংশয়ে অনুমান ক'রে নিতে পারি।‡

---

* Wittgenstein : *Philosophical Investigations*, Part II, p.216 (Translated by G. E. M. Anscombe. New York. 1954).

† আচার্য কুন্তকও সংগীতের সঙ্গে কাব্যের তুলনা ক'রে বলেছেন—"অপর্যালোচিতেঽপ্যর্থে বন্ধসৌন্দর্যসম্পদা। গীতবদ্ধৃদয়াহ্লাদং তদ্বিদাং বিদধাতি যৎ।"—বক্রোক্তিজীবিত, ১ম উন্মেষ, অন্তরশ্লোক ৩৭।

‡ "In fact, Vyanjanā may be regarded as the central principle of literary criticism in Sanskrit, the pivotal doctrine round which the whole scheme of art-criticism in Sanskrit revolves."—Mm. S. Kuppuswami Sāstri : *The Highways etc.* in *An Introduction to Indian Poetics*, p. 27. অপি চ : *The Nature of Aesthetic Experience* : Professor Nagendra in *Introduction* etc. p. 116.

১৮

সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের বিরুদ্ধে আধুনিক সাহিত্য-সমালোচকদের পক্ষ থেকে একটা প্রধান আপত্তি প্রায়ই আমরা শুনতে পাই যে, প্রাচীন আলঙ্করিকরা কাব্যকে অখণ্ডদৃষ্টি নিয়ে বিচার করতে জানতেন না। তাঁরা একটি শ্লোকে বা একটি পদে বা বাক্যে কত রকমের অলংকার থাকতে পারে, কতরকম ভাবে তার বিশ্লেষণ করতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ক'রে গেছেন, কিন্তু আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমগ্র কবিকর্মটি কোন্ সূত্রের দ্বারা একটি সংহতির বন্ধনে আবদ্ধ, সে সম্বন্ধে তাঁরা একেবারে নীরব। কিন্তু এই অভিযোগ যে সর্বথা সত্য নয়, তা' প্রাচীন অলংকারশাস্ত্র নিপুণভাবে অনুশীলন করলে আমরা জানতে পারি। ভামহ দণ্ডী প্রমুখ চিরন্তন আচার্যেরা 'ভাবিক' ব'লে একরকম অলংকার স্বীকার করতেন। কিন্তু অলংকার হ'লেও এ'. যে প্রবন্ধের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত বিরাজমান এবং একটি অখণ্ড কবিদৃষ্টির দ্বারাই যে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, তা' তাঁরা স্পষ্টভাবেই ব'লেছেন—

"তদ্ ভাবিকমিতি প্রাহুঃ প্রবন্ধবিষয়ং গুণম্।
ভাবঃ কবেরভিপ্রায়ঃ কাব্যেষ্বাসিদ্ধি সংস্থিতঃ।"

কিন্তু যদিও তাঁরা এইভাবে কাব্যের মূল ঐক্যের একটা সূত্র খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছিলেন বটে, তবু এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন নি। আনন্দবর্ধনই অলংকারশাস্ত্রের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান আচার্য যিনি রসধ্বনির মধ্যে সেই ঐক্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, এবং তাকে কেন্দ্র করেই যে কবির সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত আবর্তিত হয়ে থাকে, তা অপূর্ব মনীষার সাহায্যে বিশ্লেষণ ক'রে দেখান। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের দু'খানি সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য—'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' যে, যথাক্রমে 'করুণরস' ও 'শান্তরসে'র অবিচ্ছিন্ন ধারার দ্বারা সঞ্জীবিত, তা' তাঁর অতুলনীয় হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় অপূর্ব যুক্তিপরম্পরার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—

"প্রবন্ধে চাঙ্গী রস এক এবোপনিবধ্যমানোঽর্থবিশেষলাভং ছায়াতিশয়ং চ পুষ্ণাতি। কস্মিন্নিবেতি চেৎ—যথা রামায়ণে যথা বা মহাভারতে। রামায়ণে হি করুণো রসঃ স্বয়মাদিকবিনা সূত্রিতঃ 'শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ' ইত্যেবংবাদিনা। নির্ব্যূঢ়শ্চ স এব সীতাত্যন্তবিয়োগপর্যন্তমেব স্বপ্রবন্ধমুপরচয়তা। মহাভারতেঽপি শাস্ত্ররূপং কাব্যচ্ছায়ান্বয়িনি বৃষ্ণিপাণ্ডববিরসাবসানবৈমনস্যদায়িনীং সমাপ্তিমুপনিবধ্নতা বৈরাগ্যজননতাৎপর্যং প্রাধান্যেন স্বপ্রবন্ধস্য দর্শয়তা মোক্ষলক্ষণঃ পুরুষার্থঃ শান্তো রসশ্চ মুখ্যতয়া বিবক্ষাবিষয়ত্বেন সূচিতঃ" —ইত্যাদি সন্দর্ভে। আশ্চর্যের কথা রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'পুরস্কার' কবিতায় বাণীবন্দনায় 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' এই দু'খানি মহাকাব্যেরই উল্লেখ ক'রেছেন এবং যথাক্রমে করুণ ও শান্তরসের অবারিত উৎসারেই যে তাদের মহিমা অম্লান, তা অপরূপ ছন্দে বর্ণনা ক'রেছেন—'করুণ কথায় প্রকাশিল ছবি/পুণ্যকাহিনী রঘুকুলরবি/রাঘবের ইতিহাস।··· শুধু সে দিনের একখানি সুর / চিরদিন ধ'রে বহু বহু দূর / কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর / মধুর করুণ তানে।' আর মহাভারতের ?—'যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি / সে আজি কাহার তাহাও না জানি। কোথা ছিল রাজা কোথা রাজধানী / চিহ্ন নাহিকো আর / ·····বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ, / সকল আশার বিষাদ মহান্, / উদাস শান্তি করিতেছে দান / চিরমানবের প্রাণে।'

আনন্দবর্ধন ও রবীন্দ্রনাথ—দুই মহামনীষীর এই যে পরস্পর-সংবাদ, এ কি শুধুই আকস্মিক, কাকতালীয় ঘটনা? না, সাহিত্যের চিরন্তন সত্যই তাঁদের দু'জনের কণ্ঠ থেকে অনুরূপ ভাষায় উচ্চারিত হ'য়েছে? কেননা, "সংবাদিন্যো হি মহাত্মনাং বুদ্ধয়ঃ।"

ধ্বনিকারের এক মহৎ কৃতিত্ব এই যে তিনি শুধুই রসধ্বনিকে কাব্যের আত্মা ব'লে নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হ'ননি। কবিকর্মের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত, বিষয়বস্তুর যথাযথ বিন্যাসে, বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থাপনে, একাধিক রসের সমাবেশ সাধনে, পরস্পরবিরোধী রসের নির্বিরোধ সহাবস্থানের উপায় উদ্ভাবনে, রসের সঙ্গে রীতি, অলংকার, গুণ, সংঘটনা প্রভৃতি চিরন্তন আচার্যদের দ্বারা প্রকল্পিত তত্ত্বসমূহের ঔচিত্যনিরূপণে আনন্দবর্ধন যে সূক্ষ্ম রসবোধ ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তার দ্বারা তাঁকে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনির পরেই রস-প্রস্থানেরও শ্রেষ্ঠ আচার্য ব'লে বর্ণনা করা সর্বতোভাবে সমীচীন। রসবিরোধ, রসৌচিত্য রসদোষ, রসের অঙ্গাঙ্গিভাব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মম্মট, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ প্রমুখ প্রখ্যাত সাহিত্যমীমাংসকগণ যেমন ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রকে প্রমাণরূপে স্বীকার ক'রেছেন, ঠিক সেইভাবেই ধ্বনিকারের সমীক্ষারাজিও তাঁদের দৃষ্টিতে সমান মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। অতএব ডঃ কাণে যে আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য ক'রেছেন—"The *dhvani* theory is only an extension of the *rasa* theory," তা' স্থূলাংশেই যথার্থ। 'ধ্বন্যালোক' নাট্যশাস্ত্রেরই পরিপূরক গ্রন্থ, তবে যে রস ভরতমুনির দৃষ্টিতে দৃশ্যকাব্যের পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, আনন্দবর্ধন তাকে দৃশ্য শ্রব্য নির্বিশেষে, নিবদ্ধ অনিবদ্ধ সর্ববিধ কবিকর্মের মূল তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন, ব্যঞ্জনা ব্যাপারের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে তার মধ্যে অসীম বৈচিত্র্যসঞ্চারের রাজপথ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। আনন্দবর্ধনই যথার্থতঃ চিরন্তন 'অলংকারশাস্ত্র'কে 'সাহিত্য-বিদ্যা'য় উন্নীত ক'রেছেন। আরিস্ততল্-এর *Rhetoric*-এর সঙ্গে তাঁর *Poetics*-এর যে প্রভেদ, প্রাচীন অলংকারনিবন্ধের সঙ্গে 'ধ্বন্যালোকে'র পার্থক্যও ঠিক ততখানিই। এই প্রসঙ্গে একজন প্রখ্যাত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যতাত্ত্বিকের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য : "The duality of rhetoric and poetics reflects a duality in the use of speech as well as in the situation of speaking. We said that rhetoric originally was oratorical technique ; its aim and that of oratory are identical, to know how to persuade. Now this function, however far-reaching, does not cover all the use of speech. Poetics—the art of composing poems, principally tragic poems—as far as its function and situation of speaking are concerned, does not depend on rhetoric, the art of defence, of deliberation, of blame, and of praise. Poetry is not oratory. Persuasion is not its aim ; rather it purges the feelings of pity and fear. Thus, poetry and oratory mark out two distinct universes of discourse...The triad of *poiesis—mimesis—catharsis*, which cannot possibly be confused with the triad of *rhetoric-proof-persuasion*, characterises the world of poetry in an exclusive manner."*

---

* Paul Ricoeur : *The Rule of Metaphor*—Multi-disicplinary Studies on the Creation of Meaning in Language [Translated by Robert Czerny with Kathleen Mcaughalin and John Costello, S. J. Routledge and Kegan Paul/London & Henby 1978]-গ্রন্থের 'Between Rhetoric & Poetics : Aristotle' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য (pp. 9-43.)

১৯

আনন্দবর্ধনের এই অভিনব কাব্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে তাঁর পরবর্তী যুগে বহু খ্যাতনামা আলঙ্কারিক তাঁদের লেখনী ধারণ করেছিলেন, সকলেই তাঁর সিদ্ধান্ত নীরবে মেনে নেন নি। এটা নিতান্তই স্বাভাবিক। কেননা, জগতে সকলের মনোরঞ্জন করতে পারে, এমন কোন বস্তু বা চিন্তা সম্ভবই নয়—

> "নাস্ত্যেব তজ্জগতি সর্বমনোহরং যৎ।
> কেচিজ্জ্বলন্তি বিকসন্ত্যপরে নিমীল-
> ন্ত্যন্যে যদভ্যুদয়ভাজি জগৎপ্রদীপে॥"

প্রখ্যাত কাশ্মীরক আচার্য ভট্টনায়ক 'ধ্বনিধ্বংস' গ্রন্থ রচনা করলেন—তার নাম 'হৃদয়দর্পণ'। তা' আজ লুপ্ত। মহিমভট্ট প্রতীয়মান অর্থ—তা' বস্তু, অলংকার বা রস, যে জাতীয়ই হোক্ না কেন, তা' যে অনুমানের সাহায্যেই বোধগম্য হ'য়ে থাকে, তা' প্রমাণ করার জন্য রচনা করলেন 'ব্যক্তিবিবেক'। ক্ষেমেন্দ্র ব্যাসদাস, অপর এক কাশ্মীরীয় কবি ও সমালোচক, 'ঔচিত্য' বা Propriety-কেই কবির বাঙ্‌ময়ী সৃষ্টির প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হ'লেন তাঁর 'ঔচিত্য-বিচারচর্চা' নামক নিবন্ধে। আচার্য কুন্তক 'বক্রোক্তি-জীবিত' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে 'বক্রোক্তি' বা Oblique Expression-কেই কাব্যের আত্মা ব'লে ঘোষণা করলেন, এবং ধ্বনি যে সেই বক্রোক্তিরই প্রকারভেদ মাত্র, তা' প্রতিপাদনের জন্যে প্রশংসনীয় সূক্ষ্মদৃষ্টি ও রসবোধের পরিচয় দিলেন। আরও পরবর্তী কালে 'চমৎকার'-কেই কাব্যের সারভূত তত্ত্ব ব'লে স্থাপন করবার অভিনব উদ্যম লক্ষ্য করা যায় 'চমৎকার-চন্দ্রিকা' নামক নিবন্ধে। এইভাবে ধ্বনিবাদ নানা মনীষীর দৃষ্টিতে নানাভাবে সমালোচিত ও বিশ্লেষিত হ'য়েছে। কিন্তু ধ্বনিবাদের মাহাত্ম্য, আনন্দবর্ধনের লোকোত্তর মনীষা ও সাহিত্য-সম্বন্ধে তাঁর উদার স্বচ্ছ দৃষ্টি তার দ্বারা কিছুমাত্র ম্লান হয় নি। তাঁর বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁরই গ্রন্থ থেকে তাঁদের সমালোচনার উপাদান আহরণ ক'রেছেন, আনন্দবর্ধনের অভিনব সিদ্ধান্ত নতুন ক'রে সাহিত্যকে বিচার করার প্রেরণা তাঁদের মধ্যে সঞ্চার ক'রেছে তাঁদের নিজেদের অজ্ঞাতসারেই। ধ্বন্যালোকের অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাকার আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁর 'লোচন' টীকায় ভট্টনায়ক, কুন্তক, মহিমভট্ট প্রভৃতি সাহিত্য-বিচারকগণের বিরুদ্ধ সমালোচনা যে কত নিঃসার, তত্ত্বদৃষ্টিতে বিচার ক'রলে আনন্দবর্ধনের প্রবর্তিত কাব্যনয়ের সঙ্গে যে তাদের কোন বিরোধই থাক্‌তে পারে না, বরং সাহিত্যবিচারের বিচিত্র ধারা যে একমাত্র ধ্বনিপ্রস্থানে গিয়ে মিলিত হ'লেই তাদের চরম সার্থকতা ও বিশ্রান্তি লাভ করতে পারে, তা অসাধারণ দার্শনিক বিচারশক্তি ও সহৃদয়সুলভ রসদৃষ্টির সাহায্যে প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। অদ্বৈতপ্রস্থানের আচার্যগণের দৃষ্টিতে যেমন দ্বৈতবাদের বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে অদ্বৈততত্ত্বের কোনও বাস্তব বিরোধ থাক্‌তে পারে না, ঠিক তেম্‌নিই আনন্দবর্ধন যেভাবে ধ্বনির স্বরূপ ব্যাখ্যা ক'রেছেন এবং সাহিত্য ও বিভিন্ন চারুকলার ক্ষেত্রে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন, তার সঙ্গে অলংকার রীতি, বক্রোক্তি, ঔচিত্য প্রভৃতি তত্ত্বের প্রবক্তা আচার্যদের দৃষ্টিভঙ্গীর কোনও দ্বন্দ্ব সম্ভবই হ'তে পারে না। বিরোধী প্রস্থানের আচার্যদের মতবাদের মধ্যে পরস্পর সংঘাত ও বিরোধিতা থাকৃতে পারে, কিন্তু ধ্বনিবাদের সঙ্গে তাদের বিরোধ সম্পূর্ণই কাল্পনিক ও অজ্ঞানমূলক।*

* তুং "স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্। পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে॥"—গৌড়পাদাচার্য : মাণ্ডুক্যকারিকা।

অতএব অভিনবগুপ্ত যখন তাঁর 'লোচন' টীকা সম্বন্ধে বলেন—

"কিং লোচনং বিনালোকো ভাতি চন্দ্রিকয়াপি হি।
তেনাভিনবগুপ্তোঽত্র লোচনোন্মীলনং ব্যধাৎ॥"

—তখন তার মধ্যে যে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নেই, তা' ভারতীয় অলংকার-শাস্ত্রের অনুশীলন যাঁরা ক'রে থাকেন, তাঁরা একবাক্যে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন। অভিনবগুপ্তই ধ্বন্যালোকের নিগূঢ় তাৎপর্য এবং শিল্প ও সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে তার অপরিসীম গুরুত্ব আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত ক'রে গেছেন, তিনিই আমাদের 'লোচন' উন্মীলন ক'রেছেন। 'রস'ও 'ব্যঞ্জনা'র যুগল মিলনেই যে কবিপ্রতিভার মুক্তি, বাচ্যার্থের নির্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম ক'রে প্রতীয়মান অর্থের সীমাহীন, অপরিচ্ছিন্ন, চিরনবীন, অক্ষয়, অনন্ত সৌন্দর্যের জগতে উত্তরণেই যে কবিত্বের চরম উৎকর্ষ ও সার্থকতা—'ধ্বন্যালোক' নিবন্ধে আনন্দবর্ধনই এই শাশ্বত সত্য কবি ও সহৃদয়ের সাম্‌নে তুলে ধ'রেছেন। তিনি সাহিত্যস্রষ্টাদের 'সুকবি' হ'তে ব'লেছেন, 'মহাকবিত্বে'-র সমুন্নত আদর্শের দিকে তাঁদের বিভ্রান্ত দৃষ্টিকে ফেরাতে চেয়েছেন। কেননা ভারতীয় আদর্শ চিরকাল এই সত্যই ঘোষণা ক'রে এসেছে—"বরমকবিঃ, ন পুনঃ কুকবিঃ। কুকবিতা হি সোচ্ছ্বাসং মরণম্॥" কবি আনন্দবর্ধন তাই তাঁর 'বিষমবাণ-লীলা'র একটি প্রাকৃত গাথায় সুকবি-প্রশস্তি কীর্তন প্রসঙ্গে ব'লেছেন—

ণ অ তাণ ঘড়ই ওহী ণ অ তে দীসন্তি কহবি পুনরুত্তা।
জে বিব্‌ভমা পিআণং অত্থা বা সুকইবাণীনম্‌॥"

সুকবি-বাণীর অর্থ ও প্রিয়ার বিভ্রম—দুয়েরই কোনো অবধি নেই, দুইই সমানভাবে অপুনরুক্ত, চিরনবীন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কয়েকখানি বাংলা পত্র

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়

১

'পত্র' শব্দটি পুরনো অর্থে এই প্রবন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। এই অর্থে ব্যক্তিগত চিঠিও পত্র, আবার বাদশাহী ফরমান, একরারনামা প্রভৃতিও পত্র। কিছুকাল আগে বৃন্দাবনের ও জয়পুরের গৌড়ীয় মন্দির থেকে একাধিক ভাষায় লেখা নানা বিষয়ে অনেক পত্র সংগ্রহ করতে পারা গেছে। তার মধ্যে বাদশাহী ফরমান আছে; রাজস্থানের রাজাদের পরওয়ানা আছে; একরারনামা কবুলতি প্রভৃতি জমি কেনাবেচা ও বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কিত অনেক পত্র আছে। আবার, ধর্ম ও সম্প্রদায়গত বিষয়ের পত্রও আছে। ফার্সীতে লেখা বাদশাহী ফরমানগুলি থেকে জানতে পারি ব্রজে চৈতন্যসম্প্রদায়ের ধর্মসাধনায় আকবরের শ্রদ্ধা ও আনুকূল্য ছিল। পরবর্তীকালের মোগল সম্রাটরাও যে বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদের উপর অপ্রসন্ন ছিলেন না তার প্রমাণ আছে এই ফরমানগুলিতে। বাদশাহী ফরমান ছাড়া ফার্সীতে লেখা কয়েকহাজার পত্র পাওয়া গেছে। সেগুলি থেকে এবং তাদের উপর অঙ্কিত মোহরগুলি থেকে মোগল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ও শাসনকর্তাদের সম্বন্ধে অজ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্য মিলতে পারে। আকবরের সময় থেকে (আকবরের নির্দেশে বা দৃষ্টান্তে বা স্বাভাবিক ধর্মানুরাগবশতঃ) রাজস্থানের হিন্দু রাজারা বৃন্দাবনের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক। রাজস্থানের যে দুজন নৃপতির উদ্যমে ও অর্থে বৃন্দাবনের গোপীনাথ ও গোবিন্দের মন্দির ও সেবার ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁরা আকবরের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। রাজস্থানের বিশেষ করে জয়পুর রাজাদের এই পৃষ্ঠপোষকতার কালানুক্রমিক ইতিহাস আছে রাজস্থানীতে লেখা জয়পুর রাজাদের পরওয়ানাগুলিতে। কয়েকখানি পত্র সংস্কৃতে, তার একখানি জীবগোস্বামীর স্বহস্ত লিখিত লিখিত 'সঙ্কল্পপত্রী' অর্থাৎ উইল (দ্র. *An early testamentary document in Sanskrit*, Vrindaban Research Institute, Vrindaban, 1979)। ধর্ম ও সম্প্রদায়গত বিষয়ের পত্রগুলি ব্রজভাষায় লেখা। জমি কেনা ও বিলিব্যবস্থার পত্রগুলির ভাষা ফার্সী ও ব্রজভাষা। বাংলা পত্রের সংখ্যা কম। সামান্য যে কয়েকখানি পাওয়া গেছে সেগুলিও অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়। আর কোনো কারণে না হোক, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা গদ্যের নমুনা হিসেবে পত্রগুলির মূল্য উপেক্ষণীয় নয় অনুমান করে সেগুলি প্রকাশ করা হচ্ছে।

২

গদ্যের নমুনা ছাড়া পত্রগুলির অন্য গুরুত্বও আছে। এগুলিতে সমসাময়িক সাম্প্রদায়িক জীবনের টুকরো টুকরো খবর পাওয়া যায়। এই টুকরো খবরগুলি ফার্সী, রাজস্থানী ও ব্রজভাষার পত্রগুলির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে ব্রজের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস স্পষ্টতর ও পূর্ণতর হয়। বৃন্দাবনে জীবগোস্বামীর পরবর্তী যুগ দেবালয়ের অধিকারীর যুগ। গোবিন্দ, মদনমোহন, গোপীনাথ এবং রাধাদামোদরের ঐতিহ্য ও প্রতিপত্তিতে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ব্রজের সাম্প্রদায়িক ও অর্থনৈতিক নেতা এই চার দেবালয়ের অধিকারীরা, বিশেষ করে গোবিন্দের অধিকারী। 'ভক্তিরত্নাকর'-এর পাঠক জানেন রাধারমণ মন্দিরও ঐতিহ্যবিশিষ্ট ও প্রতিপত্তিশালী। তবে জীবগোস্বামীর তিরোধানের পর রাধারমণ অন্যান্য দেবালয়গুলি থেকে কিছু স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছিল। রাধারমণের স্বাতন্ত্র্য অনেক বিষয়ে। গোবিন্দ, মদনমোহন, গোপীনাথ, রাধাদামোদর (এমন কি রাধাবিনোদ ও

গোকুলানন্দও) বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে অন্যত্র গিয়েছিলেন। রাধারমণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাননি। রাধারমণের বিষয়সম্পত্তি ছিল না বলেই মনে হয়। জমি কেনা-বেচার কোনো দলিলে রাধারমণের নাম পাওয়া যায় নি। কোনো হিন্দু রাজা বা মোগল সম্রাট রাধারমণকে জমি উপঢৌকন, দিয়েছিলেন এমন প্রমাণ অন্তত আমার দেখা পত্রগুলিতে নেই। ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুজুকে ধর্ম বিশৃংখল হোন লাগ্যে' তখন 'শ্রীমহারাজাধিরাজ সবাই জয়সিংহজি কে সাক্ষাৎ'যে 'সর্বসমন্বয়পত্র' লেখা হয়েছিল তাতে মদনগোপাল, গোবিন্দ, গোপীনাথ, রাধাদামোদরের অধিকারীর স্বাক্ষর আছে কিন্তু রাধারমণের অধিকারীর স্বাক্ষর নেই। সাম্প্রদায়িক বহু ব্যাপারে রাধারমণ নেপথ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। গোবিন্দ, মদনমোহন, গোপীনাথ ও রাধাদামোদর এই চার দেবালয়ের অধিকারীদের ইতিহাস সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের ব্রজের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একটি বড়ো অংশের ইতিহাস। এই রকম একজন প্রভাবশালী অধিকারীর 'আজ্ঞা'য় কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' লেখা হয়েছিল। অথচ এই ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট। দেবালয়ের আয়ব্যয়, বিষয়সম্পত্তির পরিমাণ সম্বন্ধেও কিছু জানা নেই। অধিকারীদের নামের এবং সময়েরও ধারণা নেই। আবিষ্কৃত পত্রগুলি থেকে এই অজ্ঞাত ইতিহাসের কিছু তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব। ফার্সী, রাজস্থানী ও ব্রজভাষার পত্রগুলি যদিও এ ব্যাপারে প্রধান অবলম্বন, কোনো কোনো বাংলা পত্রে ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ এমন দু'একটি সংবাদ আছে যা অন্য সূত্র থেকে জানা যায় না। একখানি বাংলা পত্র (পত্রসংখ্যা-১) থেকে প্রথম জানতে পারা গেল জগন্নাথ গোস্বামী ১৭১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে গোবিন্দের সেবাধিকারী ছিলেন। আর একখানি বাংলা পত্র (পত্রসংখ্যা ৭) থেকে জানি গৌড়বাসী নিত্যানন্দের বংশধরেরা বৃন্দাবনের চার দেবালয়ের (গোবিন্দ, মদনমোহন, গোপীনাথ, রাধাদামোদর) অধিকারীকে (এবং জয়পুরের মহারাজাকে) ব্রজের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মুখপাত্র মনে করতেন। বাংলা পত্রগুলি যখন লেখা হয়েছে তার আগেই বৃন্দাবনের অধিকাংশ বিগ্রহই স্থানান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু গোবিন্দের ভাণ্ডারে বার্ষিক পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ঠিক দেওয়া হয়েছে (পত্রসংখ্যা-৪)। সীতারাম দাস 'হাসিখোবি'তে যথাসর্বস্ব গোবিন্দজীর চরণে সমর্পণ করেছেন (পত্রসংখ্যা-১১)। বাংলা পত্রগুলি থেকে জানতে পারি বিগ্রহের অবর্তমানেও অষ্টাদশ শতকে ব্রজে চার দেবালয়ের অধিকারীর প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল।

৩

সপ্তদশ শতকের প্রথম থেকেই ব্রজের গৌড়ীয় দেবালয়ের কোনো কোনোটির মধ্যে ঈর্ষা ও বিরোধ দেখা দিয়েছিল। বিরোধ কী নিয়ে এবং বিরোধের বাদী-প্রতিবাদী কারা জানতে হলে আগের ইতিহাস জানা দরকার। সে ইতিহাসের তথ্য আছে ফার্সী, রাজস্থানী ও ব্রজভাষায় লেখা পত্রগুলিতে। সেইসব পত্রের অনেকগুলির পাঠোদ্ধার করা যায়নি বলে ইতিহাসে ফাঁক আছে, সব বাদী-প্রতিবাদীকে সনাক্ত করা যায়নি। তবে এইটুকু জানা গেছে যে বিরোধ একটি নয়, একদিনেরও নয়; বাদী-প্রতিবাদীর সংখ্যাও অগণ্য।

মদনমোহন, গোবিন্দ ও রাধাদামোদর যথাক্রমে সনাতন, রূপ ও জীবের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। এই তিন বিগ্রহের সেবা বা বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে জীবগোস্বামীর জীবিতকালে প্রকাশ্যে কোনো বিরোধ দেখা দেয়নি। তার কারণ, এই তিন দেবালয়ের তথা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সর্বময় প্রভুত্ব ছিল জীবগোস্বামীর। তবে জীবগোস্বামী তাঁর অবর্তমানে বিরোধ আশঙ্কা করেছিলেন। তাই মৃত্যুর আগে তাঁর উদ্যোগে এবং টোডরমল্লের অনুরোধে আকবর এক ফরমান জারি করেছিলেন। এই ফরমানে যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে মদনমোহন ও

গোবিন্দের সেবাধিকারী ছিলেন তাঁরা মন্দির, ঠাকুর ও বিষয় -সম্পত্তির অধিকার পেলেন। সনাতন ও রূপের পর পরম্পরাক্রমে যে অধিকার জীবের ছিল তা মৃত্যুর আগে আইন সম্মতভাবে তিনি হস্তান্তরিত করলেন। (যদিও জীবের জীবিত কালে গোবিন্দ-মদনমোহনের অধিকারীরা জমি কেনা-বেচা করেছিলেন। অর্থাৎ গোবিন্দ-মদনমোহনের প্রকৃত অধিকারী তাঁরা হয়েছিলেন, হয়ত আইনসম্মতভাবে নয়। জীবের নিজের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর রাধাদামোদরের সেবাধিকারের জন্য তৈরী হল জীবের 'সঙ্কল্পপত্রী' অর্থাৎ উইল। জীবের এই ব্যবস্থায় সকলে খুশি হয়েছিলেন মনে হয় না। বিশেষ করে, 'সঙ্কল্পপত্রী'তে রাধাদামোদরের সেবাধিকারী হিসেবে কৃষ্ণদাসের মনোনয়নে গোবিন্দের অধিকারী ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন সে প্রমাণ আছে (দ্র. সা· প. প. ৮৭.১., ৩৭-৩৮)। তখন থেকে গোবিন্দ ও রাধাদামোদরের অধিকারীদের বিরোধ।

এই বিরোধের এক চাঞ্চল্যকর পরিণতি জগন্নাথ গোস্বামীকে লেখা গোপীরমণের 'কবুলতিপত্র' (পত্রসংখ্যা-১)। প্রথমে গোপীরমণ লোকটিকে চিনে নেওয়া দরকার। ব্রজভাষায় (ও ফার্সীতে) লেখা পত্রগুলি থেকে গোপীরমণের বংশপরিচয় উদ্ধার করা গেছে। ভাগবতাচার্যের তিন ছেলে – জয়দেব, হরিদাস ও কৃষ্ণদাস। এই কৃষ্ণদাস জীবগোস্বামীর সেবক (বা শিষ্য) এবং জীবের তিরোধানের পর রাধাদামোদরের অধিকারী। তিনি জীব গোস্বামীর 'কৃষ্ণার্চনদীপিকা'-র 'প্রভা' নামক টীকা লিখেছিলেন! নরহরি চক্রবর্তী জানিয়েছেন কৃষ্ণদাস গোস্বামীগ্রন্থের বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। ('শ্রীজীবের শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারী। তিঁহ নিজ গ্রন্থে ইহা কহিল বিস্তারি।' 'ভক্তিরত্নাকর', চৈতন্যাব্দ ৪২৬, ৫৩।) এখানে কৃষ্ণদাসের কোন গ্রন্থের ইঙ্গিত করা হয়েছে জানিনা, কৃষ্ণদাসের 'প্রভা' ছাড়া আর আর কোনো গ্রন্থের খবর জানা নেই। 'প্রভা'র যে কয়েকখানি পুথি দেখেছি তাতে গোস্বামী গ্রন্থের তালিকা নেই।) কৃষ্ণদাসের বৃন্দাবনপ্রাপ্তির পর তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দকুমার ও রাধাবল্লভ গৌড় থেকে এসে রাধাদামোদরের দায়িত্ব নিলেন। অনুমান করি কৃষ্ণদাসের বড়োভাই জয়দেবের ছেলে নন্দকুমার অধিকারী হয়েছিলেন এবং হরিদাসের ছেলে সহকারী ছিলেন। নন্দকুমার ও রাধাবল্লভ সম্বন্ধে কোনো সংবাদ জানা নেই। নন্দকুমারের পর তাঁর ছেলে ব্রজকুমার রাধাদামোদরের অধিকারী হন। ব্রজকুমারের লেখা একখানি পত্রের তারিখ ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং সপ্তদশ শতকের শেষাশেষি পর্যন্ত ব্রজকুমার রাধাদামোদরের অধিকারী ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে কিম্বা তার কিছু আগে ব্রজকুমার দেহরক্ষা করেন। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দের একখানি পত্রে (ব্রজকুমারের দেহরক্ষার পর লিখিত) দেখা যাচ্ছে ব্রজকুমারের স্ত্রী রাধাদামোদরের বিষয়-সম্পত্তি দুই ভাগে ভাগ করেন। এক ভাগ ব্রজকুমারের কন্যা শীতলার ছেলে গোপীমোহন পান; আর এক ভাগ পান রাধাবল্লভের পৌত্র এবং দামোদরের পুত্র গোপীরমণ। বংশলতিকা এই রকম:
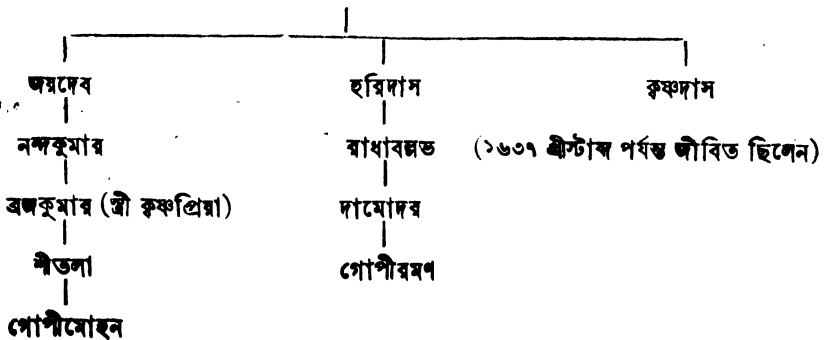
গোপীরমণ 'পঞ্চ'-র শরণাপন্ন হন। 'পঞ্চ'-র সমর্থনে গোপীরমণ ঘোষণা করেন যে, অধিকারীর দৌহিত্র রাধাদামোদরের সম্পত্তির মালিক হতে পারেন না। সুতরাং গোপীরমণই রাধাদামোদরের যাবতীয় সম্পত্তির মালিক। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে গোপীমোহন ও গোপীরমণের মধ্যে যখন বিরোধ চলছিল তখন সম্ভবতঃ গোপীরমণ গোবিন্দের অধিকারী জগন্নাথ গোস্বামীকে নিজের দলে টানবার চেষ্টা করেছিলেন। এবং তখনই জগন্নাথকে গোপীরমণ 'কবুলতিপত্র' লিখে দিয়েছিলেন। 'কবুলতিপত্র'-এ গোপীরমণ নিজের মুখে বলছেন 'পূর্বাপর হইতে শ্রী৶(জীবগোস্বামী)-র ঠাকুর শ্রী৶(রাধাদামোদর) ও কুঞ্জ ধরতি সব শ্রীশ্রী৶ (গোবিন্দজী)-র হয়েন'। গোপীরমণ অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক তাঁর 'কবুলতিপত্র'-র তারিখ ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দ। গোপীরমণের একশত বছর আগে জীব গোস্বামীর ঠাকুর এবং কুঞ্জ-ধরতি প্রভৃতি সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা হয়েছিল গোপীরমণের সময় তা ইতিহাসের সামগ্রী। সে ইতিহাস গোপীরমণের জানার কথা নয়। জীবগোস্বামীর অব্যবহিত পরেই যিনি রাধাদামোদরের অধিকারী হয়েছিলেন সেই 'জীবাখ্যমহামহিম-চরণানুচর কৃষ্ণদাস' ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখা একখানি পত্রে বলছেন 'রূপসনাতন রঘুনাথদাস গুসাই নিজেদের পুথিপত্র, শ্রীবৃন্দাবনের ও শ্রীরাধাকুণ্ডের কাগতুপত্র জীব গুসাইকে দিয়ে গিয়েছিলেন, জীব সে-সব দিয়েছিলেন শ্রীবিলাসকে তিনি দিয়েছেন আমাকে'। কৃষ্ণদাসের কথার আংশিক সমর্থন আছে জীবের 'সঙ্কল্পত্রী'-তে। সুতরাং কৃষ্ণদাস মিথ্যে বলছেন মনে করার কারণ নেই। তবে অষ্টাদশ শতকে কৃষ্ণদাসের কথা মিথ্যে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছিল। তার প্রমাণ পাই ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে আরিধ পরগণার ছোট-বড়ো জমিদারের কাছে রাধাকুণ্ডবাসী রাজারাম এবং আরও কয়েকজনের পত্রে। এই পত্রে বলা হয়েছে : 'জতি রঘুনাথদাস গৌড়িয়া আমাদের গাঁয় এসে জঙ্গল কেটে টাকা দিয়ে জমি কিনে শ্রীঠাকুরাণীজীর আজ্ঞানুসারে শ্রীরাধাকুণ্ড ও কৃষ্ণকুণ্ড প্রকাশ করেছিলেন। পরে স্বেচ্ছায় তিনি নিজের অধিকার এবং শ্রীকুণ্ডের সব খতপত্র শ্রীগোবিন্দজীর অধিকারী শ্রীহরিদাস গুসাইকে দিয়ে গিয়েছিলেন।' এর বিপরীত কথা আছে রঘুনাথদাসের দলিলে (দ্রঃ সা. প. প., ৮৭, ৩৩) কৃষ্ণদাসের পত্রে। রঘুনাথ দাসের জীবিতকালে হরিদাস গোবিন্দের অধিকারী হয়েছিলেন কিনা তা বিতর্কের বিষয়। রাজারাম প্রমুখ রাধা-কুণ্ডবাসীরা পুরনো দলিলপত্র ঘেঁটে ইতিহাস লেখেননি। তাঁদের অবলম্বন জনশ্রুতি। এই জনশ্রুতি রটাবার মূলে গোবিন্দমন্দিরের অধিকারী, সম্ভবত জগন্নাথ গোস্বামী নিজে। তিনি রাজারাম প্রমুখকে যা বলেছেন তাঁরা সে কথাই সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে লিখেছেন। গোপীরমণও আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জগন্নাথের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন এবং তাঁর পড়ানো বুলি বলেছেন 'কবুলতিপত্র'-এ। জয়পুরের রাজছত্রের ছায়ায় জগন্নাথ তখন প্রবল প্রতাপান্বিত অধিকারী। সাম্প্রদায়িক বা পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে জগন্নাথকে দলে পাওয়া রাজ-অনুগ্রহ লাভ করার মত। সেই অনুগ্রহ যে গোপীরমণ পেয়েছিলেন সে কথা 'কবুলতিপত্র'-এ বলা হয়েছে।

৪

রাধাকুণ্ডের বৈষ্ণববর্গের 'সম্মতিপত্র' (পত্রসংখ্যা ২) বৃন্দাবন ও রাধাকুণ্ডের সামাজিক ইতিহাসের একখানি মূল্যবান দলিল। চৈতন্য (এবং স্বরূপ দামোদর) ছাড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে সন্ন্যাসী কেউ ছিলেন না। ব্রজবাসী বৈষ্ণবরা ছিলেন (স্থানীয় ভাষায়) 'বিরক্ত' অর্থাৎ সংসারত্যাগী। রূপসনাতন ও জীব 'বিরক্ত' ছিলেন,

তথাপি তাঁদের মধ্যে দাদা, ভাই, খুড়ো সম্পর্ক ম্লান হয়নি। জীব তিরিশ টাকা দিয়ে জমি কিনেছিলেন (রাধা দামোদর মন্দিরের জন্য) তার দলিল আছে। রঘুনাথদাস ধনী 'বিরক্ত' ছিলেন বলে জমি কিনে রাধাকুণ্ডে বড়ো বড়ো দুটো দীঘি কাটাতে পেরেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজেরও টাকাপয়সা ছিল (দ্র° সুকুমার সেন সম্পাদিত 'চৈতন্যচরিতামৃত', ১৯৬৩ [১৫]। গোবিন্দের অধিকারী হরিদাস মানসিংহের কাছ থেকে দৈনিক একটাকা 'দহাংগী' বা ভাতা পেতেন। তবে এই সব ব্রজবাসী 'বিরক্ত'-রা ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং তাঁদের টাকাপয়সা সম্প্রদায়, বৈষ্ণব বা ঠাকুরের সেবায় ব্যয় হত।

ব্রজের অধিকারীরা এবং বৈষ্ণবরা কবে থেকে সংসারী হলেন তার সঠিক নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, সব অধিকারীরা এবং সব বৈষ্ণবরা একই দিনে সংসারী হননি। রাধাদামোদরের অধিকারীদের মধ্যে এক কৃষ্ণদাসই ব্রহ্মচারী ছিলেন, তাঁর পরবর্তী সব অধিকারীরাই বিবাহিত এবং তাঁদের ছেলেরাই বংশানুক্রমে রাধা দামোদরের অধিকারী হয়েছেন। কৃষ্ণদাসের জীবিতকালের ঊর্ধ্বসীমা ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। রাধা-দামোদরের অধিকারীরা তখন থেকে বিবাহিত। অন্য দেবালয়ের সংবাদ জানা নেই। তবে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে লেখা রাধাকুণ্ডের বৈষ্ণববর্গের 'সম্মতিপত্র' দেখে অনুমান করতে পারি অন্য দেবালয়গুলিতে তখন পর্যন্তও ব্রহ্মচর্য প্রথা চালু ছিল। অনুমানের কারণ বলছি। 'সম্মতিপত্র'-এ রাধাকুণ্ডের ছোটো বড়ো নয়টি কুণ্ডের ও সেইসব কুণ্ডের প্রধান (বাসিন্দা)দের নাম পাচ্ছি। একটি প্রধান কুণ্ডের নাম নেই। সেটি রাধাদামোদরের কুণ্ড। তালিকা থেকে রাধাদামোদরের নাম বাদ পড়ার কারণ রাধাদামোদরের অধিকারীরা আগে থেকেই বিবাহিত। সুতরাং উপস্থিত ব্যাপারে তাঁদের সাক্ষ্য মূল্যহীন। প্রচলিত বিশ্বাস জগন্নাথ গোস্বামীই গোবিন্দের প্রথম বিবাহিত অধিকারী। এই বিশ্বাসের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো প্রমাণ আমার চোখে পড়েনি। তবে রাধা-কুণ্ডবাসী বৈষ্ণবদের 'সম্মতিপত্র' এ ব্যাপারের একটি অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ। অনুমান করি 'সম্মতিপত্র' খানি জগন্নাথ গোস্বামীর ব্রহ্মচর্যত্যাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। প্রতিবাদ ছাড়া আর কোনো ভাবে পত্রখানির ব্যাখ্যা করা শক্ত। ব্রহ্মচর্য ব্রজবাসী বৈষ্ণবদের চিরাগত প্রথা। সেই প্রথায় নোতুন করে আনুগত্য স্বীকারের কোনো প্রশ্নই ওঠে না যদি না কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি সেই প্রথা ভঙ্গ করতে উদ্যোগী হন। সুতরাং রাধাকুণ্ডবাসীদের পত্রখানি জগন্নাথের কাজের প্রতিবাদ হিসেবে নেওয়াই সঙ্গত। এই ব্যাখ্যা ও অনুমান ঠিক হলে গোবিন্দের অধিকারী জগন্নাথ গোস্বামী ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে অথবা তার কিছু আগে সংসারী হয়েছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃন্দাবনের ও রাধাকুণ্ডের বৈষ্ণবসমাজের মধ্যে বিশেষ করে বৃন্দাবনের গোবিন্দমন্দির ও রাধাকুণ্ডের গোবিন্দমন্দিরের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। এই পত্র থেকে একথাও জানতে পারছি যে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দের আগে এক রাধাদামোদর ছাড়া আর কোনো দেবালয়ের অধিকারী সংসারী হননি।

রাধাকুণ্ডের বৈষ্ণবদের সম্মতিপত্র'-র সঙ্গে রাধামোহনদাসের পত্র দুখানিও মিলিয়ে পড়া প্রয়োজন। ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা একখানি পত্রে (পত্রসংখ্যা ৩) রাধামোহনদাস নামক কোনো এক গোবিন্দমন্দিরের সেবক বৃন্দাবনের গোবিন্দমন্দিরের প্রবল প্রতাপান্বিত এক ব্যক্তি (হয়ত অধিকারী) জগন্নাথ গোস্বামীকে জানাচ্ছেন যে গুরু ও পরমগুরুর নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য রাধামোহনদাসের নেই। রাধামোহনদাসের পরমগুরু মথুরাদাস ফতোয়া দিয়ে গেছেন গৃহমাদিগের সঙ্গ পরিত্যাজ্য। সুতরাং রাধা-মোহনদাস বা তাঁর 'গণ' সংসারী হলে আইন বা গুরুনির্দেশ অনুসারে তাঁরা অপরাধী হবেন। রাধামোহনদাসের অপর পত্রে (পত্রসংখ্যা ৪) গোবিন্দজীর বকেয়া বার্ষিক

৫০০ শত টাকা গোবিন্দের ভাণ্ডারে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলা হয়েছে প্রতি বছর নিয়মিত ভাবে ২০০ টাকা করে বার্ষিক গোবিন্দের ভাণ্ডারে পৌঁছে দেওয়া হবে।

রাধামোহনদাসের পত্রদুখানির মর্ম বুঝতে যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে এই দুখানি পত্র থেকে অষ্টাদশ শতকের গৌড়ীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে, বৃন্দাবনের অধিকারী বিশেষ করে জগন্নাথ গোস্বামী) সম্বন্ধে এবং রাধামোহনদাস সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারছি। এক এক করে সেগুলি বুঝে নেওয়া যাক। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দের অধিকারী সংসারী হলেন (জনশ্রুতি অনুসারে জয়পুরের রাজার অনুরোধে)। রাধাদামোদর ছাড়া আর সব গৌড়ীয় দেবালয়ের অধিকারীরা তখনও ব্রহ্মচারী। সুতরাং জগন্নাথ গোস্বামী তাঁর নিজের এবং পোষ্টা জয়পুর মহারাজের প্রভাব-প্রতিপত্তির জোরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ থেকে ব্রহ্মচর্যপ্রথা তুলে দিতে উদ্যোগী হলেন। উদ্যোগ যে পুরোপুরি অহিংস ছিল না তার প্রমাণ একটু পরেই মিলবে। জগন্নাথের প্রভাবের কাছে মাথা নত না করে প্রাচীন প্রথাকে আঁকড়ে ছিলেন। রাধাকুণ্ডের বৈষ্ণবরা এবং রাধামোহনদাস নামক এক অধিকারী। রাধাকুণ্ডের বৈষ্ণবরা সংখ্যায় অনেক। জগন্নাথের বিরুদ্ধাচরণ করায় তাঁদের শাস্তি দেওয়ার কী উপায় উদ্ভাবিত হয়েছিল জানি না। নিরীহ রাধামোহনদাস নিঃসঙ্গ, তাঁর 'গণ' অবশ্যই সংখ্যায় বেশি নয়। সুতরাং আর্থিক চাপ দিয়ে রাধামোহনকে নত করার চেষ্টা হল। সে চেষ্টাও বিফল হল। রাধামোহনদাস বকেয়া শোধ করলেন নগদও দিলেন। রাধামোহন কোথাকার গোবিন্দমন্দিরের প্রধান জানতে কৌতূহল হয়। তিনি নমস্য ব্যক্তি। অখ্যাত এবং সম্ভবত দরিদ্র মন্দিরের সেবক হয়েও তখনকার দিনে পাঁচ শত টাকা বের করে দিয়েছেন তথাপি রাজার দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ এবং 'শ্রীমদ্রূপ [গো] স্বামিনাভিষিক্ত' জগন্নাথের বিরুদ্ধাচরণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। রাধামোহনদাসের পত্র থেকে একথাও স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে যে বৃন্দাবনের এবং জয়পুরের গোবিন্দমন্দিরের অধিকারীরা অপর গোবিন্দমন্দিরগুলিকে করদ রাজ্যের মত দেখতেন। তাদের কাছ থেকে বার্ষিক আদায় করতেন। অধিকারীর বিরুদ্ধাচরণ না করলে বার্ষিক মকুব করা হত। রাধামোহন প্রায় তিন বছর বার্ষিক দেন নি। জগন্নাথের বিরুদ্ধাচরণ করায় বাকি আর নগদ একসঙ্গে দিতে হয়েছে, অন্যথায় দিতে হত না।

এই তিনখানি পত্রের সঙ্গে ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে লেখা মদনমোহন, গোবিন্দ, গোপীনাথ ও রাধাদামোদরের অধিকারী যথাক্রমে কৃষ্ণচরণ, রামশরণ, রামজীবন ও ব্রজপালের পত্র (পত্রসংখ্যা ৮) মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে কুড়ি বছরের মধ্যে বৃন্দাবনের বৈষ্ণবসমাজে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনের মদনমোহন ও গোপীনাথের অধিকারী রাধাকুণ্ডের বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। যতদূর মনে হয় দেন নি। গোপীনাথের অধিকারীর সঙ্গে জগন্নাথের সদ্ভাব ছিল (দ্র° পত্রসংখ্যা ৫), সম্ভবত মদনমোহনের অধিকারীর সঙ্গেও ছিল। সুতরাং তাঁরা বিদ্রোহীর দলভুক্ত না হয়ে বোধহয় নিরপেক্ষ ছিলেন। কিন্তু ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে আর নিরপেক্ষতা নয়, চার দেবালয়ের অধিকারীরা এখন একতাবদ্ধ হয়ে সম্বন্ধীর ঘরে আহারের বাধা অপসারণে উদ্যত হয়েছেন। লক্ষণীয় ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দেও রাধারমণ গৌড়ীয় চার দেবালয়ের সঙ্গে একতাবদ্ধ নন। সুতরাং রাধারমণ-মন্দিরে তখন কী প্রথা ছিল জানার উপায় নেই।

এই প্রবন্ধে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে (১৭১০-১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দ) লেখা এগারোখানি পত্র প্রকাশিত হচ্ছে। ৫, ৬, ৭ সংখ্যক পত্রে তারিখ নেই, তবে সেগুলি গোবিন্দদেবের

অধিকারী জগন্নাথ গোস্বামীকে লেখা বলে সেগুলির লিপিকাল ১৭১০-১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দের পরে লেখা কিছু বাংলা পত্রও আছে স্থানাভাবে সেগুলি এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হল না। পত্রগুলি বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত। বৃন্দাবনের মদনমোহন মন্দির জয়পুরের গোবিন্দ মন্দির এবং মথুরা কোর্ট থেকে ফার্সী, রাজস্থানী ও ব্রজভাষার পত্রগুলির সঙ্গে বাংলা পত্রগুলিও সংগ্রহ করা হয়েছিল। বাদশাহী ফরমানগুলি পাওয়া গেছে বৃন্দাবনের রাধাদামোদর মন্দির থেকে।

১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী বাংলা পত্র পাওয়া যায়নি। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে জমি কেনার ও বিলি ব্যবস্থা করার অসংখ্য পত্রের একখানিও বাংলায় নয়। জমি স্থানীয় লোকের, স্থানীয় ভাষাতেই জমি কেনা-বেচার দলিল লেখা হয়েছে (কখনও কখনও ফার্সীতেও লেখা হয়েছে), সেটাই স্বাভাবিক। বাংলা পত্রগুলি লিখেছিলেন অধিকারীদের বাঙালি শিষ্য-সেবকেরা, সেগুলিই পাওয়া গেছে। যেগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি পাওয়া না গেলেও গুরুতর ক্ষতি হত না। যেগুলি পাওয়া যাবে আশা করা গিয়েছিল অথচ পাওয়া যায়নি সেগুলিই মূল্যবান। বাংলা পত্রের সংখ্যা কম বলে এবং তার কোনোখানি ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী নয় বলে অনুমান হয় জীব গোস্বামীর তিরোধানের পর থেকেই গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের যোগাযোগ ক্ষীণতর হয়েছিল। এর মূলে দুটি কারণ ছিল। প্রথমত জীবের পর আর কোনো শাস্ত্রকার ব্রজে ছিলেন না। কৃষ্ণদাস কবিরাজের সার্টিফিকেট সত্ত্বেও হরিদাস গোস্বামীর খ্যাতি-প্রতিপত্তি ব্রজমণ্ডলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয়ত বৃন্দাবনের অধিকারীদের বিষয়াসক্তি ও রাজ অনুরক্তি। এর পথ দেখিয়েছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজের বন্ধু হরিদাস গোস্বামী (এবং তিনিই মানসিংহের মাইনে করা প্রথম গোবিন্দের অধিকারী)। রঘুনাথদাসও রাধাকুণ্ডে জমি কিনেছিলেন: কিন্তু সে সামান্য জমি এবং তার উদ্দেশ্যও অন্য। গোবিন্দ ও মদনমোহনের অধিকারীরা জমি কিনেছিলেন, জমিদারী করার উদ্দেশ্যে। অধিকারীদের রাজ-অনুরাগের তালিকা দীর্ঘ, সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। জীব গোস্বামী গৌড়মণ্ডলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন। চিঠিপত্রের আদান প্রদান হত ভক্তদের সঙ্গে, সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে। জীব গোস্বামী জানতেন বৃন্দাবন তীর্থস্থান, তবে সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ গৌড়মণ্ডলে। সেই কারণে নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দকে গৌড়, বঙ্গ, উৎকলে পাঠিয়ে তাঁদের কাজকর্মের খবরাখবর নিতেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-এ উদ্ধৃত হয়ে জীব গোস্বামীর কয়েকখানি সংস্কৃত পত্রী রক্ষা পেয়েছে। রক্ষা পায়নি গৌড় থেকে লেখা জীব গোস্বামীকে লেখা পত্রগুলি (গোবিন্দদাস কবিরাজ কি জীব কে শুধু পদাবলী-২ পাঠিয়েছিলেন 'পত্রী' পাঠান নি ?)। রক্ষা পায়নি নীলাচল থেকে রূপ গোস্বামীকে লেখা মহাপ্রভুর পত্র। যে কয়েকখানি রক্ষা পেয়েছে সেগুলির মূল্য অকিঞ্চিৎকর। তথাপি অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের গদ্যের নমুনা হিসেবে এবং বৃন্দাবনের সমাজের টুকরো টুকরো ছবি হিসেবে পত্রগুলির হয়ত কিছু মূল্য আছে।

পাদটীকা

১. অবান্তর হলেও এ সম্বন্ধে দু একটি কথা না বলে থাকতে পারছি না। রূপ গোস্বামীকে সম্রাট আকবর ২০০ বিঘে জমি দিয়েছিলেন। জীবের সঙ্গে টোডরমল্লের পরিচয় ছিল মনে করি। কোনো কোনো ব্যাপারে টোডরমল্ল হয়ত জীবকে পরামর্শ দিতেন, 'সঙ্কল্পপত্রী' হয়ত টোডরমল্লের পরামর্শেই তৈরী হয়েছিল। জীবের জ্যাঠা ও গুরুর প্রকটীকৃত বিগ্রহ গোবিন্দদেবের মন্দির যখন তৈরী হয় তখন জীব জীবিত। অথচ এই মন্দিরের সঙ্গে কোনো সূত্রে জীবের নাম যুক্ত নয়। রূপসনাতন বা জীব কোনো মোগল সম্রাট বা হিন্দু রাজার সংস্পর্শে এসেছিলেন সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ত নয়ই অপ্রত্যক্ষ প্রমাণও নেই। আকবর বৃন্দাবনে এসেছিলেন এবং রূপ-সনাতন বা জীব তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন সেটা বানানো গল্প। তবে পরবর্তীকালের অধিকারীরা যে বিষয়-সম্পত্তির জন্য মুসলমান রাজকর্মচারীর দ্বারস্থ হতেন, ঠাকুরের নামে দেওয়া জমি নিজের নামে লিখিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেন তার ভুরিভুরি প্রমাণ আছে (একটি প্রমাণ ত এই প্রবন্ধের প্রথম চিঠিতেই আছে)। করোলির রাজা যখনই 'আজ্ঞা' করবেন তখনই সনাতন-সেবিত মদনগোপালকে করোলিতে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া মদনমোহনের অধিকারীর পত্রও এই প্রবন্ধে আছে (পত্রসংখ্যা ৯)। অধিকারীদের অত্যধিক রাজানুরক্তির ফলে বৃন্দাবনের বিগ্রহগুলি (রাধারমণ ছাড়া) রাজস্থানের রাজাদের পারিবারিক বিগ্রহ। রাজাদের ধর্মানুরাগ যদি এতই প্রবল তাহলে বিগ্রহগুলি বৃন্দাবনে পুনপ্রতিষ্ঠিত হয়নি কেন? মন্দির দূষিত হলে (সব মন্দিরই কি দূষিত হয়েছিল?) নোতুন মন্দির তৈরী হতে কোনো বাধা ছিল না।

গোবিন্দদেবের এবং গোবিন্দদেবের সেবার কৃষ্ণদাস কবিরাজের দেওয়া বর্ণনা স্মরণ করি:

> বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ সদন।
> মহাযোগপীঠ তাহাঁ রত্ন সিংহাসন ॥
> তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্র নন্দন।
> শ্রীগোবিন্দদেব সাক্ষাৎ মদন ॥
> রাজসেবা হয় তাহাঁ বিচিত্র প্রকার।
> দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার ॥
> সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ।
> সহস্র বদনে সেবা না যায় বর্ণন ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ আজ এসে 'সুবর্ণ সদন'-এর যেটুকু দেখতে পেতেন সেটুকুও রক্ষা পেয়েছে একজন বিদেশীর চেষ্টায় (F. S. Growse)। এখন এই শ্রীহীন ভগ্ন দেউলে সেবকও নেই, দেবতাও নেই। বৃন্দাবনের অধিকাংশ গৌড়ীয় মন্দির এখন হনুমান ও চামচিকে অধ্যুষিত।

শ্রীগোবিন্দজি

গোবিন্দজি

শ্রী

রাধাদামোদরজি জীবগোস্বামি

শ্রীযুত জগন্নাথ গোস্বামি শিবরাম লিখিত
শ্রীগোপীরমণ শর্ম্মন: পত্রমিদং কার্য্য
ঞ্চ আগে পূর্ব্বাপর হইতে শ্রী২ ঠাকুর
শ্রী২ ও কুঞ্জ ধরতি সব শ্রী২ রহয়েন
এখন আমি হকায়মান রাখে শ্রী২ হই
ইহাতে অন্যমৎ করিতার শ্রী২ প্রমান
ই অন্যমৎ নাহ আপনি আমাকে কৃপা করি
আমাহ রাজা জয়সিংহ জীকে মিনাইলেন প
রওয়ানা করাই আদিলেন এবং শ্রী রাজান
স্বরাপকে সাক্ষি দিয়া রাজা পাতসাহের হা
বদরবারে রবর পরওয়ানা সনন্দ করিইদিবা
ন আর আম্বেরের রাজা গিবারের পরওয়ানা লোক
রাই আদিলেন ইহাতে জথ:
ক্রি সেসকল থ:
কএতদার্থ কবু
সুদি কার্ত্তিক ৭ সম্বত ১৭৬৭

পত্র ১। [ক] শ্রীগোবিন্দজি— [খ] গোবিন্দজি [৪] ৫ [৬]
[গ] রাধাদামোদরজি ৪ জীবগোস্বামি ৩

[১] শ্রীযুত জগন্নাথ গোস্বামী চরণেষু লিখিতং[২] শ্রীগোপীরমণশর্মন: পত্রমিদং কার্য্য [৩] ঞ্চ আগে পূর্বাপর হইতে শ্রী৺(জীবগোস্বামি)র ঠাকুর [৪] শ্রী৺(রাধাদামোদরজি) ও কুঞ্জ ধরতি সব শ্রীশ্রী৺ [গোবিন্দজি]র হয়েন [৫] এখন আমিহ কায়মনেবাক্যে শ্রীশ্রী৺ (গোবিন্দজি)[র] হই [৬] ইহাতে অন্য মং করি তবে শ্রীশ্রী৺(গোবিন্দজি) প্রমাণ [৭] ই[হাতে] অন্য মং না[ই] আপনে আমাকে কৃপা করি[৮]আ মাহারাজা জয়-সিংহজিকে মিলাইলেন প[৯]রওানা করাইআ দিলেন এবং শ্রীব্রজান[১০]ন্দ রায়কে সঙ্গে দিয়া রাজা পাতসাহা[১১]র দরবারের পরওানা সনন্দ করিইয়া দিবে[১২]ন আর আম্বেরের জাগিররের পরওানা ক[১৩]রাই আ দিলেন হইাতে জে খরচ হইতে [১৪]ছে সে সকল খরচ হিসাব মাফিক দি[১৫]ব এতদর্থে কবুলতিপত্র দিলাঙ মিতি [১৬]সুদি কার্তিক ৭ সম্বত ১৭৬৭—

[ঘ] অত্র সাছি [ঙ] শ্যামকিশোর [চ] দাসশর্মনঃ [ছ] শ্রীরাধারমণ [জ] দাসশর্মণঃ

পত্র ২। [ক] শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজী— [খ]১ [গ] ২ শ্রীকুণ্ড [ঘ] শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দাদ্বৈতগদাধ [ঙ] রের ত্যাজ্য হয়ে ৫[চ] পরমপূজনীয় শ্রীযুতজগন্নাথ গোস্বামি [ছ] চরণেষু
[১] লিখিতং ৺(শ্রীকুণ্ড) বাসি বৈষ্ণববর্গানাং নির্নয়পত্রমিদং সম্বৎ ১৭৬৯ মাস শরৎ [২] কালীন পৌর্ণমাসী আগে ৺(শ্রীকুণ্ড) বাসী বৈষ্ণবীর সহিত আমরা দানাদান [৩] ভোজনাদি ব্যবহার কিছু করিব না তবে যদি আমারদিগের মধ্যে কোন বৈ[৪]ষ্ণব স্ত্রীর সহিত ব্যবহার করেন ইহা প্রতিপন্ন হএ তবে তাহার সহিত যে [৫] বৈষ্ণব সঙ্গ করিবেন তিনি ও ৺ (শ্রী চৈতন্যনিত্যানন্দগদাধরের) এই সকলের ত্যাজ্য হএন এতদর্থে স[৬]ম্মতপত্র দিলাম ইতি আশ্বিন সুদি পৌর্ণমাসী—

[১]শ্রীগোপীনাথজির কুঞ্জ, মনোহরদাসস্য রামেশ্বরদাস নবীনদাস, হরিদাস গোবিন্দদাস, করুণাময় অনন্তরাম, কৃষ্ণদাস। ২]শ্রীমদন(গোপালজী-র)কুঞ্জ, কিশোরদাসস্য, রাজারামদাস, অকিঞ্চনদাস, অনন্তরামস্য, ওগেএবা [৩] শ্রীগোবিন্দজির কুঞ্জ, জয়হরিদাস নিধিরামদাস, অকিঞ্চন অজাচক, মনোহরদাস বৈরাগী, তুলসীদাসস্য নিমদাসস্য, শান্তদাসস্য শ্রীমনোহর রায়, ভগীরথদাসস্য, রামদাসস্য, নিমদাসস্য, বৈষ্ণবদাস [৪] শ্রীগোকুলানন্দ(জীর কুঞ্জ), বিশ্বনাথস্য, কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য প্রাণবল্লভস্য সদানন্দদাস, নরহরিদাস কিঙ্করদাসস্য, শ্রীমাধব কবিরাজস্য, রাধাকৃষ্ণ মিত্রস্য, মাধবদাসস্য [৬] শ্রীভট্টজীর কুঞ্জ, মাণিকরামদাস, কৃষ্ণজীবন চাটুয্যা, রাঘবদাসস্য, শুকদেবদাসস্য, কিশোরদাসস্য [৭]শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞি গোরাঙ্গ দাস, ভগবানদাস, বৃন্দাবনদাস, রাধাচরণ দাস, গোপীচরণদাস, কিশোরদাসস্য [৮] শ্রীরাধারমণজীর কুঞ্জ, মুরলীরামস্য, হরেকৃ[ষ্ণ]দাসস্য, ভৃগুরাম, দয়ারাম, শুকদেবদাস, রসিকদাস, ভক্তদাস, বৈষ্ণবদাস [৯] শ্রীমাতা গোসাঞির কুঞ্জ, জয়কৃ[ষ্ণ] দাসব্রজকিশোরদাস, অকিঞ্চনদাস প্রসাদদাস, কানুদাস লক্ষ্মণদাস

পত্র ৩। [ক] শ্রীশ্রীগোবিন্দ [খ] দেবোজয়তি [গ] শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দাদ্বৈত [ঘ] গদাধর-ধর্মাচার্য শ্রীমদ্রূপগোস্বামি [ঙ] স্বানাভিষিক্ত শ্রীমজ্জগন্নাথগোস্বা [চ] মি চরণযুগলেষু [ছ] মথুরাদাসস্বামি

[১] লিখিতং রাধামোহনদাসশর্ম্মনঃ আদৌ [২] আমার পূর্ব পূর্ব শ্রীযুত৺সকল শ্রীশ্রী৺জুর [৩] সেবক হন তদনুসারে আমোরাও হই পূর্বাপর [৪] মতানুসারে ভজন কীর্তনাদি যথাকথঞ্চিন্ন্যায় [৫] করিতেছি এবং শ্রীশ্রীকৃপাতে করিব এই বাসনা [৬] পরন্তু আমার পরম গুরু শ্রীযুত৺(মথুরাদাসস্বামি) জুর ফত [৭] বা শ্রীশ্রী৺সরকারে আছে তৎপ্রমাণে আমা [৮] র শ্রীযুত৺প্রাণবল্লভ ঠাকুর ব্যত্তিরে ক অন্য যে কেহ তাঁহার দা [৯] য় দেন সে মিথ্যা অতএব যদি তাঁহারদিগের [১০] সংসর্গ এবং স্বরমাদিগের সঙ্গাদি আমি [১১] করি কিম্বা আমার গণ কেহ উহাঁদিগের স [১২] ঙ্গাদি করেন তবে শ্রীশ্রী৺সরকারে দণ্ডি হই [১৩] এই নির্বন্ধে লিখিঞা দিলাঙ— ইতি সম্বত [১৪] ১৭৭৩ অব্দে তাং আশ্বিন ১ পতুয়া সুদী [১৫] বকলম কঞ্জবিহারিদাসস্য ইতি—[জ] রাধামোহন [ঞ] প্রাণবল্লভ ঠাকুর ৮ [ট] দাসস্য

পত্র ৪। [ক] শ্রীগোবিন্দ [খ] দেবজয়তি [গ] শ্রীমদীশ্বরবর শ্রীযুত জগ-[ঘ] ন্নাথ গোস্বামি চরণযুগলেষু

[১] লিখিতং রাধামোহন দাসস্য কবুলতি [২] পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমোরা শ্রী [৩] শ্রী৺জুর সেব[ক]হই তাহাতে অনেক দি[৪] বস শ্রীশ্রী৺জুর সরকারের বার্ষিক [৫] পৌচে নাই অতএব ৫০০ পাঁচ সত [৬] রূপেয়া শ্রীশ্রী৺জুর ভাণ্ডারে দিব এবং প্রতি [৭] বর্ষ ২০০ দুই সত রূপৈয়া শ্রীশ্রী৺জুর ভাণ্ডা[৮]রে বার্ষিক পৌচার এই নির্বন্ধে লিখিঞা দিলাঙ [৯] ইতি সম্বত ১৭৭৩ তাং আশ্বিন ১ সুদী [১০] স্বাক্ষর কৃষ্ণবিহারিদাসস্য

[ঙ] রাধামোহনদাসস্য

পত্র ৫। [ক] শ্রীশ্রীগোপীনাথো [খ] জয়তি

[১] স্বস্তি সমস্ত প্রসস্ত গুণ গরিষ্ঠ শ্রীস শ্রী[২]গোবিন্দদেবদেবারাধিতাঙ্ঘ্রি তামরসৈ
[৩] কতানমানস পরম ভাগবতোত্তম শ্রীযুত [৪]জগন্নাথ গোস্বামী পরমোদার চারুচরি
[৫] ত্রেষু শ্রীশ্যামচরণ শর্মণো নমস্কারাবি[৬]জ্ঞাপনঞ্চ শমুভয়তঃ পরন্ত নন্দকিশোর
[৭] মানঙ্গী তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলেন [৮]অতএব তাহাদিগের প্রতি
আবিষ্ট হইয়াছেন [৯]এবং শ্রীযুত রাজাধিরাজ জু তথাশ্রীযুতরাজাম[১০]লজু ও আবিষ্ট
পত্রী লিখিয়াছেন অতএব তো[১১]মার অপরাধী সে আমার ও অপরাধী কিমধিকমিতি
[১২]তাং ফাল্গুন যুদী ৯—

পত্র ৬। [ক] শ্রীশ্রীরাধে কৃষ্ণ— [খ] শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ৩

[১] শ্রীমদ্গোবিন্দদেব পদপদ্মমকরন্দবৃন্দনন্দিতমনোমক···[২]স্বয়ং ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যতন্যমান ভগবদ্ধর্ম মর্মজ···[৩]ভূষিতেষু শ্রীযুত জগন্নাথ গোস্বামিষু পরমদয়ালু চরিত্রেষু ম··· [৪] বংশানামস্মাকহ ভবতোলব্ধ শর্মানাং পরম প্রেমালিঙ্গনানি সন্ত পরন্ত [৫] ভবতাং বিরাজন্তীমপি ভজনোন্নতিং সদা শ্রীশ্রী৺সন্নিধৌ প্রাথয়ামহে তবা··· [৬] পরঞ্চ। কার্ত্তিক মাহিনাতে শ্রীযুত মহারাজাধিরাজকে এবং আপনাকে [৭] পত্র প্রসাদি বস্ত্রাদি পাঠাইতেছিলাম সূর্যগড়ার নিকট সামগ্রী[৮]পত্র লুটিয়া লইলেক পুনশ্চ বৈষ্ণব এথানে আসিয়া সমাচার কহিলেক[৯]পরে দুই মাসের উদ্যমে আমরা সকল একত্র হইয়া পত্র পাঠাইতেছি [১০] আপনে শ্রীশ্রী সাক্ষাতে যাইয়া পত্র বস্ত্র মালা দিবেন ভা(র)তোমা[১১]র আমরা যে লিখি সে স্মরণার্থ আমরা এথানে শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজ [১২]কে আশীর্বাদ করিতেছি তাহা জানাইবেন আর পূর্ব পূর্ব গোস্বামি সকল

[গ] শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুবংশ [ঘ] ······ধাং

পত্র ৭। [ক] শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো [খ] জয়তি [গ] শ্রীরাধাগোবিন্দ ৯ [ঘ] ১৩ নিত্যানন্দ ১০ [ঙ] বীরচন্দ্র ১৪ [চ] জীবগোস্বামি ১৩

[১] স্বস্তি স্বস্তি স্ব স্ব স্থিতি প্রকাশিত জগতী পরম মঙ্গল ততি [২] নিত্যসত্য ভক্ত মত্য মূর্তি সর্ব দৈবত বৃন্দবন্দ্যমানচর [৩] ণারবিন্দ নিত্যানন্দ, নিত্যনন্দ সশ্রী নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ [৪] চৈতন্য চৈতন্য চৈতন্য তন্মমান জগদানন্দন শ্রীমন্নন্দনন্দন [৫] ভজনানন্দ বিভজন সভাজন ভাজন নিখিল সভাজন শ্রীমদ্রূপ [৬] সনাতন শ্রীমদ্রূপসনাতন কথনানুরূপ সিদ্ধ শুদ্ধ ভজন মধু [৭]মধুরীকৃত হৃদয় মধুব্রত তদেক ব্রত ততিষু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [৮] নিত্যানন্দাদ্বৈত পদপদ্ম প্রেমপরিপূর্ণ মনঃ [৯] শ্রীম (শ্রীরাধাগোবিন্দ) প্রেমসেবাধিকারিষু শ্রীযুত জগন্নাথ গোস্বামিষু সর্বে [১০] ষাং শ্রীম (নিত্যানন্দ) প্রভুবংশানাং প্রেমালিঙ্গন পূর্বক বিশেষ প্রয়ো[১১]জনবিধাপয়িত্রী পত্রী ভবদব্যাহত ভব্যকর্ত্রী ভবতীতিসদাশং [১২]সংভাবয়াম ভাবয়াম চ তদ্ভাবনায়া পরঞ্চ[১৩]শ্রীম (জীবগোস্বামি) শ্রীম (নিত্যানন্দ) প্রভুবর্চস্বান্ত প্রভৃতির যমুনাসন্নিহিত শ্রীবৃন্দা [১৪] বন ভূমি সকল লইয়া শ্রীশ্রী (বীরচন্দ্র) প্রভুকে সমর্পণ করিয়াছেন [১৫]তাঁহার সে পত্র আমারদিগের স্থানে আছেন কথক দিবস [১৬]হইল কথক কথক লোক সে ভূমিতে অধিকার করিতেছেন এম [১৭] ন শুনিতেছী অতএব তোমাকে লিখিতেছী সে সকল ভূমি যে[১৮]মতে ৵প্রভুবংশের বশীভূত বৈষ্ণবের হয়েন সুন্দর নির্মাণ হয়েন [১৯]শ্রীশ্রী৵সেবা বৈষ্ণব সেবা সে সকল স্থানে হয় তাহা আপনে মন [২০] দিয়া অবশ্য করিবে তাহাতে যত দ্রব্য লাগে তাহার সমাধান আ[২১]মরা করিব এ অর্থে শ্রীযুত গোপীরমণগোস্বামি প্রভৃতি তিনজনকে [২২]আমরা লিখিতেছী এবং মহারাজ জয়সিংহ প্রভৃতিকেও লিখিব ই[২৩]হার বিশেষ চেষ্টা করিয়া বিশেষ বার্ত্তা শীঘ্র লিখিবে[২৪] ইতি তারিখ চৈত্রস্য শুক্লা তৃতীয়া

পত্র ৮। [ক] শ্রীশ্রীগোবিন্দ [খ] শরণং (?)

[১] লিখিতং শ্রীকৃষ্ণচরণ দেবশর্মণঃ তথা শ্রীরামশরণ[২]দেবশর্মণঃ তথা শ্রীরামজীবন দেবশর্মণঃ তথা[৩]শ্রীব্রজলাল দেবশর্মণঃ অস্মাকং মর্জাদাপত্র[৪]মিদং কার্য্যঞ্চ। আগে আমরা সাম্পাতিক[৫]এই মর্জাদা নিশ্চয় করিলাম জে পরস্পর [৬] বিবাহাদি কর্মতে সম্বন্দির ঘরেতে ভোজন [৭]পরস্পর করিব ইহাতে জে অন্যথা করে [৮] সে পক্ষে দণ্ডি সম্বত ১৭৮৯ মিতি বৈশাখ বদী ২

শ্রীশ্রীমদনমোহনোজয়তি

মদনমোহন

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণচরণ শর্ম্মণঃ শ্রীমহারাজাধিরাজ—
কে আগে ইহ করার করে জব মহারাজাধিরাজ—
আজ্ঞা করে তব শ্রীশ্রী৺ জি কো লেকে করো
লিজাও মিতি শ্রাবণ সুদি ৬ সম্বৎ ১৭৭৪—

সাক্ষী

পত্র ১। [ক] শ্রীশ্রীমদনমোহনোজয়তি [খ] মদনমোহন

[১] লিখিতং শ্রীকৃষ্ণচরণ শর্মণঃ শ্রীমহারাজাধিরাজ [২] কে আগে ইহ করার করে জব মহারাজাধিরাজ[৩]আজ্ঞা করে তব শ্রীশ্রী৺(মদনমোহন)জি কো লেকে করো [৪] লি জাও মিতি শ্রাবণ সুদি ৬ সম্বৎ ১৭৭৪

পত্র ১০। [ক] শ্রীকৃষ্ণায়নমঃ [খ] গোবিন্দজীকে ৬
[১] শ্রীযুৎ কৃষ্ণবল্লব বৈরাগী ঠাকুরে[২]র সেবক [৩] বংশীদাস লিখিতং আগে আমি কু [৪]ঞ্জ বানিঞা ছিলাঙ ধর্তি মূল্য লৈয়া তা[৫]হার অর্ধেক আমার অর্ধেক রামদাসে [৬]র তার মধ্যে আমার অর্ধেক শ্রী৺(গোবিন্দজীকে) [৭]ভেট করিলাঙ আমার কেহ দাওা করে [৮] সে ঝুঠা সম্বৎ ১৭৯৮ তারিখ ৩ ফাগু স্থু [৯]ধি তীজ

পত্র ১১। [ক] শ্রীশ্রীগোবিন্দজী [খ] সম্বত ১৮০১ সাল [গ] গোসাইজীর···প্রভুর
[১] লিখিতং সিতারামদাস প্রতি— [২] আগে শ্রীশ্রী৺ (গোবিন্দজীর ওস্তভা) (?) ও
শ্রীবৃন্দাবনজী [৩]র কুঞ্জ শ্রী (গোসাইজীর) সাক্ষাতে সকল শ্রীশ্রী৺জীউ [৪]কে লিখিয়া
দিলাও এবং আর জে কীছু আ[৫]মার থাকে সকল আপন খাসিখোষিতে [৬]লিখিয়া
দিলাও জতদিন আমি জীব তত [৭] দিন জে থাই পরি সে আমার আর বাকী[৮]
সকল শ্রীশ্রীজীউর হয়ে ইহাতে জে কেহ আমার[৯]পিছে দাওা করে সে ঝুঠা ইহাতে
কাহার[১০]দাওা নাই এই করারে লিখিত করিয়া দিলা[১১]ও মিতি সম্বত ১৮০১ সাল
মাহ ভাদ্র বদী[১২]১৫ রোজ বদী—
[ঘ] লিখিতং সিতারামদাস [ঙ] উপরকো লিখা সহি

১৩৮৯ বঙ্গাব্দে উপহৃত পুস্তকের তালিকা

অচল ভট্টাচার্য ; ১০/১, হেম ব্যানার্জী লেন, হাওড়া-২

১। হাওড়া জেলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড—অচল ভট্টাচার্য

২। গঙ্গা হলেও ইতিহাস—অচল ভট্টাচার্য

অজয়েন্দ্রনাথ সরকার ; ১৯৩, আন্দুল রোড, ব্লক এল-ডি, ফ্ল্যাট-৫, হাওড়া-৯

১। উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা—অজয়েন্দ্রনাথ সরকার

অঞ্জলি চৌধুরী ; ১০৬/সি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪

১। পিকাসো—অঞ্জলি চৌধুরী

অধ্যক্ষ, বিদ্যাসাগর কলেজ ; ৩৯, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

১। শতবর্ষ স্মরণিকা : বিদ্যাসাগর কলেজ ১৮৭২-১৯৭২

অধ্যক্ষ, হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন ; দক্ষিণেশ্বর

১। কলেজ পত্রিকা : ১৯৮১ হীরালাল মজুমদার মেমেরিয়াল কলেজ

২। কলেজ পত্রিকা : হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন।

অনন্ত প্রকাশন ; ৬৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

১। আত্মকথা, ১ম খণ্ড—নরেশচন্দ্র জানা ও অন্যান্য সংপা

২। গদ্য পরম্পরা—ফাদার দ্যতিয়েন

৩। আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথ—দিলীপ মালাকার

৪। নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়, ১ম পঃ বঙ্গীয় সং—সুফি জুলফিকার হায়দার

৫। রবি-অনুরাগিনী—অমিতাভ চৌধুরী

৬। অন্য রবীন্দ্রনাথ— „

৭। সন্তানের স্বীকারোক্তি—অমৃতা প্রীতম্

৮। দুর্ধর্ষ অভিযাত্রীদের কাহিনী—বীরু চট্টোপাধ্যায়

অনাদিভূষণ দাস ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

১। দানবীর কালিদাস মল্লিক স্মারক, ১ম বর্ষ, জানুয়ারী, ১৯৮২

২। সাধারণ মোটর বিজ্ঞান

৩। শ্রীমদ্ভাগবত

৪। রাজা রামমোহন—অমিতা দেবী

অমিতাভ বসু ;

১। ভালবাসার স্বাদ নীল—অমিতাভ বসু

অশোক উপাধ্যায় ; ১৩, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৬

১। জিপসী লোককথা—নিখিল সেন

২। রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিম—অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

৩। কাফেলা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা—১২শ সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র

৪। কলিকাতা-দর্পণ (১ম পর্ব)—রাধারমণ মিত্র

৫। বাংলা বানান—মণীন্দ্রকুমার ঘোষ

৬। বাবুবৃত্তান্ত, ১ম দে'জ পরিবর্ধিত সংস্করণ—সমর সেন

৭। কলকাতার কালচার—শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

৮। বঙ্কিম সাহিত্য— অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
৯। বঙ্কিমচন্দ্র—গোপালচন্দ্র রায়
১০। Civil service in India, 1944—Akshoy Kr. Ghosal
১১। Poems of Henri Louis Vivian Derozio
১২। History of Police organisation in India & Indian village Police—University of Calcutta
১৩। জ্যোতিষ সম্পর্কে কয়েকটি অপ্রিয় প্রশ্ন—অর্জুন রায়
১৪। নির্বাসিত সাহিত্য—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫। স্বরচিত জীবনী—বিহারীলাল সরকার (জেরক্স কপি)
১৬। ইসলামি বাংলা সাহিত্য, ২য় সং—সুকুমার সেন
১৭। ভূত-ভগবান-শয়তান বনাম ডঃ কোভুর—ভবানীপ্রসাদ সাহু
১৮। Sonnet—Mohamed Fakuddin
১৯। কথায় কথায়—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
২০। স্বাতীদের এ আকাশ—প্রদীপকুমার চট্টোপাধ্যায়
২১। এই আমি একা অন্ধ—শঙ্করলাল ভট্টাচার্য
২২। বনের খাঁচায়—আনন্দ বাগচী
২৩। রাজযোটক— „
২৪। উজ্জ্বল ছুরির নীচে— „
২৫। কবি তরু দত্ত—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
২৬। রাজা রামমোহন সম্পর্কে—অরবিন্দ গুহ
২৭। নতুন তথ্যে শরৎচন্দ্র—গোপালচন্দ্র রায়
২৮। মহারাজ—ইন্দ্রমিত্র
২৯। আদালত আঙিনায়—বিধান সিংহ
৩০। ইসলামপুর উচ্চ বিদ্যালয় শতবর্ষ স্মারক সংকলন, ১৮৮২-১৯৮১
৩১। গণকণ্ঠ, মুর্শিদাবাদ সংখ্যা, ১৯৮২
৩২। A Handbook on municipal administration in West Bengal
৩৩। বিভাব, খণ্ড ১ : সংখ্যা ২-৩, ৪ ; খণ্ড ২ : সংখ্যা ১ ; খণ্ড ৬ : সংখ্যা ১
৩৪। অমল হোম—যোগানন্দ দাস লিখিত প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি। পৃ. সংখ্যা ২০
৩৫। প্রস্তুতি পর্ব : vol. vii, No. 3-4, 1982, Oct. (বিশেষ সংখ্যা, সুকুমার রায়)
৩৬। হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত—রাজনারায়ণ বসু, দেবীপদ ভট্টা সং
৩৭। পুরশ্রী : পুরাতন পত্র সংকলন (২৭ অক্টোবর ১৯৭৯-১২ এপ্রিল ১৯৮০)—অরুণচাঁদ দত্ত, সং
৩৮। প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয়ের ৮৭তম জন্মদিবস উপলক্ষে মানপত্র
৩৯। সে যুগের কেচ্ছা একালের ইতিহাস—সুবীর রায়চৌধুরী
৪০। আকুপাংচার—ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু
৪১। ছায়ালোকের শ্রীমতীরা, ১ম পর্ব—সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪২। „ ২য় পর্ব— „
৪৩। বাঙালী কবির কাব্যচিন্তা : উনিশ শতক— অলোক রায়
৪৪। হুঁপো থেকে ব্যোমকেশ—কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৫। সেকাল থেকে একাল—বিষ্ণু দে

৪৬। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ৩য় খণ্ড—বিনয় ঘোষ
৪৭। সুকান্ত স্মৃতিকথা ও মূল্যায়ন—কৃষ্ণ চক্রবর্তী
৪৮। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী—ভবতোষ দত্ত
৪৯। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রাবলী—মধুসূদন দত্ত
৫০। রামমোহন প্রসঙ্গ—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
৫১। সাধন সহায়—স্বামী রামদাস আউলিয়া
৫২। ব্যায়াম আরাম—ডঃ বিষ্ণু মুখার্জী
৫৩। শ্রীশ্রী৺বক্রেশ্বর শিব মাহাত্ম্য ও শ্রীশ্রী৺ধামের ইতিবৃত্ত—শ্রীগুমানী দেওয়ান
৫৪। বঙ্কিম প্রসঙ্গ—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
৫৫। বঙ্গীয় সাহিত্যকোষ (সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী) ১০ম খণ্ড—অশোককুমার কুণ্ডু, স°
৫৬। " ১১শ খণ্ড "
৫৭। সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী ১৩৮৭—অশোককুমার কুণ্ডু, স°
৫৮। " ১৩৮৮ "
৫৯। সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : শান্তিনিকেতন—স্বপ্তি মিত্র
৬০। বঙ্কিমচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬১। Bengal music association programme : 1939
৬২। মুর্শিদাবাদ হিতৈষী : ১৩৪৪, ৪৪ ভাগ, ২৩ সংখ্যা (ইং ১৯৩৭, ১৫ সেপ্টেম্বর)
৬৩। মঙ্গল পাণ্ডের বিচার—শ্রীপান্থ
৬৪। Bethune college & school : Centenary volume 1849-1949
৬৫। Classified subject index to Calcutta Review, 1844-1920
৬৬। Dissertation on painting—Mohendranath Dutt
৬৭। কান্দী মহকুমা সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৯৬৬
৬৮। পুরশ্রী : রচনাপঞ্জী ১৯৭৭-১৯৮২
৬৯। ভিক্টোরিয়া—ক্নুট হামসুন, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনু°
৭০। বিলায়েতনামা [মূল : মির্জা শেখ ইতিসামুদ্দিন]—আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ,অনু°
৭১। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা সংকলন—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সুনীলকান্তি সেন সম্পাদিত
৭২। গোয়েন্দার দপ্তর—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৭৩। লোলিটা—ভলাদিমির নবোকভ ; ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী, অনু°
৭৪। First the blade—Mother Mary Colmcille
৭৫। ছেলেদের নজরুল—রমেন দাস (সবুজ সাথী)
৭৬। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সংকলন ; ভৌগোলিকের কলিকাতা ও তাহার ঐতিহাসিক তাৎপর্য : ১৮৫৬—সন্তোশ চক্রবর্তী
৭৭। আনন্দমঠ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গোপালচন্দ্র রায়, স°
৭৮। সবাক্ চিত্র—সুকুমার হালদার ও নিতাই ঘোষ
৭৯। দারোগার দপ্তর—প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ১৩ বর্ষ, ১৪৬-১৫০ সংখ্যা, ১৩১২
৮০। কলকাতার গ্রাম্যতা ও অন্যান্য—কার্তিক লাহিড়ী
৮১। মার্কসবাদের বিচারে রামমোহন—এবাদত হোসেন
৮২। রসাল—তারাকান্ত কাব্যতীর্থ, সঙ্ক°
৮৩। বাংলা পুস্তক তালিকা, ভারতী পরিষদ, ১৩৮১

৮৪। বাংলা পুস্তক তালিকা, ভারতী পরিষদ, ১৩৮৩
৮৫। " " ১৩৮৪
৮৬। কাটোয়া কাশীরাম দাস বিদ্যায়তনের শতবর্ষোত্তর রজত জয়ন্তী স্মরণিকা, ২৫-২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০
৮৭। An historical account of the Calcutta Collectorate—Reginald Cranfuird Sterndale, 1958
৮৮। মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯৮৮)—আনিসুজ্জামান

অশোককুমার কুণ্ডু
১। বঙ্গীয় সাহিত্যকোষ শেষ খণ্ড প্রথমার্ধ/উনবিংশ শতাব্দী—অশোক কুণ্ডু সং

অশ্বিনীকুমার নস্কর ; জয়নগর, কুলপী রোড ২৪ পরগণা
১। অমৃত-স্বরূপা—অশ্বিনীকুমার নস্কর

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ
১। রবীন্দ্র সাহিত্যের আদি পর্ব—সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়
২। হিন্দুদের দেবদেবী, ৩য় পর্ব হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
৩। বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান—ওয়াকিল আহমদ
৪। মেঘনাদবধ কাব্য : জিজ্ঞাসা—শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য
৫। বাঙালী জীবনে বিদ্যাসাগর—সৌমেন্দ্রনাথ সরকার

অসীমকুমার দত্ত ; ৩২/১এ, নন্দন রোড, কলিকাতা-২৫
১। কবিতা কম্পন
২। গল্প সঞ্চয়ন
৩। রামানুজ চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
৪। আত্মকথা—রাজেন্দ্রপ্রসাদ ; প্রিয়রঞ্জন সেন, অনু°
৫। পাকিস্থান প্রস্তাব ও ফজলুল হক—অমলেন্দু দে
৬। Malay—Swami Sadananda
৭। A lucky dip—Lila Ray, ed.
৮। The Chandralekha natika—Visvanath Kaviraja
৯। নিবেদন—মূল, কাজী আশরাফ মাহমুদ ; কাজী মোতাহার হোসেন, অনু°
১০। বিরহিনী— "
১১। হাওয়ার সংরাগ—শিপ্রা ঘোষ
১২। ভারত ও জার্মানরা—ওয়ালটার লাইফার, ভবানী মুখোপাধ্যায় ; অনু°
১৩। শ্লোভিন কবিতা—ফ্রানৎস প্রেশেরেন, শিশির চট্টোপাধ্যায়, অনু°
১৪। Affinity of Indian languages—Publications Division, Govt of India
১৫। উপন্যাস পাঠের ভূমিকা—শিশির চট্টোপাধ্যায়
১৬। Statistical abstract of Bangladesh—Economic Research Bureau Socom
১৭। মস্কোর চিঠি—শুভময় ঘোষ
১৮। স্বদেশ ও স্বজন : পুণ্যাত্মা দালাই লামার আত্মজীবনী—দালাই লামা, অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়, অনু°

১৯। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—জন্মশতবার্ষিকী উৎসব, ১৯৮২

আনন্দ পাবলিশার্স ; ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

১। আদমসুমারী ও অন্যান্য রচনা—পরিতোষ সেন
২। নানা রবীন্দ্রনাথ—অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
৩। পল্লী বৈচিত্র্য—দীনেন্দ্রকুমার রায়
৪। প্রগতির পথ—অম্লান দত্ত
৫। শরৎচন্দ্র—রাধারাণী দেবী
৬। রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ—পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়
৭। অচেনা চীন—মৈত্রেয়ী দেবী
৮। রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্মচেতনা—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ
৯। জিপসীর পায়ে পায়ে—শ্রীপান্থ
১০। রাজ্য ও রাজনীতি—বরুণ সেনগুপ্ত
১১। আগ্নেয়গিরির শিখরে পিকনিক—অশোক রুদ্র
১২। জয়প্রকাশ ও সম্পূর্ণ বিপ্লব—ভোলা চট্টোপাধ্যায়
১৩। ছাত্র-যুব কংগ্রেস—শ্যামলকুমার চক্রবর্তী
১৪। দর্পণে বাংলা—শান্তিকুমার মিত্র
১৫। খনি থেকে খনিজ—দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬। প্রফুল্লকুমার সরকারের প্রবন্ধ সংগ্রহ—নকুল চট্টোপাধ্যায় স°
১৭। শ্রীগৌরাঙ্গ—প্রফুল্লকুমার সরকার
১৮। পল্লীচিত্র—দীনেন্দ্রকুমার রায়
১৯। The world her village (select writings of Allen Roy) —Sibnarayan Roy, ed.
২০। Let me have my say—Gourkisore Ghosh
২১। পালযুগের চিত্রকলা—সরসীকুমার সরস্বতী
২২। A grammar of the Bengal language—Nathaniel Brassey Halhed

আনন্দবাজার পত্রিকা ; ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

১। মণিমুক্তা—সতীশচন্দ্র কাঁসারী প্রকাশিত
২। যবনিকার আড়ালে—শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় ২ কপি
বর্গীর হাতে মরে বর্গী—চিত্তরঞ্জন সুর
অন্তর্মনে উদ্ভাসিত—শান্তিভূষণ দত্ত
গীতা রহস্যম্—রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ
ভূমি সংস্কার আইন—এন. গোস্বামী
৭ কপোতাক্ষী থেকে ভাগীরথী—নন্দদুলাল মিত্র
৮ তারা জানে না ইসলাম কি—মোহাম্মদ তৈমুর
৯ বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা—ননীভূষণ দাশগুপ্ত
১০ প্রতিবন্ধী প্রতিদ্বন্দ্বী—প্রণব দাশ শর্মা
১১ চূড়ালা ও শিখিধ্বজ—কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
১২ রাজা বেঁচে আছে—স্বপন নাগ, স°

১৩ তিমির পেটে কয়েক ঘণ্টা—মোহাম্মদ নাসির আলি
১৪ পাগলা ঘন্টি—নরেন মজুমদার
১৫ ভারতে বিদেশী পুঁজি—অভিজিৎ লাহিড়ী
১৬ চেয়ারম্যান মাওয়ের সাথে লং মার্চে—চেন চ্যাঙ ফেঙ
১৭ সুনজর—পার্থ সেনগুপ্ত
১৮ বিভংস—তিপু দাস
১৯ মৌসুমী—মনজ্জির আলি
২০ সামনে সময়—নাজমা জেসমিন চৌধুরী
২১ ধূসর গোধূলি ও ষোড়শী—নৃপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
২২ বিষাদ সঙ্গীত—সেঁজুতি
২৩ উদ্বেগ উপকূলে—অনিল বিশ্বাস
২৪ সংলগ্ন অন্তরাল—হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়
২৫ মুখর প্রহর—আবদুল গণি খান
২৬ সাহিত্যমেলা (শ্রীমা শতবার্ষিকী সংখ্যা)—পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সং
২৭ খরা, বন্যা, ভালোবাসা—অজিত দেব ও নরেশ মণ্ডল
২৮ ত্রিধারা—বরেন্দ্রনাথ বারিক
২৯ ধবল জ্যোৎস্না—রিজিয়া রহমান
৩০ হেগেলের দার্শনিক মতবাদ—নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
৩১ উপহার—নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়
৩২ শিরীষ গাছের তিরিশ টাকা দাম—নন্দদুলাল আচার্য
৩৩ বেঁচে আছি—স্বপন সরকার
৩৪ জিরাফের শিস্—সমরেশ মণ্ডল
৩৫ নিহত শান্তির সন্ধানে—জ্যোতির্ময় দাশ
৩৬ ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
৩৭ অর্কিড (শারদীয়া সংখ্যা : ১৩৮৫)
৩৮ কালস্রোত : শারদীয়া ১৯৭৮
৩৯ নবরাগ (নজরুল সংগীতের স্বরলিপি)
৪০ রাগেশ্বর : ১ম ৫/গ—প্রবুদ্ধকুমার চট্টোপাধ্যায়
৪১ ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান—মানবেন্দ্রনাথ রায়
৪২ গানে গানে ডাকি মাকে—ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
৪৩ একক যুদ্ধে তবু—অমর ঘোষ
৪৪ ভরত রাজার দেশে—অশোক সিন্‌হা
৪৫ পশ্চিমবঙ্গ বাটীভাড়া নিয়ন্ত্রণ—বিমানচন্দ্র বসু
৪৬ সরল ধাত্রী শিক্ষা
৪৭ বিলাত ভ্রমণ—প্রফুল্লচন্দ্র রায়
৪৮ খেয়ালী ফসল—শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৯ পশ্চিমবঙ্গীয় বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ—এন্. গোস্বামী
৫০ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বিদ্রোহ কণ্ঠ—মওলানা ভাসানী
৫১। প্রতীক ও স্টেট ব্যাঙ্ক—দেবব্রত ঘোষ
৫২। বেদের বর্ণমালা—হরিদাস মুখোপাধ্যায়

৫৩। প্রান্তিক—সুধীন গোস্বামী
৫৪। অকথিত কাহিনী—বি. এম. কল
৫৫। খাদ্য পরিচয়—গোষ্ঠবিহারী দাস
৫৬। ত্রিপুরারাজ্যে ত্রিশ বৎসর—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
৫৭। উত্তরণ : ১৯৭৩ প্রদর্শনী
৫৮। ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
৫৯। অনুশাসনের এক বছর : পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় বিশদফা কর্মসূচীর অগ্রগতির রূপরেখা
৬০। মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি—চারুচন্দ্র দত্ত
৬১। পশ্চিমবঙ্গীয় বর্গাদারী (ভাগ-চাষ) আইন—এন্. গোস্বামী
৬২। পশ্চিমবঙ্গ দোকান ও সংস্থা আইন, ১৯৬৩—নরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬৩। বঙ্গীয় মহাজনী আইন—গিরিন্দ্রনাথ মণ্ডল
৬৪। নবজীবন বিদ্যাপীঠ—পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৫। মস্কো ডায়েরী—বিপ্লব মাজী
৬৬। উদ্‌ভ্রান্তের ডায়েরী (সমাজ দর্শন)—শিবপদ চক্রবর্তী
৬৭। দীপজল (ত্রৈমাসিক)—সত্য দেবনাথ, স°
৬৮। আমার আততায়ী—হাসনাত আবদুল হাই
৬৯। রসকলি—সুধীরেন্দ্রনাথ পাত্র
৭০। চরাচর, আমাদের—বাপী সমাদ্দার, আলোক সোম, বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী
৭১। খাঁচাভরা পতঙ্গ—সমরেশ মুখোপাধ্যায়
৭২। মায়ের গান—দেবেন্দ্রনাথ বর্মণ ও মৃণালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৭৩। ব্রে্শট-এর নাটিকা—ধনঞ্জয় দাশ, স°
৭৪। প্রবাসী মন—প্রভাত দত্ত
৭৫। পৃথিবীর কাছে নোটিস
৭৬। গাজনের মেলা—ব্রত চক্রবর্তী
৭৭। পা রাখবার ভূমি—করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য
৭৮। স্বনির্বাচিত গুচ্ছ কবিতা—তুহিনশঙ্কর চন্দ, স°
৭৯। আফগানিস্তান ও কামপুচিয়া বিশ্বে ঝড়ের কেন্দ্র—সমর মিত্র
৮০। ও মাঈ গঙ্গা—মণিরুল ইসলাম
৮১। উপহার—নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়
৮২। প্রকৃতিতে প্রাণ—সুনির্মল রায়
৮৩। মহাপূজা ও মহাতাপস—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী
৮৪। জিরাফের শিস—সমরেশ মণ্ডল
৮৫। ভূমি সংস্কার ও গ্রাম উন্নয়ন—বিপ্লব দাশগুপ্ত
৮৬। চীনের সামাজিক রূপান্তর—রবীন্দ্রনাথ সরকার, অনু°
৮৭। বসন্ত রোগের প্রতিকার ও চিকিৎসা—অভয়কুমার সরকার
৮৮। ভারত শাসনতন্ত্রসার—অভিজ্ঞ শিক্ষক
৮৯। উদ্ভিদ্-জ্ঞান—গিরিশচন্দ্র বসু
৯০। সময়ের প্রহর গুণি—সাধনা বড়ুয়া ৩ কপি
৯১। ভারতরাজার দেশে—অশোক সিন্‌হা

৯২। সপ্তমুখী—দেবীপ্রসাদ নন্দ
৯৩। রামপ্রসাদ—অনাদিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়
৯৪। হিপ্নোটিজম—পি. সি. সরকার
৯৫। অর্গ্যানন অভ্ মেডিসিন—সেনগুপ্ত
৯৬। বঙ্গীয় মহাজনী আইন—গিরীন্দ্রনাথ মণ্ডল
৯৭। ১৯৪০ সনের বঙ্গীয় মহাজন বিষয়ক আইন
৯৮। পশ্চিমবঙ্গের দোকান ও সংস্থা নিয়মাবলী, ১৯৬৪
৯৯। বাত্যানী—পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য
১০০। বর্গীর হাতে মরে বর্গা—চিত্তরঞ্জন সুর
১০১। বাংলায় ঋণ সালিশী বোর্ড—গিরিন্দ্রনাথ মণ্ডল
১০২। পুলিশ কার্যবিধি—জে. এন. বটব্যাল
১০৩। ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা—নিকুঞ্জ সেন
১০৪। অনুভব অন্বেষণ পরিক্রমা—পার্থ রাহা
১০৫। প্রার্থনা ও সমর্পণ—হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার
১০৬। মহাপ্রবর্তক মতিলাল
১০৭। নির্বাচিত পিপাসা—ইনামুল কবির ব্রহ্মা
১০৮। পরিব্রাজকের ডায়েরী—নির্মলকুমার বসু
১০৯। প্রাচ্যবাণী মন্দির প্রবন্ধাবলী : ১ম খণ্ড—যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
১১০। " : ৩য় খণ্ড "
১১১। এখনো কবিতা—রথীন লাহিড়ী ও সুমর জোয়ারদার
১১২। ছায়া ও কায়া—সুরপতি ঘোষ
১১৩। যক্ষ্মা ও তাহার প্রতিকার—উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
১১৪। বড়দাদা—এনড্রুজ—প্রণতি মুখোপাধ্যায় অনু
১১৫। সঙ্গীত অনুসন্ধিৎসা—শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
১১৬। গ্রন্থাগার প্রচার—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
১১৭। নবদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী—রমাপতি বিশ্বাস
১১৮। ডেভিড হেয়ার (নাটক)—সুবোধ মুখোপাধ্যায়
১১৯। হারামণি—মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন
১২০। নীল আকাশের নীচে—জগদীশ দাশ
১২১। নিশাত, আমি নরকে চলেছি—শেখ আতাউর রহমান
১২২। ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূচনা ও অবসান—বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১২৩। সূর্য সন্ধানে- শশধর রায়
১২৪। যখন ছিলেম রাজা—আনন্দ সাধু
১২৫। প্রাণতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব—সন্তোষকুমার সামন্ত
১২৬। সিন্ধু পারের পাখি—সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়
১২৭। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস—আর. বি. নাঈ
১২৮। শব্দের সীমানা—জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
১২৯। পেণ্ডুলাম—পরেশ মণ্ডল
১৩০। মালবাজারের মা মালতী—ব্রেশ্‌ট। অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, অনু·
১৩১। আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র ও মানবিক বাদের প্রাথমিক ইস্তাহার

১৩২। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্—গৌরকিশোর গোস্বামী, স°
১৩৩। ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের কথা—সমর দত্ত
১৩৪। অনাদৃতা—গোবিন্দ শৌণ্ড
১৩৫। শুকনো রোদ কিংবা তপ্ত দিন—শম্ভু রক্ষিত
১৩৬। দ্বিতীয় এক পৃথিবীর জন্ম—হরিতোষ জানা
১৩৭। বাঙ্গালী সম্মেলনের আহ্বান
১৩৮। বেঁচে আছি—স্বপন সরকার
১৩৯। দিগন্তের রঙ—গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী
১৪০। শিশিরের আলপনা—বৃন্দাবন গোস্বামী, স°
১৪১। মনের বৈকল্য ও সংগতি—অজিতকুমার দেব
১৪২। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন—যতীন্দ্রকুমার ঘোষ, সঙ্ক
১৪৩। পুরাতন রোগের জল-চিকিৎসা—কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
১৪৪। দেশের জ্ঞাতব্য আইন ১ম :—এস. এন. ভট্টাচার্য
১৪৫। সঙ্গীত প্রবেশ : ২য় ভাগ—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
১৪৬। পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব : ৩য় খণ্ড, প্রাচীন ভারত—বিনোদবিহারী রায়
১৪৭। কৃষ্ণকুমারী—ভবেশ দাশগুপ্ত
১৪৮। সরল ধাত্রী শিক্ষা ও কুমারতন্ত্র—সুন্দরীমোহন দাস
১৪৯। চলার পথে—জগদানন্দ বাজপেয়ী
১৫০। স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র : ১ম ভাগ
১৫১। অবাঞ্ছিত শিশু—অসীম বর্ধন
১৫২। জ্ঞানেশ্বরী—প্রাণকিশোর গোস্বামী
১৫৩। রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে—দীপঙ্কর চক্রবর্তী, স°
১৫৪। বরুণ সিন্হার শ্রেষ্ঠ কবিতা—শ্রীছোবল
১৫৫। অন্য মনে উদ্ভাসিত—শান্তিভূষণ দত্ত
১৫৬। মারাঠা জাতীয় বিকাশ—যদুনাথ সরকার
১৫৭। চীনা ইতিহাসের ধারা—অমল সান্যাল
১৫৮। একদিন যারা মানুষ ছিল—ম্যাক্সিম গোর্কি
১৫৯। বুনিয়াদি শিক্ষা-পদ্ধতি—ধীরেন্দ্র মজুমদার
১৬০। বাংলাদেশ-এর বিপ্লব—সুনীল দাস
১৬১। ১৯৪০ সনের বঙ্গীয় মহাজন বিষয়ক আইন
১৬২। মায়াবাদ—প্রমথনাথ তর্কভূষণ
১৬৩। বাঙ্গলা দেশের গাছপালা : ৩য় ভাগ—ইন্দুভূষণ সেন
১৬৪। নলকূপ বা টিউবওয়েল—মনোমোহন ভৌমিক
১৬৫। বৈদিক গবেষণা—উমাকান্ত হাজারী
১৬৬। অরুণ আলোর আবর্ত থেকে—দীননাথ সেন ও নিমাই দাশ
১৬৭। দ্বিতীয় এক পৃথিবীর জন্ম—হরিতোষ জানা
১৬৮। পর্বতারোহির কবিতা—প্রদ্যোৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৬৯। মৌসুমী—মনজির আলি
১৭০। এখন কবিতা পড়ছেন—সত্যরঞ্জন বিশ্বাস স°
১৭১। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (বসুমতী সং)

১৭২ বর্ধমান সংস্কৃতি সম্মেলন
১৭৩ মজা নদীর কথা—রামপদ মুখোপাধ্যায়
১৭৪ শ্রীগীতার গুরুতত্ত্ব—স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি
১৭৫ খেয়ালী ফসল—শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭৬ বিক্রয় কর আইন—এন. গোস্বামী
১৭৭ জালালাবাদ (নাটিকা)—সুখেন্দুবিকাশ চক্রবর্তী
১৭৮ গীতা ও গীতামৃত : ১ম খণ্ড—আশুতোষ ভট্টাচার্য
১৭৯ দুষ্ক্রিয়ের সন্ধানে—ভূপেন্দ্রনাথ দাস
১৮০ প্রাচ্যবাণী মন্দির প্রবন্ধাবলী : ২য় খণ্ড—যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, সং
১৮১ বিতর্কিত পুরুষ—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮২ শিলায় শিলায় আগুন—রিজিয়া রহমান
১৮৩ সৈকত সমুদ্র পাড়ি—দুর্গা মজুমদার
১৮৪ বিষ নিশ্বাস ভালবাসা—অমল ভৌমিক
১৮৫ অবাক নাম ভিয়েতনাম—মোরশেদ শফিউল হাসান
১৮৬ নবযুগের কবিতা—দুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ
১৮৭ লিটিল ম্যাগাজিনের সম্পাদক লেখক পরিচিতি—সুজিত রাণা, সং
১৮৮ শ্রীমদ্ভগদ্গীতা—অনিলবরণ রায়, সং
১৮৯ ইংলেকট্রিক ওয়্যারিং—শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
১৯০ রেজিষ্টারী কার্য প্রণালী—এ. খাঁ
১৯১ ষ্ট্যাম্প বিষয়ক আইন
১৯২ ভূমি সংস্কার ও গ্রাম উন্নয়ন—বিপ্লব দাশগুপ্ত
১৯৩ শাহ কমিশনের প্রতিবেদন। ২ কপি
১৯৪ বিতর্কিত পুরুষ—করুণানিধান রায়
১৯৫ কৃষি বিজ্ঞান : ২য় খণ্ড—রাজেশ্বর দাশগুপ্ত
১৯৬ স্রষ্টা জানেন সৃষ্টি তাঁর অনন্ত নয়—বিপুলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
১৯৭ বাংলাদেশ—স্মারকপত্র
১৯৮ স্মারণিকা (শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম মঠ, বিষ্ণুপুর)
১৯৯ অনুশীলন বার্তা (মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ স্মরণ সংখ্যা) : ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
২০০ ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সংকলন : ১৯০৩-১৯৪৯
২০১ বিচারসাগর
২০২ অক্সি-এসিটিলিন প্রযুক্তি বিদ্যা—প্রিয়ব্রত দাশগুপ্ত
২০৩ নজরুল এক বিস্ময়—রামজীবন আচার্য

আনিসুজ্জামান ; বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
১। আঠারো শতকের বাংলা চিঠি—আনিসুজ্জামান

ইরাবতী দত্ত ; ২০, ফকির চক্রবর্তী লেন, কলিকাতা-৬
১। কল্পতরু—ইরাবতী দত্ত
২। জলতরঙ্গ—

উত্তম দাশ ; বারুইপুর, ২৪ পরগণা
১। এ জন্মের প্রত্যাহার চাই—উত্তম দাশ
২। কণুকে— ঐ

উদিতেন্দুপ্রকাশ মল্লিক ; নিরালা, ৬৭ অশোকা পার্ক, কলিকাতা-৪৭

১। অঞ্জলি—উদিতেন্দুপ্রকাশ মল্লিক

এ. কে. সরকার ; ১/১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

১। টম ব্রাউন্‌স স্কুল ডেজ—অনিলেন্দু চক্রবর্তী, অনু০

২। হোয়াট কেটি ডিড্ অ্যাট স্কুল—সুশান কুলিজ

৩। রবিনসন ক্রুশো, ২য় সং—ডেনিয়েল ডিফো

৪। মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প, ৩য় সং—ক্ষেত্র গুপ্ত

৫। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ—ধীরেন্দ্র দেবনাথ

এম. সি. সরকার ; ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

১। পৌরাণিক অভিধান, ৪র্থ সং—সুধীরচন্দ্র সরকার

২। ইতিহাস অভিধান (ভারত) ২য় সং—যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

৩। কল্লোল যুগ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৪। পরশুরাম গ্রন্থাবলী ১ম-৩য় খণ্ড—রাজশেখর বসু

ডাঃ এস. হালদার ; পোঃ বালিটিকুরি, লালবাড়ী মাঠ, হাওড়া

১। শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতা—জ্ঞানভিক্ষু

এষ্টেট্‌স এণ্ড ট্রাষ্ট অফিসার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১। মহামণীষী মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ—হেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ওরিয়েণ্ট বুক কোং ; সি ২৯-৩১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

১। পঞ্চতন্ত্রের গল্প, ২য় সং—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক স°

২। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য—বাসন্তী চক্রবর্তী

৩। ডাক্তার বিধান রায়ের জীবন চরিত, ৩য় সং—নগেন্দ্রকুমার গুহরায়

৪। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনাসমগ্র, ১ম খণ্ড—সুশীল রায়, স°

কমল সরকার ; ২/৭, টি. এন. চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৯০

১। শ্রীঅশোককুমার সরকার ১৩১৯-১৩৮৯

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ; ৭০৩, লেক টাউন, কলিকাতা-৮৯

১। সঙ্গীতাঞ্জলি—কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

২। ভাবরূপা— ঐ

৩। চূড়ালা ও শিখিধ্বজ— ঐ

৪। দিশারি কপোত, ২য় সং— ঐ

৫। মাতামহের লিপি ও হসন্তিকা—ঐ

৬। কৃষ্ণা কালো মেয়ে— ঐ

৭। বর্ধমান বন্দনা ও মেদিনীপুর বন্দনা—ঐ

৮। নিবন্ধ নিচয় ও ভাষণাবলী, ১ম খণ্ড—ঐ

৯। শ্যাম নটরাজ— ঐ

১০। The price of a song and other poems—Kalikinkar Sengupta

১১। রবিবাসর, ১৩৮০—কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, স০

কুমারেশ ঘোষ, ২৮/৩/আর, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলিকাতা-৫৪

১। যষ্টি-মধু, ১৩৮৮, বৈশাখ-আষাঢ় ; শিব্রাম শ্রদ্ধার্ঘ সংখ্যা

২। যষ্টি-মধু : ৩১ বর্ষ, ১৩৮৯

কুমুদকুমার ভট্টাচার্য ; ৬৩/এ, রসা রোড ইষ্ট ফার্স্ট লেন, কলিকাতা-৩৩

১। আধুনিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা—কুমুদকুমার ভট্টাচার্য

২। রামমোহন-ডিরোজিও : মূল্যায়ন— „

খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক ; ৫২, কুমারপাড়া লেন, কলিকাতা-৪২

১। পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস— খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক

গীতা মুখার্জী ; ৩/বি, মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা-৩

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম-১০ম খণ্ড

গোপীনীরঞ্জন সরকার ; বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৯

১। মোট ৩৭ খানি পত্রিকা

গোলোকেন্দু ঘোষ ; কলিকাতা

১। পিরামিড—গোলোকেন্দু ঘোষ

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ ; কলিকাতা

১। কুলিকাহিণী— রামকুমার বিদ্যারত্ন, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, স০

গ্রন্থালয়, কলিকাতা-১২

১। উদ্যোগ পর্ব—নরেন্দ্রনাথ মিত্র

২। চাঁদের দাম এক পয়সা—বিমল মিত্র

৩। বাসর ঘর—বুদ্ধদেব বসু

৪। জন্মান্তর, বিশেষ সং—প্রতিভা বসু

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৬ই/২, আফতাব মস্ক লেন, কলিকাতা-২৭

১। সমকালীন

৭ম বর্ষ : ১৩৬৬ / ১০ম সংখ্যা

৮ম বর্ষ : ১৩৬৭ / ২, ৭, ৮, ১০, ১২শ সংখ্যা

৯ম বর্ষ : ১৩৬৮ / ১, ২, ৪, ৫, ৭, ৮ম সংখ্যা

১০শ বর্ষ : ১৩৬৯ / ২, ৩, ৫, ৮, ৯-১২শ সংখ্যা

১১শ বর্ষ : ১৩৭০ / ৩-৫, ৯,শ-সংখ্যা

১২শ বর্ষ : ১৩৭১ / ১, ২, ৪, ৬-১২শ সংখ্যা

১৩শ বর্ষ : ১৩৭২ / ১, ২, ৪, ৫, ৭ম সংখ্যা

১৪শ বর্ষ : ১৩৭৩ / ১, ৮-১২শ সংখ্যা

১৫শ বর্ষ : ১৩৭৪ / ৭, ১০ম সংখ্যা

১৬শ বর্ষ : ১৩৭৫ / ৪, ৬, ৮, ১০ম সংখ্যা

১৭শ বর্ষ : ১৩৭৬ / ২, ৫-৭, ৯-১১শ সংখ্যা

১৮শ বর্ষ : ১৩৭৭ / ১-৭ম, ৯, ১১, ১২শ সংখ্যা

১৯শ বর্ষ : ১৩৭৮ / ১, ২, ৩, ৬, ৭, ১০-১২শ সংখ্যা

২০শ বর্ষ : ১৩৭৯ / ১, ৪, ৫, ৯-১২শ সংখ্যা

২১শ বর্ষ : ১৩৮০ / ১, ৩, ৭-১২শ সংখ্যা

২২শ বর্ষ : ১৩৮১ / ১, ৩-১০ম সংখ্যা

২৩শ বর্ষ : ১৩৮২ / ২-৫, ৭-৯, ১২শ সংখ্যা

২৪শ বর্ষ : ১৩৮৩ / ১-৪, ১০, ১১শ সংখ্যা

২৫শ বর্ষ : ১৩৮৪ / ৬-৯ম, ১১শ সংখ্যা

২৬শ বর্ষ : ১৩৮৫ / ৪র্থ সংখ্যা

২৭শ বর্ষ : ১৩৮৬ / ১,-৩য় সংখ্যা
২৮শ বর্ষ : ১৩৮৭ / ১, ৩য় সংখ্যা
২৯শ বর্ষ : ১৩৮৮ / ১ম সংখ্যা
৩০শ বর্ষ : ১৩৮৯ / ১ম সংখ্যা

২। স্যাঁ জন প্যার্সের আনাবাস—বার্ণিক রায়, অনু' ও ভূমিকা
৩। বাপ্পার জন্যে—বার্ণিক রায়
৪। লা পয়েজি—১৫শ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা

জি. এ. ই. পাবলিশার্স ; ১০, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, ফ্লাট-১১, কলিকাতা-৬
১। বাংলার তিন মনীষী—রাধারমণ মিত্র

জিজ্ঞাসা ; ১-এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
১। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : মন ও শিল্প—মৈত্রেয়ী মিত্র
২। বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস, ১ম খণ্ড, ২য় সং—অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত
৩। নদী—সুপ্রিয় সেনগুপ্ত
৪। ভারতের জনসংখ্যা— অতীন্দ্রমোহন গুণ
৫। সুফী মতের উৎস সন্ধানে—পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য
৬। বিজ্ঞানভিত্তিক পরিচালনা—ভূপাল দত্ত
৭। রোগ, রোগী ও পথ্য—সমর রায়চৌধুরী

জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ; ১/৮৩ নাকতলা, কলিকাতা-৪৭
১। চেনামুখ অচেনা মুখ—দুর্বাসা
২। অন্তিম ক্রন্দন (উপন্যাস), ১ম খণ্ড—জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতির্ময়ী দেবী, কলিকাতা
১। আরাবল্লীর কাহিনী—জ্যোতির্ময়ী দেবী
২। সোনা রূপা নয়— ঐ
৩। রাজা রাণীর যুগ— ঐ
৪। চক্রবাল— ঐ
৫। জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনাবলী

তুলি-কলম ; ১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
১। অগ্নিযুগের নায়ক—অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ
২। কামনার রঙ—অজাতশত্রু
৩। মায়ামাধুরী—অবধূত

তৃপ্তি ব্রহ্ম ; দক্ষিণ বারাসত, ২৪ পরগণা
১। লোকজীবনে বাংলার লৌকিক ধর্মসঙ্গীত ও ধর্মীয় মেলা—তৃপ্তি ব্রহ্ম

ত্রিপুরা বসু ; পোঃ বর্ধমান আড়া, দুর্গাপুর-১২, জেলা বর্ধমান
১। সাহিত্য সেবায় মেদিনীপুর—ত্রিপুরা বসু স'

দীনেশচন্দ্র সিংহ ; পোঃ+গ্রাঃ দৌলতপুর, ২৪ পরগণা
১। কবিয়াল কবিগান—দীনেশচন্দ্র সিংহ

দে'জ পাবলিশিং ; ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
১। বাবুবৃত্তান্ত—সমর সেন
২। কবিতা কী ও কেন—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

৩। গণতন্ত্র, সংস্কৃতি ও অবক্ষয়—শিবনারায়ণ রায়
৪। বাক্যের সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ – অশ্রুকুমার সিকদার

দেবনারায়ণ গুপ্ত ; কলিকাতা
১। একশো বছরের নাট্য প্রসঙ্গ—দেবনারায়ণ গুপ্ত

দেবীপদ ভট্টাচার্য ; উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
১। বাংলা চরিত সাহিত্য—দেবীপদ ভট্টাচার্য

ধীরেন্দ্রলাল ধর ; এ/১৩১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২
১। নালন্দা থেকে লুম্বিনী—ধীরেন্দ্রলাল ধর
২। কাশ্মীর— ঐ
৩। আমার দেশ আমার গর্ব— ঐ
৪। নীলাচলের পথে— ঐ
৫। আমাদের রবীন্দ্রনাথ— ঐ
৬। পশ্চিম দিগন্তে— ঐ

নন্দদুলাল মজুমদার ; এশিয়ান বুক ট্রাস্ট, থিওজফি হল,
৪০, নিউ ম্যারিন লাইনস্, বোম্বে-৪০০০২০
১। বন্দেমাতরম্, আনন্দমঠ ও বঙ্গজীবন কাব্য—শকুনি

নবপত্র প্রকাশন ; ৮, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সান্নিধ্যে—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ—সনৎকুমার গুপ্ত, সং
তীর্থ পরিচয়—সুবোধকুমার চক্রবর্তী
সত্যজিতের পরিবার ও রবীন্দ্রনাথ—অমিতাভ চৌধুরী
মহারাজ নন্দকুমার—চণ্ডীচরণ সেন

নাথ ব্রাদার্স ; ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
১। দানিকেন তত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা—বীরেন্দ্র মিত্র
২। কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির—বীরেন্দ্র মিত্র
যদুবংশ—বীরেন্দ্র মিত্র
চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)—সনৎকুমার মিত্র, সং

নিউ এজ পাবলিশার্স ; ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
চার্বাক দর্শন—লতিকা চট্টোপাধ্যায়
বিশ্বের প্রবাদ—ইব্‌নে ইমাম
বাঙালী ও বাংলাসাহিত্য—ভোলানাথ ঘোষ
লেখকের কথা—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি—নৃপেন গোস্বামী
নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা—বিভাস রায়চৌধুরী

নিউ বেঙ্গল প্রেস ; ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
তারাশঙ্করের স্মৃতিকথা, ১ম খণ্ড—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
পিঞ্জরে অচিন পাখি—কালকূট
ডাঃ ঘোষালের গ্রন্থাবলী, ৩য় খণ্ড—পঞ্চানন ঘোষাল

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ; ৯/৩, টেমার লেন, কলিকাত-৯
১। ধ্বনি প্রতিধ্বনি, ১৯৮২—নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

নীরদ হাজরা ; C/o উদয় প্রকাশন, ১৩, নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার, কলিকাতা-৯
 ১। রাম-রহিমের বন্ধু—নীরদ হাজরা
নেপালচন্দ্র ঘোষ ; ৩২/৭, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
 ১। শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ—দীনেশচন্দ্র সরকার
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ; ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
 ১। আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ১ম-২য় খণ্ড—মুজফফর আহমদ
 ২। সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ—রেবতী বর্মণ
 ৩। প্রেমচন্দ : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ—মহাদেবপ্রসাদ সাহা, স°
পত্রলেখা / প্রকাশন বিভাগ ; ১৪-এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯
 ১। কিশোর বিচিত্রা—রাসবিহারী রায়
 ২। সুন্দরবনের ভয়ঙ্কর—প্রলয় সেন
 ৩। সাগর রাজপুত্র—গৌরী সেন
পরিমল চক্রবর্তী ; ৪৩৪, পূর্ব সিঁথি রোড, কলিকাতা-৩০
 ১। নির্বাসন—পরিমল চক্রবর্তী
পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য প্রকাশক সংস্থা ; ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
 ১। কলেজ ষ্ট্রীট, ১ম-২য় প্রস্তুতি সংখ্যা
পাঁচুগোপাল হাজরা ; ১৬/এ, অমূল্যচরণ পাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫৭
 ১। জীবনের পথে পথে / গল্প সংকলন—পাঁচুগোপাল হাজরা
পার্থ ভট্টাচার্য ; ভট্টাচার্য পাড়া, বারুইপুর, ২৪ পরগণা
 ১ জীবনের জন্যে—পার্থ ভট্টাচার্য
 ২। অতিথি বিদায় ”
পুস্তক বিপণি ; ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯
 ১। বামনাখ্যানম্—আবদুস সামাদ
 ২। লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি—পল্লব সেনগুপ্ত
 ৩। সংস্কৃতির প্রগতি—সুধী প্রধান
 ৪। সেকালে দারোগার কাহিনী—গিরিশচন্দ্র বসু,
 অলোক রায়, অশোক উপাধ্যায়, স°
প্রজ্ঞান রায়চৌধুরী ; ৪৬/৫/ডি বালীগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা
 ১। U. S. S. R. ; 1843—M. Dobb
 ২। Social thinking—H. Levy
 ৩। J. V. Stalin works, 1st—9th vols.
 ৪। V. I. Lenin collected works, 1st—9th vols.
প্রদীপ মজুমদার ; ৬০, তালপুকুর রোড, নৈহাটী
 ১। আমাদের দৃষ্টিতে গণিত—প্রদীপ মজুমদার
প্রবীর রায়চৌধুরী ; ২৫৯/২-এ, এস. কে. দেব রোড, কলিকাতা-৪৮
 ১। কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—এ. কে. রায়। ভাষান্তর : শুদ্ধোদন সেন
 ২। ভাগো নেহি দুনিয়াকো বদলো—রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ভাষান্তর : ঐ
প্রশান্তকুমার পাল ; আনন্দমোহন কলেজ, ১০২/১, রামমোহন সরণি, কলিকাতা-৯
 ১। রবিজীবনী, ১ম খণ্ড : ১২৬৮-৮৪—প্রশান্তকুমার পাল

প্রসেনজিৎ ঘোষ ; ৪৭সি, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা-৬

দেশ : মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৩, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৭৪ এবং সাহিত্য সংখ্যা কার্তিক-মাঘ, ১৩৭৪ মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৪ এবং বৈশাখ, ১৩৭৫

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলিকাতা

১। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন—দ্বিজেশচন্দ্র রায়

২। সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন—সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বন্দিরাম চক্রবর্তী, কলিকাতা

১। ভারতচন্দ্র স্মরণাঞ্জলি—অশোককুমার কুণ্ডু, সং

বরণ রায়চৌধুরী ; ৮/২, হেস্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

১। Computer sorting techniques—M. K. Roy & D. Ghosh Dastidar

২। Self in Sankhya philosophy—Latika Chattopadhyaya

৩। History & evolution of Vaishnavism in Eastern India—Pranabananda Jash

৪। Bimbisar to Asoka—Sudhakar Chatterjee

৫। History of Saivism—Pranabananda Jash

বসুধারা প্রকাশনী ; ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

১। রবি-প্রদক্ষিণ—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

২। দরদী শরৎচন্দ্র—মণীন্দ্র চক্রবর্তী

৩। Murder of British magistrates—Binoyjiban Ghosh

বাণী দত্ত ; ৬৮/১ বি, পূর্ণদাস রোড, কলিকাতা

১। স্মৃতি ও প্রতীতি—ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

বাণী নাগ ; সম্পাদিকা পল্লব : আরণ্যক, এ-৯ রবীন্দ্রনগর, কলিকাতা-১৮

১। পল্লব, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮২

বাসুদেব মোশেল ; গ্রাম : কন্যামণি, পোঃ সারেঙ্গা, জেলা—হাওড়া

১। সত্য গুহর ঘরবাড়ি ও প্রেম—সত্য গুহ

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী ; ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

১। শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র—মোতিলাল মজুমদার

২। অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম, ১ম খণ্ড—অনন্ত সিংহ

বক্তব্য—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কবি শ্রীমধুসূদন, ৩য় সং—মোহিতলাল মজুমদার

কনখল—মণীশ ঘটক

Modern Bengal—Nirmal Kr. Bose

বাংলার নবযুগ—মোহিতলাল মজুমদার

৮ Contemporary social problems in India—Bela Duttagupta

৯। শতাব্দীর শিশু সাহিত্য, ২য় সং—খগেন্দ্রনাথ মিত্র

১০। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস—মোহিতলাল মজুমদার

১১। পরিভাষা-কোষ, ১ম খণ্ড—সুপ্রকাশ রায়

বিশ্বজ্ঞান ; ৯/৩, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

১। কাদামাটির দুর্গ, ২য় সং—প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

২। সুখের ইজারা—রণেন সরকার
৩। রূপ ও রূপান্তর—জ্ঞানপ্রকাশ মণ্ডল
৪। জগৎ শেঠের রক্তমোহর—সলিল লাহিড়ী
৫। দেহদানের ভূমিকা—ক্ষিতীশ দেব সিকদার
৬। দেশ বিদেশের শিক্ষা—জ্ঞানান্বেষী
৭। যে যার মতন—অজিত হাজরা
৮। কবিতার ঘর গেরস্তালি—অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়
৯। পরিকল্পনা প্রসঙ্গে—রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
১০। নিমজ্জিত ধ্বনির মাস্তুলে—রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়
১১। হয়তো গোলাপ--জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়
১২ পটভূমি—প্রলয় সেন
১৩ The romance of Henna and other poems of Solil Lahiri
১৪ মেঘের আড়ালে সূর্য—দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫ অম্বাবর প্রতিবিম্ব—রণজিত দাশগুপ্ত
১৬ চেনা অচেনার ভীড়ে আমার মুখ—সত্য গুহ
১৭। ইস্তাহার—প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮। আকাশ ও মহাকাশ—প্রভাত হালদার

বীরেন্দ্র মল্লিক ; ৪৬, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
১। ত্রয়ী—বীরেন্দ্র মল্লিক
২। সুরমা ঐ
৩। ডাঃ রণনাথ ঐ
৪। সুপর্ণা ঐ
৫। ডাইরির কয়েকটি পাতা ঐ

বেঙ্গল পাবলিশার্স ; কলিকাতা-১২
১। সে এক দুঃস্বপ্ন ছিল—মনোজ বসু
২। আজকের রাশিয়া -দিলীপ মালাকার
৩। তিন প্রহর—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৪। ভারত পথিক—নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ব্রতচারী কেন্দ্রীয় নায়ক মণ্ডলী, কেন্দ্রীয় কার্যালয় ২৩/১, রমানাথ কবিরাজ লেন, কলিকাতা-১২
১। স্বদেশপ্রেমী গুরুসদয়, ২য় খণ্ড,—শঙ্করপ্রসাদ দে
২। লোকায়ত গীতি ও নৃত্য—অমিতাভ ভট্টাচার্য ও শঙ্করপ্রসাদ দে, সঙ্ক° ও স° ২ কপি
৩। গুরুসদয় গীতিকায় ভূমি, প্রেম-কর্মযোগ-স্ব-ধারা ও স্ব-ছন্দ—
শঙ্করপ্রসাদ দে, স°, ২ কপি
৪। ব্রতচারী প্রকরণ—শঙ্করপ্রসাদ দে, স°, ২ কপি

ভারতী তামিল সঙ্ঘ ; ৯৩এ, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-২৬
১। The voice of a poet—The Sangham
২। মহাকবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর কবিতা—সুব্রহ্মণ্য ভারতী
৩। Bharati—The Tamil poet—C. Rajagopalachari
৪। Bharati's longer poems—J. Parthasarathi

৫। Bharati in English—The Sangham, ed.
৬। Essays on Bharati, Vol. III—The Sangham, ed.
৭। The Sangham age—The Sangham, ed.
৮। Essays on Kambah—The Sangham
৯। তামিল সাহিত্য এবং ওন্‌কী বর্তমান প্রগতি—শঙ্কররাজ নায়ডু
১০। নূপুর-গাঁথা—এম. জো. বেঙ্কটকৃষ্ণাণ

ভূঁইয়া ইকবাল ; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ
আলাওলের পদ্মাবতী—আবদুল করিম, সাহিত্য বিশারদ, সং
এর উপায় কী ? ২য় সং—মীর মশাররফ হোসেন

মোহন ; প্রকাশনী ৫৪/৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
১ দিবস যামিনী—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
২ চলো বেড়িয়ে আসি, ২য় খণ্ড—শক্তি চট্টোপাধ্যায়
৩ জীবন ও কর্মে মহাপুরুষ সান্নিধ্য—অচিন চৌধুরী, স০
৪ ডেল কার্নেগী অমনিবাস (১)
৫ যদি বড় হতে চান, ২য় সং—ডেল কার্নেগী
৬ আনন্দময় কর্ম, সুখী জীবন—ডেল কার্নেগী
৭ অনুসরণ ও সাফল্যের নূতন দিগন্ত, ২য় সং—ডেল কার্নেগী
৮ মন জয় করার সহজ উপায়, ২য় সং—ডেল কার্নেগী
৯ চলো বেড়িয়ে আসি, ৫ম সং—শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ; ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
১ রবীন্দ্রনাথের নবজাতক—শুদ্ধসত্ত্ব বসু
২ দাবী—সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
৩ রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ—শুদ্ধসত্ত্ব বসু
৪ অমিয়সাগর—রঞ্জন সেন
৫ বারোয়ারী বিবি—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

মন্দাকিনী ভাদুড়ী ; ১৪০/বি, ব্লক-জি, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩
১। বেদান্ত-সূত্রম্ ১ম-৩য় খণ্ড—বলদেব বিদ্যাভূষণ, স০

মহাদেব অধিকারী ; পি· ডব্লিউ. ডি রোড, মহামিলন মঠ, কলিকাতা-৩৫
১। পথের আলো, ১৩৮৮, ১৬শ বর্ষ, ৩ বৈশাখ-১৮ চৈত্র

ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহা, কলিকাতা
১। The necessity of atheism—Percy Bysshe Shelley,...intro ductory note by Mahadevprasad Saha

মিত্র ও ঘোষ ; ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
১। শেরপাদের দেশে—উমাপদ মুখোপাধ্যায়
২। আসা-যাওয়ার মাঝখানে—নলিনীকান্ত সরকার
৩। দেবী মাহাত্ম্য—প্রবোধকুমার সান্যাল
৪। যাত্রী—লীলা মজুমদার
৫। গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন—সৈয়দ মুজতবা আলী
৬। বন্যা—নিমাই ভট্টাচার্য

৭। কথা কল্পনা কাহিনী, ৫ম স্তবক—গজেন্দ্রকুমার মিত্র
৮। সন্ধিক্ষণ—আশাপূর্ণা দেবী
৯। অবিশ্বাস্য সত্য—সুধীনকুমার মিত্র
১০। সাধক জীবন সমগ্র—অবধূত

শ্রীমতী মেরী এ্যান দাশগুপ্ত ; ৩নং নর্থ রোড, যাদবপুর, কলিকাতা-৩২
১। The arts of Bengal & eastern India : an exhibition organised by crafts council of West Bengal, April 23-May 9, 1982, at the Commonwealth Institute, London.

রমেন গুপ্ত (চিত্রগুপ্ত) ; কলিকাতা
১। বরণীয় যাঁরা আদালতে—চিত্রগুপ্ত

রিসার্চ পাবলিকেশন সেকসন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ
১। Visva-Bharati Journal of research ; humanities & Social Sciences, vol. v, part I, 1980-82
২। Descriptive morphology of Oriya—G. N. Dash
৩। প্রাচীন ভারতে নারী—ক্ষিতিমোহন সেন
৪। শ্রীপদমেরুগ্রন্থ (সাহিত্য প্রকাশিকা ৭ম খণ্ড)—দ্বিজ মাধব, সম্প
৫। The Emperor and the subordinate rulers—D. C. Sirca

লায়লা চক্রবর্তী ; ২৪/১, দানেষ শেখ লেন, ব্লক F 1/2, হাওড়া-৯
১। বিপ্লবী সূর্য সেন—অমিতা দেবী
২। জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ—হরিপদ ঘোষ
৩। তিলোত্তমা—মাইকেল মধুসূদন দত্ত
৪। সাহেব বিবি—বিমল মিত্র
৫। কল্পনা, প্রেমলতা প্রীতিলতা-স্মৃতিরেখা
৬। গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ—রাজকৃষ্ণ রায়
৭। রাণী ভবানী—দুর্গাদাস লাহিড়ী
৮। অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র
৯। ছোটদের গল্প—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
১০। শ্রীঅরবিন্দ—অন্নপূর্ণা দেবী
১১। কমলকুমারী—দামোদর দেবশর্মা

শঙ্কর রুদ্র ; কলিকাতা
১। যেমন দেখি—শঙ্কর রুদ্র

শঙ্করপ্রসাদ দে (ব্রতচারী কেন্দ্রীয় নায়ক মণ্ডলী) ;
২৩/১, রমানাথ কবিরাজ লেন, কলিকাতা-১২
১। স্বদেশপ্রেমী গুরুসদয়, ১ম খণ্ড—শঙ্করপ্রসাদ দে
২। মোরা শিখব লেখাপড়া—ব্রতচারী কেন্দ্রীয় নায়ক মণ্ডলী

শম্ভুনাথ মল্লিক ; ২৩/সি, আমহার্স্ট রো, কলিকাতা-৯
১। Directory & guide for Bakery industries—Compiled by Sambhunath Mallick

শিশিরকুমার মাইতি ; ২৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন, হাওড়া-৪

১। আশাবরী পত্রিকা : এপ্রিল, অক্টোবর ১৯৭০ ; জানুয়ারী ১৯৭১ জানুয়ারী ; এপ্রিল, জুলাই, অক্টোবর ১৯৮২ ; জানুয়ারী ; ১৯৮৩

শিশু সাহিত্য সংসদ ; কলিকাতা

১। সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, সংযোজন খণ্ড—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সং

২। চলার পথের দিনলিপি, ১ম খণ্ড—চারুবালা দত্ত

৩। Indian drawing from masterpieces—PhaniBhusan, illus.

৪। Samsad Beng-Eng dictionary, rev. & enlgd.
2nd ed.—Sailendra Biswas, Comp.

৫। India wrests freedom— S. C. Sengupta

শৈলেন মল্লিক ; ১৬/এ, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা-৬৮

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা, ৩য় সং—কৃষ্ণদাস কবিরাজ

২। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন, ১ম খণ্ড—হরিদাস দাস, সং

৩। ঐ ২য় খণ্ড ঐ

শোভা চট্টোপাধ্যায় ; ৬৭/২/১, কলেজ রোড, বোটানিক্যাল গার্ডেন, হাওড়া-৩

১। প্রাচীন যুগের ইতিহাস লেখার নেপথ্য-কথা (২ কপি)—শ্রীবিবস্বান 'আর্য'

শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, ১২/বি, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪

১। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণকে লেখা তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের ২০।৭।৩২ তারিখের একটি চিঠি (বাংলা) (দেশবন্ধু পুথি সংগ্রহ প্রসঙ্গে)

২। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী, ১ম খণ্ড

শ্যামলী বসু : ৩৯, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা-৬

১। বোধোদয় গ্রন্থমালা, ১৮ : নিবেদিতা—শ্যামলী বসু

২। ঐ ৩২ : মধুসূদন ঐ

৩। ঐ ২৩ : বিবেকানন্দ ঐ

৪। ঐ ৩৪ : ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ঐ

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৫১, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩১

১। বিহঙ্গমেলা—সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সপ্তর্ষি ; ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

১। কলিকাতার ইতিহাস, সপ্তর্ষি সং—বিনয়কৃষ্ণ দেব

২। বাঙালী কোথায় ? —অমিতাভ চক্রবর্তী

৩। সব পেয়েছির দেশে—বুদ্ধদেব বসু

৪। সাউথ ব্লক পেরিয়ে—জ্যোতির্ময় মল্লিক

৫। ঘরে বাইরে সুকান্ত—রমেন দাস

৬। সংবাদের নেপথ্যে—অমিতাভ চৌধুরী

সমকাল প্রকাশনী ; ৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন, কলিকাতা-১৩

১। লৌকিক অলৌকিক—অমিতাভ চৌধুরী

২। কিশোর অমনিবাস—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৩। রিটায়ার্ড—নিমাই ভট্টাচার্য

৪। অষ্টাদশী—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৫। মধুময়—সুনীল

৬। লীলাবতী—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৭। কুসুমের দিন—নীহাররঞ্জন গুপ্ত
৮। মরীচিকা—সমরেশ বসু
৯। গল্প সংগ্রহ, ২য় খণ্ড—প্রতিভা বসু
১০। সমবেত সরস গল্প—মিহির সেন, স°
১১। পুঁথির লেখা—আশাপূর্ণা দেবী
১২। অতঃপর—বিমল কর
১৩। উনিশশো উনআশিতেও—আশাপূর্ণা দেবী
১৪। মৃগয়া—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
১৫। তোমাকে নমস্কার—নীহাররঞ্জন গুপ্ত
১৬। গল্প সংগ্রহ, ১ম খণ্ড—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭। সমুদ্র শহরে আতঙ্ক—নিরঞ্জন সিংহ
১৮। এক ডজন রহস্য—নীহাররঞ্জন গুপ্ত
১৯। আরোহণ—চাণক্য সেন
২০। রক্তজবা—নীহাররঞ্জন গুপ্ত
২১। শেষ অধ্যায়— ঐ
২২। ভ্রমর

সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ ; ৪, সানিপাড়া লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী
১। এক মুঠো মানুষ—সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

সমীক্ষা পরিষদ ; ৩২/১০, মতিলাল মল্লিক লেন, কলিকাতা-৩৫
১। বরানগর ইতিহাস ও সমীক্ষা—সমীক্ষা পরিষদ

সমীরকুমার দাস ; অ্যাসিস্টাণ্ট কোলিয়ারী ম্যানেজার, মুনিদি প্রোজেক্ট, বিহার
১। ঝড়ো বাতাস—কুম্পটিকা

সম্পাদক, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা কেন্দ্র ; শাস্ত্রী ভিলা, নৈহাটি
১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংগ্রহ, ২য় খণ্ড—সত্যজিৎ চৌধুরী ও অন্যান্য, সম্পাদক

সরোজমোহন মিত্র,
১। বনফুলের গল্প সমগ্র, ১ম খণ্ড—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ; ২১১, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬
১। আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী
২। রামমোহন ও ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনা—ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী
৩। Raja Rammohun Roy : the represntative man—Amiyakumar Sen

সারস্বত লাইব্রেরি ; ২০৬, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬
১। দশরথ নামে একজন—কার্তিক লাহিড়ী
২। পাবলো পিকাসো—অশোক ভট্টাচার্য
৩। প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির রূপরেখা—দীপক মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য অকাদেমি ; রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, কলিকাতা-২৯
১। বাংলার সাহিত্য-ইতিহাস—সুকুমার সেন
২। বিহারের লোককাহিনী—প্রণবচন্দ্র রায় চৌধুরী

৩। Sunitikumar Chatterji : scholar & virtuoso—Sukumar Sen
৪। মৃচ্ছকটিক (শূদ্রক)—সুকুমারী ভট্টাচার্য, অনুবাদিকা
৫। ভগবান বুদ্ধ (ধর্মানন্দ কোসম্বী) –চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য অনু°
৬। চৈতন্যভাগবত (বৃন্দাবন দাস)—সুকুমার সেন, স°

সুকুমার ভট্টাচার্য ; কলিকাতা।
১। টোটো কাহিনী—সুকুমার ভট্টাচার্য
২। আঁধি আঁধার আলো— ঐ

সুকুমার মিত্র ; এ/১২/৮, কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কালিদহ, কলিকাতা-৮৯
১। পরিচয়, মার্চ-জুলাই, ১৯৮০
২। ঐ জানুয়ারী-জুলাই, ১৯৮১
৩। বেজিং-ওয়াশিংটন-ইসলামাবাদ অক্ষজোট
৪। ব্রাহ্মণ-কন্যা—ড: শ্রীধর ভেঙ্কটেশ কেতকর
২। মাটির রঙ কালো—পালগুম্মি পদ্মরাজু
৩। জীবন-স্মৃতির ভূমিকা—ড: প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
৪। মানদণ্ড—প্রফুল্ল রায় চৌধুরী
৫। অমৃতস্য পুত্রী—কমল দাশ
৬। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : যে দেশের স্বপ্নগুলি সার্থক হয় নি—সুকুমার মিত্র
৭। পরিচয়, ৫১ বর্ষ, ১৩৮৮ আশ্বিন-অগ্রহায়ণ
৮। পরিচয়, ৫১ বর্ষ, ১৩৮৮ পৌষ-১৩৮৯ জ্যৈষ্ঠ

সুকুমার মিত্র ; উমেশ সৌদামিনী সংগ্রহ,
১। পরিচয়, ৫০ বর্ষ, ১ম-৫ম সংখ্যা, ১৯৮০
২। অতীশ দি গ্রেট—অবনীনাথ রায়
৩। অপৌরুষেয়— ঐ

সুনীল দাস ; ৭৭, এস্. কে. দেব রোড, কলিকাতা-৪৮
১। দু'শ বছরের বাংলা বই/স্মারকপত্র –চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, স°

সুবোধকুমার বসুরায় ; বনাম্নি, নডিহা, পোঃ+জেলা পুরুলিয়া
১। ছত্রাক ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
ঐ ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা
ঐ ৩য় বর্ষ, ৪র্থ „
ঐ ৪র্থ বর্ষ, ১ম „
ঐ „ ৪র্থ „
ঐ ৫ম বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা
ঐ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম-৩য় „
ঐ ৭ম বর্ষ, ১ম „
ঐ „ ৩য়-৪র্থ „
ঐ ৮ম বর্ষ, ১ম „
ঐ „ ২য়-৪র্থ সংখ্যা
ঐ ৯ম বর্ষ, ১ম-৪র্থ সংখ্যা
ঐ ১০ম বর্ষ, ১ম-৪র্থ সংখ্যা
ঐ ১১শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা

স্বস্তি মণ্ডল ; ১/৪ এ, শচীন মিত্র লেন, কলিকাতা-৩

১। জুয়াড়ী—চণ্ডী মণ্ডল

২। হাত নেই— „

হরিপদ ভৌমিক ; পি-২৬১ (৬ এম) সি. আই. টি. রোড, কলিকাতা-৫৪

১। শতবর্ষের আলোকে বহরমপুর পৌরসভা, ১৯৭৮—বিজয় গুপ্ত

Sri Navakumar ; Sura Sadan Publishing, 23, Contractors, Are
Jamshedpu

1. The Mahabharata : a spritual interpretation—Sri Navakuma

U. P. Mullick ; 9, Hastigs Street, Calcutta-I

I. Gospel on the Divine—U· P. Mullick

পরিষৎ সংবাদ

শোক সংবাদ :

১৩৮৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাস হইতে চৈত্র মাসের মধ্যে বিশিষ্ট সাহিত্যিক বীরেন্দ্র-কুমার ভট্টাচার্য, জ্যোতির্মালা, সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য আবু সৈয়দ আইয়ুব ও প্রিয়দারঞ্জন রায়, প্রখ্যাত কবি বিষ্ণু দে, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সাগর সেন ও চিন্ময় রায় চৌধুরী, পরিষদের গ্রন্থাগারিক শান্তিময় মিত্র, মমতা দাশগুপ্ত, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক গিরিবালা দেবী, সুবোধ বসু, এবং সত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অশোক-কুমার সরকার। ত্রিদিবেশ বসু, মণি বাগচী, মন্মথনাথ সান্যাল, কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, অরুণচন্দ্র গুহ-র প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি যথোচিত শোকজ্ঞাপন করিয়াছেন।

পরিষদের দীর্ঘদিনের কর্মী শ্রীঅনাদিভূষণ দাস ১৩৮৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে তাঁহার কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

বিশেষ সাধারণ সভা :

১৯ চৈত্র ১৩৮৯ তারিখে এক বিশেষ সাধারণ সভায় পরিষদের বার্ষিক চাঁদা ১৮ টাকার স্থলে ২৪ টাকা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিষদ গ্রন্থাগারে প্রবেশিকা দক্ষিণা এক টাকার স্থলে পাঁচ টাকা ধার্য হইয়াছে।

শাখা সংবাদ :

গত ৪ঠা চৈত্র, ও ৫ই চৈত্র ১৩৮৯ শনি ও রবিবার মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মেদিনীপুর-শাখার ৭১তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীচিত্তরঞ্জন মিশ্র, প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীমাণিকলাল সিংহ। এই উপলক্ষে একটি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন শ্রীশঙ্কু মহারাজ। অধ্যাপক গুণময় মান্না বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন ডঃ নিশীথরঞ্জন রায়। পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীগৌরীশঙ্কর দাস বার্ষিক কার্য-বিবরণ পেশ করেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

সুদৃশ্য বাঁধাই

১ম খণ্ড : টা: ২০.০০

২য় খণ্ড : টা: ৩০.০০

[স্বল্প সংখ্যক পুস্তক অবশিষ্ট আছে]

বাংলা সাময়িক পত্র

১ম খণ্ড : টা: ১১.০০

২য় খণ্ড : টা: ৯.০০

সাহিত্য সাধক-চরিতমালা

১ম হইতে ১৪শ খণ্ড

বাংলার সাহিত্যিকগণের প্রামাণ্য জীবনী ও গ্রন্থসূচী

মূল্য : দুইশত ত্রিশ টাকা

স্বপ্ন

গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত

প্রায় এক যুগ পরে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। সুদৃশ্য বাঁধাই

মূল্য : পনের টাকা

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, সম্পাদক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত
ও শ্রীহরি প্রিণ্টার্স, ১২২/৩ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট কলিকাতা-৪ হইতে
শ্রীমতী রেখা দে কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : আট টাকা